নির্বাচিত প্রেমের গল্প

বিপ্রদাশ বড়ুয়া

লেখকের গল্প ও উপন্যাস গ্রন্থসমূহ

সাদা কফিন (১৯৮৪)
যুদ্ধ জয়ের গল্প (১৯৮৫)
গাঙচিল (১৯৮৬)
নদীর নাম গণতন্ত্র (১৯৮৭)
উল্কি একটি প্রেমের গল্প (১৯৮৮)
ভয় ভালোবাসা নির্বাসন (১৯৮৮)
সূর্য লুঠের গান (কিশোর গল্প ১৯৮০, ১৯৮৯)
তাঁতি ও ঘোড়ার ডিম (জাপানি ১৯৮৫, বাংলা ১৯৮৭)
রোবট ও ফুল ফোটানোর রহস্য (কিশোর উপন্যাস ১৯৮৮)
আরব্য রজনী (কিশোর ১৯৮৯)
আকাশে প্রেমের বাদল (১৯৮৯)
স্বপ্নমিছিল (১৯৮৯)
স্বপ্নসমুদ্রে বনদেবীরা আছে (১৯৯০)
সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা (১৯৯০)
ফিরে তাকাতেই দেখি বঙ্গবন্ধু (১৯৯০)
আমি মুক্তিযুদ্ধের কথা বলছি (প্রকাশিতব্য)

সূচিপত্র

আকাশে প্রেমের বাদল ৯
একা বা অশোকমঞ্জরী ২৩
যুদ্ধের এক গীতিময় সন্ধ্যায় ২৭
অসচরাচর ৩১
প্রতিদিন একটি রক্তকরবী ৪০
গীতিময় স্নান ৪৬
ভালোবাসার দুই কদম ৫৭
লঘু নিঃশ্বাস ৭৪
উল্কি ৮৩
সেই সময় ৯০
পঞ্চগড় ১০৩
সুন্দর মানুষ ১১০
অভয়ারণ্যের খোঁজে ১২১
দুই মৃত্যু ১৩৫
বন্য স্বপ্ন ১৫৯
ভালোবাসা ১৬৬
সমুদ্র সওয়ার ১৮৪
চুয়াল্লিশ পা ১৯৫

আকাশে প্রেমের বাদল

আমার জন্ম খরস্রোতা নদীর তীরে। ছোট্ট একটি পাহাড়ী নদী বড় নদীর সঙ্গে যেখানে মিশেছে তারই মধ্যবর্তী গ্রামে। পাহাড় থেকে জন্ম বলে বর্ষায় নদীটির গতি হয় ক্ষুরধার—যেমন আমার ইচ্ছেরা প্রচলিত আইন-আনুন না মেনে সারা দেশে ঘুরে বেড়ায় এবং দেশান্তরেও পাড়ি জমায়, ঠিক তেমনি বড় নদীটিও কূলের কাছে যা-কিছু পায় গ্রাস করে সমুদ্রের দিকে তীব্র বেগে ছুটে চলে। পাহাড়ের মরা শুকনো গাছপালা ও খড়-কুটো, পোড়া কাঠ, গাছতলায় ঝরে পড়া ফল গিলা এমন কি মানুষ পর্যন্ত ভাসিয়ে আনে। পাড় ভেঙে ঘরবাড়ি ভেসে যাওয়ার খবরটাও ওর কাছে তখন এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর ওর দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাটাও বিশেষ আমল দেয় বলে মনে হয় না।

আমার জন্মস্থান, ছেলেবেলার স্মৃতি, এমন কি যৌবনের উন্মেষে প্রথম ভালোবাসাও ফেলে এসেছি দুই নদীর জলে ধোওয়া গ্রামে। আমি প্রায় ভুলতে বসেছি ভালোবাসার সেই মিষ্টি-মধুর স্মৃতি। ঠিক ভুলে যাওয়া নয়, অনেক স্মৃতির মাঝে চুপটি করে থাকা এক আনন্দঘন গ্রাম-কাহিনী।

পাহাড় পাহাড়ের ঢালুতে দাঁড়িয়ে থাকা বড় বড় গাছ, বর্ষার ঝমঝম এক টানা বৃষ্টি, নদীর কুলকুল, পাড়-ভাঙার শব্দ, ভাদ্রের শব্দহীন ভরা নদী, বিশাল বিশাল গাছের ভেসে-আসা ভেলা, বাঁশের লম্বা চালি, দূরে বৃষ্টিতে বা কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়—সেই আমার গ্রাম। একা একা হাঁটতে হাঁটতে পেরিয়ে যাই গ্রাম-সীমান্তের বন। বনের ঝাঁঝালো গন্ধ, মাঝে মাঝে ছুটে যাওয়া একটি হরিণের ছায়া, সন্ধে ও সকালে ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসা বক বা বানের জলে ডুবে যাওয়া গ্রামই আমার শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি। তার মাঝে কঠোর নিয়ম-শৃঙখলায় ভাই-বোনদের সঙ্গে বেড়ে ওঠা—। প্রিয় পাঠক বা পাঠিকা, এবার কৃষ্ণচূড়ার কথায় আসি।

গ্রাম থেকে আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দিয়েছি। শহরের হোস্টেলে থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছে কৃষ্ণচূড়া। কৃষ্ণচূড়ার মতো ঝলমল ওর লম্বা চুল, বারুদ-ঠাসা বুক আর শাণিত ছোরার মতো

কথাবার্তা। গ্রামের এক আত্মীয়ের বিয়েতে তার সঙ্গে দেখা এবং নতুন করে পরিচয়। আমরা একই গ্রামের। সম্ভবত তিন-চার বছর আগে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। অসুখের জন্য আমার দু' বছর নষ্ট হয়েছিল প্রাইমারি স্কুলে। কৃষ্ণচূড়াও তাই আমার বয়েসী। বিয়ের লগ্ন ছিল রাত দুটোয়। কাজ করতে করতে আমিও ক্লান্ত। মাঘের শীত পড়েছে জেঁকে, কুয়াশাও নেমেছে ঝেঁপে। কৃষ্ণচূড়া বলল, আমার সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত যাবে, পৌঁছে দেবে? ভীষণ শীত করছে। ওর গায়ে ছিল কাশ্মিরী চাদর, রাজশাহী সিল্কের শাড়ি। প্রস্তাব শুনে আমি নিজেকে কেউকেটা ভেবে নিলাম। ওর ভাই থাকতে আমাকে কেন বলল আমার বোধে এল না। আমার বুকের ভেতরটা ঝলমল শব্দে বাজতে লাগল।

হ্যাঁ, কৃষ্ণচূড়া খুব সাহসী। বিয়েবাড়ির হ্যাজাকের আলো পিছনে ফেলে কুয়াশার অন্ধকারে ঢুকতে ঢুকতে সে বলে বসল, তুমি কি কাউকে ভালোবাসো?

আকাশ-পাতাল বা কুয়াশা, স্কুলের সহপাঠিনী, কোনো নিকট বা দূর সম্পর্কের আত্মীয়া, অথবা স্বপ্ন হাতড়ে নাম করার মতো কাউকে তক্ষুণি খুঁজে পেলাম না। ঠিক সে-সময় লক্ষ্মীপেঁচা বলে উঠল, বলে দাও তুমি তুমি তুমি। তোমাকেই ভালোবাসি কৃষ্ণচূড়া।

যে-আমি মেয়েদের সামনে মুখচোরা, চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারি না, কথা বলতে গলা কাঠ হয়ে যায়, পাড়ার মেয়েদের সঙ্গেও কথা বলতে বুকের শব্দ নিজের কানে শুনি, সেই আমি তাড়াতাড়ি কুয়াশার বর্ম পরে লক্ষ্মীপেঁচার মতো জোর গলায় বললাম, তুমি। তারপর শুরু হল আমার বুকের শব্দ এক দুই তিন করে গোনা। এক সময় দেখি শুধু আমার নয়, কৃষ্ণচূড়ার বুকের শব্দও আমার বুকের শব্দের সঙ্গে এক তালে মিশে ঠুংরি শুরু করেছে। ওর গায়ে আমার অভিজ্ঞতার অতীত এক অপ্রাকৃত সুগন্ধ। তার মাঝে আমি ডুবে রইলাম।

সেই আমার প্রথম ভালোবাসা, আমার হৃৎপিণ্ড দুমড়ানো শব্দ শোনা আলিঙ্গন। আমার অনভিজ্ঞ যৌবন ঐ আলিঙ্গন নিয়ে কী করবে কোনো কূল-কিনারা করতে পারল না। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এভাবে প্রথম ভালোবাসার ভার সহ্য করা যে কী কঠিন তাও বোঝান শক্ত। বিয়েবাড়ি থেকে এই বুঝি কেউ এসে পড়ল, এই বুঝি কেউ দেখে ফেলল—ভয়ের বদলে গভীর উত্তেজনা ও আনন্দে ডুবে রইলাম। ছোট্ট একটা পাখির মতো আমার শরীরে ভার রেখে সে বলল—কে যেন আসছে, আমাকে নিয়ে চলো। সে-অবস্থায় ওকে কাঁধে তুলে প্রায় ডাকাতের ভঙ্গিতে ছুটে চললাম। পিছনের মানুষ পিছনে পড়ে রইল। ওর বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কুয়াশা-ভেজা খড় সরিয়ে তার মাঝে আমাদের দু' জনের মতো জায়গা করে নিলাম। পাশাপাশি আরো দুটি খড়ের স্তূপ আমাদের পাহারা দিয়ে রইল। তারই মাঝে সঙ্গোপনে এবং আমার প্রায় অজান্তে ওর শাড়ির নিচে ব্লাউজের ভেতরে সুকোমল স্তনে হাত দিলাম। একটু পরেই কৃষ্ণচূড়া আমাকে আরো জোরে জাপটে ধরে কাঁদতে শুরু করল। সে কী আকুল কান্না। বলতে লজ্জা নেই সেদিন আমিও কেঁদেছি তার সঙ্গে। প্রথমে না বুঝে এবং পরে বুঝতে পেরে। কাদতে কাঁদতে সে বলল, ফাল্গুনে বিয়ে। মা-বাবার মতে বিয়ে হচ্ছে। বিয়ের পর চলে যাব আসামে। কাঁদতে কাঁদতে আমরা বুঝলাম আমাদের দেখা হাওয়াটাই নিয়তি। আমাদের ক্ষণিকের ভালোবাসাই হল আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পাওয়া ও দুর্ঘটনা। সে আমার শার্টের বোতাম খুলল, এবং অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে এক আনন্দঘন রতিক্রিয়ার সাহায্য করল। আরো অনেকক্ষণ পর আমরা উঠলাম। যতদূর সম্ভব ওর কাপড়চোপড় থেকে খড়কুটো ঝেড়ে তাড়ালাম। চুল ঠিক করল। তারপর মাকে ডেকে দরজা খুলে সে ঘরে ঢুকল। আমি ভুতে পাওয়া, চাঁদে পাওয়া বা পরীক্ষায় খুব ভালো নম্বর পাওয়ার মতো গর্বিত আনন্দে ঘরে চলে এলাম। কৃষ্ণচূড়ার সঙ্গে কথা হয়েছিল প্রতিবছর ঐ দিনটি আমরা স্মৃতি-বার্ষিকী পালন করব। আমরা বন্ধু হলাম।

দশ বছর পর গ্রামের খরস্রোতা নদী-তীরে বানে ডোবা ঘরে যাচ্ছি। হঠাৎ খুশিতে মেতে ওঠা একটি পাখির মতো সেই স্মৃতি মনে পড়তেই দেখি সামনে কৃষ্ণচূড়া। শহর থেকে গ্রামে যাওয়ার পথে একই নৌকোয় ওর সাথে দেখা। বড় রাস্তায় বাস থেকে নেমে দু' মাইল দূরে আমার গ্রাম। বড় রাস্তা মাঝে মাঝে পানিতে ডোবা। হাঁটুজল ভেঙে বাস চলতে চলতে আমাকে নিয়ে এল। নৌকো নিলাম, ছোট্ট নৌকো। নৌকো ছাড়তেই চেনা গলা পেছন থেকে ডাক দিল—মাঝি মাঝি। ফিরে তাকাতেই দেখি বাদল। সঙ্গে তার বোন কৃষ্ণচূড়া ও দুই ছেলেমেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে বারো বছর আগের রোমাঞ্চ বান ডাকল। ওর চোখেও সেই আগের মতো

উজ্জ্বল চাঞ্চল্য. শানিত কথা মুখে এবং চোখের ইশারায় ফিসফিস করে বলল, তুমি কি কাউকে ভালোবাসো ?

এখন আমি আর আগের মতো ঠিক লাজুক নেই। সেদিনের লক্ষীপেঁচার শেখান সেই কথাটি তবুও আগের মতো অবিকল মুখে চলে এল, তুমি।

বাদল ছেলেমেয়েকে শাসাচ্ছে। সে কি আমার মনের কথা শুনে নিয়েছে ? কৃষ্ণচূড়া অনেক দিন পর দেশে বেড়াতে এসেছে। এসেই যে-বানের দেখা পেয়েছে সে-বানের মূল উৎসও আগরতলা ও আসাম। ফনী, কর্ণফুলী ও ব্রহ্মপুত্রের কূলফাটা ঢল এসে তলিয়ে দিল চারদিক। তার ওপর বৃষ্টির দাপট। কৃষ্ণচূড়া সেই আগের মতো ঝলমলে, অবিকল আগের চেহারা, ব্যবহারেও এক চুল এদিক-ওদিক নয়। তফাৎটুকুও যেন অনেক দিন না দেখার জন্যে। সেদিন মাঘের কুয়াশার রাতে যে আনন্দঘন উৎসব হয়েছিল আজ দিন-দুপুরে নৌকোতে মনে মনে তার পুনরাবৃত্তি হল বুঝি। কৃষ্ণচূড়া খুব হাসিখুশি কথা বলে চলল।

বাদল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে জানে না আমরা চোখের পলকে কী কথা বললাম, জানে না বারো বছর আগের এক রাত্রির অমলিন ভালোবাসার কথা। প্রিয় পাঠিকা বা পাঠক, আপনারা এর নাম ভালোবাসা নয় বলবেন। চোখ বুজে এর দৈহিক রূপটি দেখতে পাবেন, নগ্নতা বলবেন এবং আরো অনেক কিছু। আমি আপনাদের কথা মানি না, কিন্তু কোনো যুক্তিও দেব না, সাফাইও গাইব না ! আপনাদের জীবনে এরকম কোনো ঘটনা ঘটলে তবেই বুঝবেন।

শেয়ালটা সাঁতারে এসে দরজা দিয়ে কখন ঢুকল, তারপর কখন ঘরের কোণের বেড়া বেয়ে উঠতে শুরু করল একটুও টের পাই নি। কাঠের উঁচু বড় সিন্দুকের ওপর আমার বিছানা। সেখানে বসে বসে দুপুরের খাবারের অপেক্ষা করছি। বাড়ি পাহারা দিচ্ছি। মা-বাবা ছোট ভাইবোন চলে গেছে পাশের গ্রামে। আমার মতো অনেকে বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। বানে ডোবা ঘর বিনা পাহারায় রাখা যায় না। মুন্সিদার নৌকোয় করে আমার মতো প্রায় সবার জন্যে খাবার আসে। পাশের গ্রাম উঁচু টিলার ওপর। প্রায় দু-এক বছর পর পর বান হয়, আর আমাদের পালাতে হয় সে-গ্রামে। আমরা বানভাসি গ্রামের মানুষ।

শেয়ালটা শেষ পার্যন্ত উঠল। আঁচড়ে-কামড়ে ও কসরত করে বেড়ার তাকের ওপর উঠে আয়েশ করে গা-ঝাড়া দিল। সবকিছু দেখে শুনে বললাম, যাক, তাহলে আর একা থাকতে হবে না। তোর সঙ্গে কথা বলা যাবে।

খুব ধকল গেছে কি ?—আমি বললাম।

উত্তরে সেও যেন বলল, ঠিক তাই, একেবারে নাস্তানাবুদ।

ক'দিন থাকবি ?

থাকি ! যে-ক'দিন পারি !

পেটে কিছু পরেছে ? মুরগী-টুরগী, মরা গোরু, ব্যাঙ ?

কিছুই না—বলে মাথা ঝাঁকাল, মুখ-ভেঙচি করল।

বললাম, ঘর-সংসার, পরিবার কোথায় ?

সেও কেন জানি না আমার কথার উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করল, তুই বিয়ে করেছিস ? তোর পরিবার ? নাকি মখলস ?

আমি হা হা করে হাসলাম। সেও খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসল, তারপর বাঁ হাতের থাবা দিয়ে চোখ-মুখ মুছল। জানতে চাইল খাবার-দাবার কিছু আছে কিনা।

উত্তরে বললাম, আছে। শুকনো চিঁড়ে, গুড়, মুড়ি আর চুরুট ও দেশলাই। কি, চলবে ?

ঘরে উত্তর-দক্ষিণ জোড়া বেড়ার লম্বা তাক। তার এক পাশটা আমার সিন্দুক থেকে হাতের নাগালে পড়ে। পুরানো দিনের মস্ত বড় সিন্দুক, চাপালিশ কাঠের তৈরি। মাথা সমান উঁচু। অর্ধেক ডুবে আছে পানিতে। তার ওপর আমার বিছানা। বেড়ার তাকে সংসারের নানা টুকিটাকি—কাপড়ের পুঁটলি, বাক্স, কিছু হাঁড়িকুড়ি, কুলাচালুন, বাতিদানী ইত্যাদি অনেক কিছু। তারই এক পাশে ফাঁকা দেখে শেয়ালটা উঠল। উঠে খুব করে গা ঝাড়ল।

তাক থেকে মাটির সানকি নিয়ে কিছু চিঁড়ে-মুড়ি দিলাম। বললাম, খা, খেয়ে দু' ঢোক পানি খেয়ে নে। তবে হ্যাঁ, তার জন্যে আমাকে সিন্দুকের আস্তানা ছেড়ে নামতে হল না। হাত বাড়িয়ে ওর সামনে গিয়ে তাকের ওপর তুলে দিলাম। ভয়ডর পেল না। শুঁকে দেখল, মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল এক নজর। বললাম, খেয়ে নে। খিদে পেটে অত জাতবিচার করতে নেই। খাবারেরও নয়, যে দেয় তারও না। ভয়েরও কিছু নেই। নে, শেষ কর।

খুব একটা চিবোলে না। স্বাদ পেল কিনা কিছুই বলল না।

তবে খাওয়ার ধরন দেখে মনে হল একেবারে অপছন্দ নয়। বললাম, পেট ভরল? এবার পানি খেয়ে নে।

তাকের ওপর থেকে মুখ বাড়িয়ে পানির নাগাল পায় না বলে সানকিতে ভরে তুলে দিলাম। খেয়েদেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মানুষের মতো বলল, মানুষ হলেও তোর দয়ামায়া আছে। এই প্রথম একজন দয়ালু মানুষ দেখতে পেলাম। সবাই আমাদের দেখলে লাঠিসোটা নিয়ে ওঠে, নয়তো কুকুর লেলিয়ে দেয়। দেখি, আমি কিছু করতে পারি কি না। কোনো দিন সুযোগ পেলে ফিরিয়ে দেব।

মনে মনে বললাম, তুই আবার কি উপকারটা করবি!

মুন্সিদা রাতের খাবার দিয়ে গেছে তার নৌকোয় করে। আমাদের বহু দিনের পুরোনো ঘাট-মাঝি আইনুদ্দিন মুন্সির সঙ্গে এল তার ছেলে আবুল। দুপুরে আনা টিফিন ক্যারিয়ার দিয়ে দিলাম। মুন্সিদাকে বললাম, একজন অতিথি আছে। কাল থেকে দুজনের ভাত পাঠাতে বলো।

শেয়াল ও আমি দু' জনে খেয়ে নিলাম। কলাগাছের ছোট্ট ভেলাটা ঘরের দরজায় বাঁধা আছে। তাতে চড়ে ভিটে ঘুরে এলাম। দু তিনটা হাঁক দিলাম, পাশের বাড়ির পল্টনকে ডাক দিলাম। সেও উত্তর দিল। একটু দূরে আছে শ্যামল, তারপর বাবু, বেশ খানিকটা দূরে বশর, মতিন, পুতুল ও টিটো। আকাশে ঝলমলে তারা। কৃষ্ণপক্ষের একাদশী। কোটি আলোকবর্ষ দূরের একটি তারা উত্তরাকাশ থেকে তাকিয়ে আছে। দুপুর থেকে বৃষ্টিটা থেমেছে। আকাশ প্রায় মেঘহীন। বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে মাঝে মাঝে গর্জন শোনা যায় কামান দাগার মতো। দক্ষিণ দিকের আকাশে ফল্‌স্‌ ক্রসের তারা একটু একটু দেখা যাচ্ছে। এক ডাকে সাড়া দিল পল্টন। তারপর বানের জলে বাহ্য-কর্ম সেরে আরেক বার পল্টনকে ডেকে বললাম, পড়ে পড়ে ঘুমোস না যেন। মাঝেমধ্যে গলা খাঁকারি দিস, গানটান গেয়ে শোনাস। সঙ্গে সঙ্গে সে গেয়ে উঠল, বানের জল চোখের জল হল একাকার···।

রাতে পাহারা দিতে হয়। এসময় ঘরের চালের টিন ও দামী কাঠ চুরি করতে আসে সংঘবদ্ধ দল। আমরাও সজাগ। সবাই মিলে মুন্সিদার নৌকো কেরায়া করেছি। সেটা সারারাত টহল দেবে, পালা করে পাঁচ-ছয় জন লোক থাকবে, আর আমরা তো প্রায় বাড়িতে দু-এক জন করে আছিই। পল্টন উত্তর দিল, সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছি। এখনো চোখে ঘুম লেগে আছে। ছাড়তে চায় না, গানও বের হচ্ছে না ঠিক মতো। তারপর গান ধরল, আকাশে প্রেমের বাদল নেই…।

ঘরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে কথা শুরু করলাম ওর সঙ্গে।

এবার একটু ঘুমিয়ে নে। নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস, কেউ তোকে ঘাঁটাবে না। মাথায় বাড়ি মারবে না। পড়ে পড়ে ঘুমিয়ে নে।

সেও বলল, রাতে তো ঘুমুই না। তবে আজ সারা দিন বানের পানিতে ভেসেছি। শরীরটাও খারাপ। রাতে খাবার খোঁজার ধান্দাও করতে হবে না। ঘুমুতে পারি বৈকি!

হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়।

তারপর সে বলল, শুভরাত। রাতে তোর চোখে ভালো মানুষের স্বপ্ন নামুক। মনের মানুষের স্বপ্ন।

ওর সামাজিকতা ও ভব্যতার পরিচয় পেয়ে খুব খুশি হলাম। তা ছাড়া মনের মানুষের স্বপ্ন দেখার কথাও বলেছে। এ তো রীতিমতো প্রাজ্ঞ! তাহলে শেয়ালও স্বপ্ন দেখে! আমিও বললাম, মস্ত বড় একটা মুরগীর স্বপ্ন যেন দেখতে পাস। শুভরাত, শুভরাত। তোর ইচ্ছে ফলবতী হোক। তারপর আমি ভাবলাম, কৃষ্ণচূড়া, কৃষ্ণচূড়া ···কৃষ্ণচূড়ার আগুন তুমি···।

রাত ভালোয় ভালোয় কাটল। একবার টুপটাপ বৃষ্টি পড়েছে। বানের জলে বৃষ্টির শব্দ সেতারের ছড়িয়ে পড়া সুর মনে হয়। আবার কান পেতে শুনি কৃষ্ণচূড়ার নিঃশ্বাসের শব্দ, আর তার শরীরের সেই সুগন্ধ। ঘুমের ঘোরে কি স্বপ্নে জানি না, মনে হল বেড়ার তাকের ওপর বসে কৃষ্ণচূড়া আমাকে ডাকছে। স্বপ্নের মাঝে ভাবছি আমি জেগে আছি, আবার ভাবছি আমি স্বপ্ন দেখছি। আমার স্বপ্নের রাজ্যও বানে ডুবে আছে, আমি নৌকোয় বসে বসে ছলছল শব্দ শুনি, বৃষ্টি আর বৃষ্টির সেতার শুনি। রাতে ভালো ঘুম হল না।

সকালে প্রভাত জেলের নৌকো পেলাম। সে লোকজন আনা-নেওয়া করতে বেরিয়েছে। ডাক দিতেই সে এসে ভিড়ল। বললাম, আমাকে নাও, আজ সারা দিন আমার ভাড়া খাটবে। পল্টনকে ভেলাটা দিয়ে বললাম, পাহারা দিস। আমার অতিথিকে তাড়াস নে। অতিথিকে বললাম, ভয় নেই। ভাত খেয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোস। পালিয়ে যেতে চাস নে যেন। উত্তরে সে বেশ হাসিখুশি তাকাল। হৌ হৌ করে দু-তিনটা অস্ফুট ডাক দিল। শেয়াল শেয়াল গন্ধ ছাড়ল। তারপর যেন বলল, ভালোবাসার মূল্য অনেক।

প্রভাত দেখল। পল্টন বলল, অবাক কাণ্ড! মজার ব্যাপার। ওরে নিয়ে কি করবে?

আমি হাসলাম। তারপর দরজা বন্ধ করে প্রভাতের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। আকাশে মাঝে মাঝে পুষ্কর মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে হয়তো। ধোওয়া-মোছা গাছের পাতা ঝলমল করছে। গলা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কলাগাছ। গ্রামের শোভা বট-গাছের প্রাঙ্গণ জলের নিচে। ওর পাশ দিয়ে নৌকো চলল। এমন সময় মতিন ডেকে বলল তার জন্যে একটা দেশলাই নিয়ে আসতে।

প্রভাত বলল, দেশটা ছারখার হইয়া গেল। গত বছর হইল খরা, নদীর পানি পর্যন্ত শুকাই গেইল, এইবার হইল বান। মানুষ যাইব কোন হানে? হিয়ালডা সোন্দর জাগা পাইছে।

আমিও তাই ভাবছি। জিজ্ঞেস করলাম, তোর ছেলেমেয়ে কোথায়?

ওরা কলেজের টিলায় আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে অনেক মানুষ, মানুষের গায়ে মানুষ। দু' বার রিলিফ পেয়েছে বলল। এক দিন দিয়েছে আটা আর এক দিন গম। গম ভাঙাবে কোথায়? বাজারের মেশিনঘরই ডুবে গেছে।

কথায় কথায় অনেক কথা হয়। বৃষ্টি আসতে আসতে হাওয়ার তোড়ে চলে যায়। বাদলের বাড়িতে চললাম। সে ও তার ভাই ঘরের ভেতর মাচায় বসে আছে। দরোজা দিয়ে নৌকো ঢুকিয়ে ওকে তুলে নিলাম। ওদের পুকুরের পাড় অনেক উঁচু, তা-ও ডুবে গেছে। বড় বড় মাছ ছিল ওদের পুকুরে, দশ বারো বছরের পুরনো রুই-কাতলা—সব মাছ গেছে। অনেক দিন পর আবার ওর সঙ্গে বন্ধুত্বের পুরোনো দিনগুলোর কথা শুরু করলাম। মাঝে মাঝে হৃদয়টা খুলে ধরতে এত যে ভালো লাগে! ওকে ছাড়া কৃষ্ণচূড়ার কাছে যাওয়া ঠিক হবে না ভেবেই সঙ্গী করলাম। এখনো বোধ করি পিছু টান আছে। হ্যাঁ, বন্ধুত্ব সামাজিকতা ও লৌকিকতা কিছুই ফেলা যায় না। নৌকোয় করে বিল পাড়ি দিতে দিতে দেখা হল রিলিফের হোমরাচোমরাদের সঙ্গে। স্রোতের শেওলার মতো বা স্মৃতিতে গা-ঘষার মতো কৃষ্ণচূড়া এল অনেক দিন পরে। আকাশপথে পারি দিয়ে গেল হেলিকপ্টার। চারদিকে আধ-ডোবা গ্রাম। শুধু উত্তর দিকে কলেজের টিলা ও নীলসাগর গ্রামের টিলা জেগে আছে। সেদিক থেকে পাহাড়ী ঢল নেমে এসেছে। বাদল বলল, রোয়া ধান থাকবে বলে মনে হয় না। দেখছিস কেমন ঘোলা পানি! পলি পড়ে রোয়া পচে যাবে। কিছুই থাকবে না।

প্রভাত বলল শেয়ালটার কথা। বাদলও খুব অবাক হল। জিজ্ঞেস করল, ওটাকে নিয়ে কি করবি রে? শেয়াল হল অস্বস্তিকর ও বিটকেলে জীব। একটা ভালো শেয়ালের গল্প তুই কখনো শুনেছিস? বইয়ে পড়েছিস?

তুই ঠিকই বলেছিস হয়তো। কিন্তু ওটা তো আর আমার পোষা নয়। এসে জুটেছে। দেখি না কি করে! এবার হয়তো একটা ভালো শেয়ালের গল্প পেয়ে যাব। দেখা যাক!

নীলসাগর গ্রামে পৌঁছতেই অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বুড়ি দয়ার মা লাঠি হাতে বাজারের দিকে চলেছে। দেখা হতেই পুরোনো কথা শুরু করল। কবে একবার পাঁচটা টাকা দিয়েছিলাম, তামাক কিনে দিয়েছিলাম—মনেও নেই আমার। রাস্তার ওপর বাজার বসেছে। রাস্তার কাঁধ বরাবর পানি। লোকজনে গমগম গিজগিজ করছে। তরিতরকারী উঠেছে। ছোট ছোট পেঁপে, কচি ঝিঙে, কাঁকরোল, তেলাকুচি পাতা, পুঁইডাঁটা ও ধুঁদুল—যে যা পেয়েছে বানে ডোবা ভিটে থেকে তুলে নিয়ে এসেছে। ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার বসে আছে টিনের চালের চা-এর দোকানে। লোকজন তাকে ছেঁকে ধরেছে রিলিফের আটার জন্যে। ওর ইউনিয়নে কুড়ি বস্তা গম এসেছে। গম ভাঙাবে কোথায়? একটা কলও নেই, সব পানির নিচে। গগন মিয়ার সঙ্গে দেখা হল। পরান আলী অনুনয় করে বলল দশটা টাকার জন্যে। অধ্যাপক আশরাফ আলী লুঙ্গী পরে লোক-জন নিয়ে গ্রামে-গ্রামে যাচ্ছে। কোথায় কে কী অসুবিধেয় আছে, কার ঘরে অসুখ, রাস্তায় আশ্রয় নিয়ে মানুষের কী হাল, খাওয়ার পানির সমস্যা—সব যেন তার নিজের সমস্যা। লোকটি পারেও বটে। কলেজ-টিলার কয়েক শ' পরিবারকে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছে। ওরা কেউ না-খেয়ে নেই। বাদল তার বড় বোনের শ্বশুরবাড়িতে বলে এল সবকিছু ঠিকঠাক করে রাখতে, ফেরার পথে সে ভাত নিয়ে যাবে। আমি কিছু মুড়ি ও চিঁড়ে কিনে থলেয় ভরে নিলাম। থানার দারোগার সঙ্গে দেখা হতেই ডেকে নিয়ে গেল। ফলে কিছু প্রোটিন বিস্কিট মিলল।

বাদলের বোনের বাড়িতে পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণচূড়া ছেঁকে ধরল শেয়াল সম্পর্কে জানতে। ওকে দেখাতেই হবে। শেয়ালের খাওয়া-দাওয়া

স্বভাবচরিত্র—কত রকম প্রশ্ন। ওর ছেলেমেয়ে দুটিও ঝাঁপিয়ে পড়ল। দয়ার মাকে ডেকে নিতে হবে। তার বাড়ির ছাদে কী দরকারী জিনিষ আছে সেটা নিতে হবে। দুদু মিয়াকে পেঁাছে দিতে হবে তার ঘরে। পল্টনের জন্যে একটা মানচিত্র নিয়ে যেতে বলেছে। ত্রিপুরার রাতাছড়া, ধোঁয়াছড়া, কৈলাসহর—কোথায় কোন দিকে যাওয়া যায় সে দেখবে। বানে ডোবা ঘরে বসে তার এ খেয়াল কেন জাগল বলা মুশকিল। সে সব সময় এরকম খেয়ালী। আরো আছে সুবলের মা। তাছাড়া এর জন্যে খাবার জল, তার জন্যে বিড়ি ও তামাক—কত কী! হঠাৎ ঝমঝম করে নামল বৃষ্টি। আকাশ ফুঁড়ে ডাকল দেয়া। একটা কুরকাল ডাকল পদ্মপুকুর পাড়ের তালগাছে বসে। নৌকোয় পেঁাছে দেখি কৃষ্ণচড়া তার ছেলেমেয়েদের ফাঁকি দিয়ে ছাতা মাথায় বসে আছে। প্রভাতের সঙ্গে কথা বলছে। দয়ার মা, দুদু মিয়া, সুবলের মা, বাদল এবং এর-ওর জিনিষপত্র নিয়ে প্রভাতের নৌকো চলতে শুরু করল। টুপটাপ বৃষ্টি পড়ছে, কলকল স্রোত বইছে। কৃষ্ণচূড়াকে দেখা অব্দি ভালো ও মন্দের জ্বর উঁকি দিচ্ছে শরীরে। জ্বরই-বা বলি কি করে? মন্দও বলছি কেন? ছাতার নিচে বসে কী সুন্দর তাকিয়ে দেখছে বৃষ্টির ফোঁটা। কৃষ্ণচূড়া চিরকালই একরোখা ও খামখেয়ালী।

বাদল কথা শুরু করল, যাই বলিস, তুই একটা ঘটনা করে বসলি। দুনিয়ার ঐ একটা প্রাণীর প্রতি আমার কোনো মায়ামমতা নেই, কোনো আকর্ষণ নেই। একটা ভালো শেয়ালের গল্প বিশ্বসাহিত্যে তুই খুঁজে পাবি নে। এখন দেখবি তোর জিনিষপত্র ও বিছানার দফারফা। আমার ভাবতেও কেমন স্বপ্নময় মনে হচ্ছে। দুদু মিয়া বলল, ওটা মারলে এক টুকরা গোস্ত আমারে দিও। কোমরের ব্যথাডা কাহিল কইরা মারছে। সুবলের মা-ও বলল ঐ কথা। শুধু দয়ার মা বলল, বানে ভাইসা আসা জীবন মাইরো না। গুনাহ অইব। ও অইল গিয়া অতিথ।

কৃষ্ণচূড়া সবার কথা মন দিয়ে শুনে বলল, সত্যি, অতিথির মন জোগান উচিত, অতিথি ও দূত অবধ্য। তারপর ছলছল চোখে আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, তুমি কি সত্যিই ওটাকে মারবে? ঘরের দরজা বন্ধ করে এসেছ?

আমি হাসতে হাসতে সবার দিকে এক বার তাকিয়ে কৃষ্ণচূড়ার দিকে ফিরে বললাম, তোমার কি মনে হয়?

বাদল বিরক্ত হয়ে বলল, তোরা কি থামবি? বাঘ নয়, হরিণ নয়, এমনকি কোড়া পাখিও যদি হত একটা কথা ছিল। শেয়াল হচ্ছে একটা বদখত প্রাণী।

এমন সময় বৃষ্টি ধরে এল, ঝলমল করে উঠল রোদের আকাশ, এবং টলটল জল। প্রভাতও বলা-কওয়া ছাড়া গান ধরল, সোনা বন্ধুরে বৈদেশেতে কেন গেলা রে...। গান শুনে সবাই একসঙ্গে চুপ মেরে গেল। প্রভাতের গলায় গানটা ভারি ভালো লাগল। বুড়ি দয়ার মা পর্যন্ত ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল, সুরে সুরে মাথা নাড়তে লাগল। দুদু মিয়া নৌকোর বেড়ার পাটাতনে তাল ঠুকতে লাগল। গলা-জলে ডুবে গাছপালা শুনল, আকাশের ছেঁড়াখোঁড়া অলক মেঘ দু' চোখ ভরে দেখল, সুবলের মায়ের চোখ চিকচিক করে উঠল। কৃষ্ণচূড়ার কথা তো বলাই বাহুল্য। আমি? আমার কথা থাক। প্রকৃতি ও মানুষ আমার কাছে অচ্ছেদ্য।

প্রথমে বাদল নামল। কৃষ্ণচূড়া বাদলকে বলল সে একটু পরে ফিরবে। তারপর নামল দুদু। সে বলল ফেরার পথে তাকে যেন তুলে নেওয়া হয়। নামল দয়ার মা, সে বিকেলে অন্য কোনো নৌকোয় ফিরবে। তার নাতিকে তিন দিন ধরে দেখে না বলে মনটা ছটফট করছে। সবশেষে নামল সুবলের মা। বেড়ায় ছোট দেউড়িঘরে আছে সুবল। ওদের মাটির ঘর পড়ে গেছে, টিনের চাল উবু হয়ে পড়ে আছে। সুবল বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছে। ভাবনা ছাড়া আর কিছু নেই-ও।

প্রভাত আবার নতুন গান ধরল—আমি স্বপন দেশে পথ চলেছি বন্ধুরে...! রমেশ শীলের গান। আমার বুকটা ধক্ ধক্ করে উঠল। প্রভাত এ-গান ধরল কেন? সে কী আমার মনের কথা টের পেয়েছে? কৃষ্ণচূড়া তো আজ আগের সেই দিনে দাঁড়িয়ে নেই! তার বড় ছেলের বয়স এগারো বছর, তাকে আসামে রেখে এসেছে। গান শুনে কৃষ্ণচূড়ার মনে কোনো ভাবান্তর হয়েছে বলে মনে হয় না। আমার দিকে পরিপূর্ণ ও স্বাভাবিক চোখে তাকাচ্ছে। মানুষের চোখ আগেভাগে মনের কথা বলে দেয়। কৃষ্ণচড়ার চোখে আছে সরলতা ও মাধুর্য। গান শুনতে শুনতে সে কখনো বানের দৃশ্য দেখে, জলে-ডোবা সারি সারি গাছপালার করুণ মিনতি শোনে। এক বার বলল, জানো, গাছেরা বলছে তোমাদের হাতে আমাদের নিধন নয়, বরং আমাদের অনিষ্ট করলেই তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। পানিতে আমরা মরব না।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আর কী কী বলে? তুমি তো দেখি আসামে গিয়ে প্রকৃতিবিদ হয়ে গেলে।

উত্তরে সে বলল, আসলে প্রকৃতি আমাদের এই শিক্ষাই দেয়। প্রকৃতির হাত থেকে কারো রেহাই নেই। প্রকৃতি প্রতিশোধপরায়ণ। বানের পানির কথা ভাবো।

প্রভাত তখন গানের শেষ কলি উল্টেপাল্টে গাইছে,

আমি নিজেকে নিয়ে হারিয়ে যাব বন্ধুরে
আমি নিজের তরে কিছু রাখব না ধরে বন্ধুরে...

প্রভাতকে বাইরে রেখে হাঁটুপানি ভেঙে ঘরে ঢুকতেই শেয়াল দাঁড়িয়ে কাঁধের লোম খাড়া করে চোখে-মুখে রাগ প্রকাশ করল। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, কী হয়েছে? খিদে পেয়েছে? একা একা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিস? ক্লান্ত? ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজনের কথা মনে পড়ছে?...রাগ কেন? ঘরের দরজা বন্ধ করে গেছি বলে? ছেলেমেয়ে ও পরিবারকে হারিয়ে এসেছিস? কি হয়েছে?...

কৃষ্ণচূড়া অবাক চোখে খুঁটে খুঁটে দেখতে লাগল। সে যখন কলকাতার চিড়িয়াখানায় গিয়েছিল তখন সেখানে শেয়াল ছিল না। ঢাকার চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখেছিল শেয়ালের লেজ। খাঁচার ভেতরের গর্তে সে তখন দিবানিদ্রায় মগ্ন ছিল। আজ সামনা-সামনি পেয়ে ভালো করে দেখছে। সারা গায়ে ধূসর ঝাঁকড়া লোম, মুখে চোর-চোর ভাব... !

অনেকক্ষণ পর কৃষ্ণচূড়া কথা বলল। কী গুণে পোষ মানালে!

বললাম, পোষ মেনেছে কিনা জানি না। বানের তোড়ে ভেসে এসেছে। মনে হয় অনেক কিছু বোঝে, বুদ্ধিও রাখে। আলাপ করার চেষ্টা করো। খুব আলাপী।

আমার সঙ্গে কিছু কিছু বলেছে। আমার ঘর-সংসারের কথা, ওর দানাপানির খতিয়ান, পছন্দ-অপছন্দ—কত কথা!

তোমার আবার ঘর-সংসার কবে হল? কাকে ভালোবাসো? বিয়ে করেছে বুঝি!

গত রাত ঘুমুবার আগে শুভরাত্রি জানিয়েছে। সুন্দর স্বপ্ন দেখার কথা যে বলতে হয় তাও জানে।

কৃষ্ণচূড়া অবাক হয়ে বলল, স্বপ্নের কী বোঝে সে? শেয়ালেরা আবার স্বপ্নও দেখে বুঝি? তুমি খুব হাসাতে পারো দেখছি।

আরো কত কথা বলেছে! এক বার চেষ্টা করে দ্যাখোই না।

আমরা পা তুলে বিছানায় বসেছি। বসার জায়গা তো আর কোথাও নেই, সিন্দুকও বেশ উঁচু, কৃষ্ণচূড়াকে ধরে তুলতে হল। প্রভাত গেছে পল্টনের জিনিস দিতে। মাঝে মাঝে ঢেউ ভেঙে পড়ে ঘরের বেড়ায় এসে। একজোড়া শালিক কথা-কাটাকাটি করছে উঠোনের আমলকি গাছে বসে। কৃষ্ণচূড়া দু' হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে এক বার আমার দিকে তাকায় আবার শেয়ালকে দেখছে। সে তেমনি হাল্কা-পাতলা আছে। বয়স বাড়লেও চোখের কোণে ভাঁজ পড়ে নি, কিন্তু অনেক কিছুর বদল হয়ে গেছে। হঠাৎ কৃষ্ণচূড়া গুন গুন করে গান ধরল।

গান শুনে নাকি অন্য কোনো কারণে জানি না শেয়াল উসখুস শুরু করল, রাগ দেখাতে লাগল এবং পিঠের লোম খাড়া করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। মুখে আর চোর-চোর ভাব নেই।

হঠাৎ গান বন্ধ করে কৃষ্ণচূড়া বলল, আপদটা বিদেয় করো। আর পারি নে বাপু, ঐ দ্যাখো রাগে ফুঁসছে। তারপর আমার দিকে তাকাচ্ছে, কখন আক্রমণ করে বসে বলা যায় না। বলতে বলতে সে আমার কাছে সরে এল, এক হাত আমার কাঁধে রেখে বলল, দ্যাখো দ্যাখো, কেমন কটমট করে তাকাচ্ছে. আমার ভীষণ ভয় করছে, আপদটা দূর করো. একটা বিহিত করো···।

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, কোনো ভয় নেই। আমার হাতে খাবার খেয়েছে। তারপর শেয়ালের দিকে তাকিয়ে বললাম, কিরে অমন করছিস কেন? একটু হাসি হাসি মুখ কর, অভয় দে, এক জন অতিথি···বুঝলি?

না, শেয়াল কোনো কথা শুনল না, বরং আরো বেশি রাগ দেখাতে লাগল! আমি তাড়াতাড়ি কিছু খাবার এগিয়ে দিলাম। বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে দিতে দিতে বললাম, তুইও আমার অতিথি। কৃষ্ণচূড়া আমার অনেক দিনের বন্ধু, এগারো বছর পর এসেছে···একটু হাসি হাসি মুখ কর?

কৃষ্ণচূড়া আমাকে আগলে ধরতে ধরতে বলল, কি যা-তা বলছ? আর কাজ পেলে না, শেয়ালকে পোষ মানতেও চাও, ভালোবাসার কথা শোনাও? ভালোবাসার কী বোঝে? তুমিই এখনো বুঝলে না!

আমি কিছু না বলে কৃষ্ণচূড়ার মুখের দিকে তাকালাম। সেও আমার মুখের কাছে মুখ এনে তাকিয়ে রইল।

সঙ্গে সঙ্গে শেয়াল প্রতিবাদের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। অমনি কৃষ্ণচূড়াও আমাকে দু' হাতে প্রবল বেগে আগলে ধরল। সেই শালিক জোড়া ডেকে উঠল, কীকি-কীকি-কীকি, প্রেইক-প্রেইক, টুই-টুই। স্মৃতি ও অনেক দিন আগে ফেলে আসা কথাগুলো বেনো জলের সঙ্গে মাতামাতি শুরু করল। শেয়াল একবার আমার দিকে আবার কৃষ্ণচূড়ার দিকে তাকিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় আমাকে শাসিয়ে দিল।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বিছানার নিচ থেকে রামদা বের করে ধমক দিয়ে বললাম, চুপ, এত রাগ দেখাচ্ছিস কেন? কি হয়েছে?

সেও আর দেরি করল না, এক লাফ দিল পানিতে, তারপর সাঁতার কেটে দরজা পেরিয়ে চলে গেল। একবার ডাকব ভাবলাম, কিন্তু কৃষ্ণচূড়া ততক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমার বুকে মুখ লুকিয়ে বলল. ওর সামনে খুব লজ্জা করছিল, বোধয় বুঝে-শুনে চলে গেল।

[গল্পগ্রন্থ : আকাশে প্রেমের বাদল]

একা বা অশোকমঞ্জরী

অশোক গাছের নিচে বসে ওরা কথা শুরু করল। আস্তে আস্তে উঠে আসছে সোনার থালা চাঁদ। পার্কের পাহারাদার বলে গেল, ভয় নেই, আমি কাছেই আছি।

ইলিয়াস বলল, চোদ্দ বছর ধরে দেখছি এই অশোকের শুধু নিচের একটি ডালেই ফুল ফুটছে। আর অন্য সব ডালে পীতাভ নতুন পাতা। চোদ্দ বছরে একটুও পরিবর্তন হয় নি।

জিনাত বলল, চোদ্দ বছর? তোমার সঙ্গে পরিচয় তো মাত্র পাঁচ বছর। আগে কার সঙ্গে আসতে?

ইলিয়াস মনে মনে সব ভেবে নিল। চোখের ওপর ভেসে উঠল একটি মুখশ্রী। অমনি সে নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলল, চোদ্দ বছর ধরে আমি আশোক গাছটি লক্ষ করছি। মাঝে মাঝে গাছের ছাল উধাও হয়ে যায়, তবুও ফুল ফোটে থোকা থোকা, ঐ একটি ডালে। আজ যেমন লাল-হলুদ ফুলগুলো নিচের ডালে দেখছি আগেও তেমনি দেখছি।

তোমার সব মনে আছে? প্রতিটি স্মৃতি? জিনাত বলল।

আছে তো। আমরা এখানে বসছি ছ'বছর ধরে—ইলিয়াস বলল।

না, পাঁচ বছর।

তোমার একটুও মনে নেই। তুমি একটি বছর বেমালুম হাওয়া করে দিয়েছে। ছ' বছর ধরেই বসছি।

ওরা আবার পারিজাত ফুল নিয়ে শুরু করল। ইলিয়াস বলল, গত বছর তোমাকে পারিজাত দিয়াছিলাম মনে পড়ে?

জিনাত সঙ্গে সঙ্গে বলল, পারিজাত নয় অপরাজিতা।

আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমরা এখানে এই অশোকের নিচে বসেছিলাম। নিচের ডালে কয়েক থোকা ফুল ফুটেছিল। কার্জন হলের বাগান থেকে তোমার জন্যে পারিজাত এনেছিলাম।

জিনাত বলল, তুমি বোধহয় স্বপ্ন দেখছ। স্বপ্নের কোনো প্রসঙ্গ এখন তোমার মনে পড়ছে। পারিজাত নয় অপরাজিতা।

এসময় মাথার ওপর কোকিল ডেকে ওদের জানিয়ে দিল দিন শেষ হয়ে গেছে। আকাশে সোনার থালা চাঁদ রুপোলি হচ্ছে। কোকিলটা ওদের জন্যেই যেন শেষবারের মতো গাইল।

জিনাত আবার বলল, তুমি কি সত্যিই পারিজাত এনেছিলে?

সত্যিই। অশোকের মতো থোকায় থোকায় ফোটে।

তাহলে আমাকে নয় আর কাউকে দিয়েছিলে।

অমনি ইলিয়াসের মনে পড়ে গেল ছয় বছর আগের ঘটনা। সে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র। সেই থেকে দেখতে দেখতে ছয়টি বছর কেটে গেল। এখনো সে পড়া শেষ করতে পারে নি। এ-বছরের পরীক্ষা ও-বছরে গড়ায়। গড়িয়ে আরো এক বছর শেষ হয়ে যায়। তবুও পরীক্ষা হয় না। প্রথম বর্ষে সে মেডিকেলের তুহিনার প্রেমে পড়েছিল। সে এখন ইন্টার্নী ডাক্তার। ইলিয়াস এখনো ছাত্র। ইলিয়াস বলল, তাহলে কি নাগকেশরের গুচ্ছ ছিল? আমার স্পষ্ট মনে আছে প্রত্যেক বৈশাখী পূর্ণিমায় তোমাকে ফুল দিয়েছি। প্রত্যেক বছর নতুন নতুন ফুল। প্রথম বছর মালতী, পরের বছর পারিজাত, তারপর ঝুমকো, কদম, মুচকুন্দ ও অপরাজিতা।

ছয় না, পাঁচ। পাঁচ বছর পাঁচ রকম ফুল। আমি পর পর সাজিয়ে দিচ্ছি। মালতি, ঝুমকো, মুচকুন্দু, পারিজাত ও অপরাজিতা এবার পারুল। আমি আগে কোনোদিন পারুল দেখি নি। শুধু অপরাজিতা ছিল পরিচিত ফুল। তাও পাঁচ পাপড়ির অপরাজিতা আমার চোখে পড়ে নি। সে বছর এত নীল অপরাজিতার মাঝে একটি সাদা অপরাজিতা কেন দিয়েছিলে? সাদা অপরাজিতা কিসের প্রতীক?

ইলিয়াস সাদা অপরাজিতার কথায় গেল না। তার মনে পড়ছে পারিজাতের কথা। চোদ্দ বছর আগে সে ছিল এগারো বছরের বালক। বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাব স্কুলের ছাত্র তখন। বন্ধু ছিল আসাদ। সে-ই বলেছিল রমনা পার্কে যেতে। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। স্কুল ছুটির দিন। নীলক্ষেতেই বাসা, তাই বের হতে পেরেছিল মাকে বলে। সেই প্রথম দুই বন্ধুতে মিলে নিভৃতে পার্কে যাওয়া। অশোকের একটি ডালে কয়েক থোকা ফুল ফুটেছিল। তারপর থেকে প্রতি বছর বুদ্ধ পূর্ণিমায় পার্কে যেত। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর থেকে সে একা হয়ে যায়। আসাদ চলে যায় চট্টগ্রামে। এখন একেবারে বিদেশে। পূর্ণিমার সন্ধেরাতে পার্কে হাঁটতে হাঁটতে চাঁদ দেখা এখন তার ব্যক্তিগত সুখ। না, হবি নয়। হবি অন্য জিনিস। ঢাকায় তার কয়েকটি একান্ত ব্যক্তিগত জায়গা আছে। ফুলার রোডের দুই প্রান্তের সড়ক দ্বীপ, শেরাটন হোটেলের পুব দিকের নাগলিঙ্গম গাছটি যেখানে ছিল তার নিচটা, আর্ট ইনস্টিটিউটের শুকিয়ে যাওয়া পুকুরের পাড় আর এই অশোকতলা। সবকথা সে জিনাতকে বলেছে। জিনাতের সঙ্গে সব জায়গায় বসেছে। ফুলার রোডের দক্ষিণ মাথার সড়ক দ্বীপে কেউ বসে না। ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটা দেখলে তার গা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সলিমুল্লাহ হলের সামনের বিশাল রেন ট্রি-রা সমীহ আদায় করে। ইলিয়াস এক সময় চুপ করে যায়। জিনাতও চুপচাপ। রাস্তায় গাড়ির শব্দ ছাড়া মাঝে মাঝে পার্কের কোনো গাছে যেন পাপিয়া ডাকছে। সোনার থালা চাদ রুপোর বরন হয়। আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যায়। রাত যত বাড়বে চাঁদ নিষ্ঠুর হয়ে উঠবে। কারো দুঃখে তার কিছু যায় আসে না। কারো কথা সে ভাবে না। অনন্তকাল ধরে সে বস্তুর মতো সবকিছু লক্ষ্য করে যাচ্ছে। পৃথিবী তো তার মা। তার মা বেঁচে আছে, সে মৃত। ইলিয়াস ভাবে তার মা বেঁচে নেই, সে নিজেই বেঁচে আছে। বেঁচে থাকতে থাকতে হাঁফিয়ে উঠেছে। গেল বসন্তও গুরুভার ছিল। জীবন এখন বোঝার মতো।

জিনাত বলল, গত বছর তুমি অপরাজিতা দিয়েছিলে। মালতী, ঝুমকো, মুচকুন্দু, পারিজাত ও অপরাজিতা। এবার এনেছ পারুল।

ইলিয়াস আমতা আমতা করে বলল, অপরাজিতা নয়, পারিজাত। গতবছর ছিল পারিজাত।

না অপরাজিতা। লতাসুদ্ধ অপরাজিতা। তার মাঝে একটি সাদা পাঁচ পাপড়ির অপরাজিতা ছিল।

ইলিয়াস বলল, তুমি কি ঠিক বলছ? তোমার স্মৃতিশক্তি কি তাই বলছে?

হ্যাঁ তাই। ঠিক তাই।

এ সময় কোকিলটা আবার ডেকে উঠল। সে তো সবই জানে। রাতেও সে পার্কে ডাকে। সেও পাঁচ বছর ধরে তার সঙ্গী নিয়ে রমনা পার্কে আছে। সে সবকিছু জানে, কিন্তু মানুষকে সে বোঝাবে কি করে? মানুষ তার গানের অর্থ ও ভাষা শিখতে চায় না। বসন্তের আনন্দের পাখি বলে তাকে ডাকে। ভালোবাসার দূত বলে। সে খুব করে বলতে চাইছে গত বছর একে অন্যকে পারিজাত নাকি অপরাজিত দিয়েছিল। রমনা পার্কের কোথায় অপরাজিতা আর কোনখানে পারিজাত আছে সে ভালো জানে। সে ডেকে বলল, তোমরা দেখতে চাও?

ইলিয়াস বলল, আসলে তুমি আজ আমার কথা মানবেই না। তবুও বলছি একবার মনে করে দ্যাখো।

জিনাত বলল, আমি জানি আগের বছর পারিজাত এবং গত বছর অপরাজিতা দিয়েছিলে। প্রত্যেকটি ফুল আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

কোকিলটা আবার ডেকে বলল, ঠিক, ঠিক ঠিক আমি আবার বলছি, জীবন মধুর। সামনে পড়ে আছে ভবিষ্যৎ। আমরা বসন্তে জোট বেঁধে ডাকি। ওই তো আমার সঙ্গী। তোমরা যদি আমার কথা বুঝতে তাহলে আমি সব খুলে বলতে পারতাম। কার কথা সঠিক বুঝিয়ে বলতে পারি। তোমরা তো আমার কথা বোঝ না। ভালোবাসার কিছুই বোঝ না।

ইলিয়াস বা জিনাত কেউ যেন হার মানবে না। জিনাত এবার বলল, চলো উঠি।

ইলিয়াস বলল, আমার ডায়েরীতে সব লেখা আছে।

কোকিল বলল, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। আমি জানি আসল সত্য। কিন্তু তোমরা তো আমার কথা শুনতে চাও না। আমাদের ভাষা শিখতে চাও না। প্রকৃতির ওপর তোমাদের আস্থা নেই।

পরের বছর বৈশাখী পূর্ণিমায়ও সেই অশোক গাছের নিচের ডালটিতেই ফুল ফুটেছে। ইলিয়াস নিয়ে এসেছে দুষ্পাপ্য সেঞ্চুরী ফুল। সেই আগের মতো কোন বছর কোন ফুল দিয়েছিল তা নিয়ে ওরা কথা তুলল না। কোকিলও আগের মতো কিক কিক করে অন্য কিছু আর বলল না।

এবার ইলিয়াসের সঙ্গে জিনাত যে নেই।

[গল্পগ্রন্থ : আকাশে প্রেমের বাদল]

যুদ্ধের এক গীতিময় সন্ধ্যায়

বড় ঘরের সামনের চাল ছাড়িয়ে উঠেছে নতুন পেয়ারা গাছটি। ফলের গাছ বলে আর কাটা হল না। চোখের সামনে বেশ ডাগর হয়ে সে নিজেকে মেলে ধরেছে। নতুন বলে পাতাগুলো বেশ পুষ্ট ও বড়। আমার যত্ন তো আছেই। সারা শীতকালটা ওর গোড়ায় পানি দিয়েছি, আদর-ভালোবাসা দিয়েছি। গাছেরা যদি তা বুঝতে পেরে থাকে তাহলে সে অনেক পেয়েছে। আমার বিশ্বাস গাছও ভালোবাসা বোঝে, নইলে অত তরতর করে বাড়ল কি করে? মনে হয় কাছে গেলে সে পাতার হাত দিয়ে আমাকে ডাকে, গা দুলিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে, পুন্‌পুন্‌ করে কথা বলে, হ্যাঁ, ঠোঁট উল্টিয়ে অভিমানও প্রকাশ করে। একেবারে প্রেমিকের মতো। আর সন্ধে হতে না হতেই পাতারা বেশ উর্ধ্বমুখী হয়ে যায়, আবার সূর্য ওঠার একটু পরেই দিনের কাজের জন্য তৈরি হয়ে স্বাভাবিক হয়ে যায়। হ্যাঁ, আমি ওর স্বভাব-চরিত্র বুঝে নিয়েছি।

এবার আমার পরিচয় দেই। আমার নাম আদিলা। মা আদর করে বকুল নামেও ডাকে। বাবা হঠাৎ করে অসুখে পড়ে শয্যাশায়ী। মা সারাদিন সংসারের কাজে ব্যস্ত। আমি বি. এ. পড়ছি। ১৯৭১ সাল। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি গেল উত্তাল আন্দোলনে আর মার্চ মাস শেষ হতেই ছোট ভাই না বলে না কয়ে মুক্তিযুদ্ধে চলে গেল। সাদী আমার পিঠোপিঠি এবং একমাত্র ভাই। বাবা সম্ভবত ওর কারণেই শয্যাশায়ী, প্রেসারে ভুগছে। মা মাঝে-মধ্যে সাদীর কথা বলে। সব কথার শেষে বলে, প্রিয়জনের জন্য মানুষকে অপেক্ষা করতে হয়। আমিও অপেক্ষা করছি।

সেদিন আমি জানালার এক কোণে দাঁড়িয়ে মায়ের বলা অপেক্ষা করার কথা নিয়ে ভাবছি। হঠাৎ মনে হল পেয়ারা গাছটি পাতার হাতছানিতে আমাকে ডাকছে। বলল, চালের ছন ও আমার পাতার ফাঁকে একটি বড় পেয়ারা আছে, ওটা তুমি খুঁজে নাও। দ্যাখো কেমন ডাশা হয়ে উঠেছে আর সোনালি রঙটিও দেখার মতো। অমনি খুঁজে-পেতে পেয়ে হাততালি দিয়ে মাকে ডাক দিলাম, মা,

দ্যাখো দ্যাখো, একটি পেয়ারা। আমার গাছের প্রথম ফল। মা রান্নাঘর থেকে দরজা দিয়ে মুখ বের করে দেখল। কী দেখল আমি জানি না। মুখে হাসি মেখে শুধু বলল, পাড়তে পারবি? পেকেছে?

সঙ্গে সঙ্গে বললাম, পারব, নিশ্চয়ই পারব। ডাশা হয়েছে।

মা ঘরে চলে গেল। কড়াই ও খুন্তির শব্দ শুনতে শুনতে আমিও পেয়ারা গাছে উঠছি। যে ডালে পেয়ারা সে ডালটি আমার ভার সইতে পারল না বলে নেমে পড়লাম। ঠিক সে সময় এল সাজুর ছোট ভাই তপু। ওর বয়স দশ কি এগারো। চিরচঞ্চল ছেলে। ওকে বলতেই তরতর করে গাছে উঠে গেল। ওপর থেকে মাথা কাত করে বলল, একটা কাঠি বা কিছু দাও, আর উঠতে পারছি না। আমার ভার সইতে পারছে না। কী সুন্দর পেয়ারা!

উঠোন থেকে বাঁশের একটা কাঠি তুলে দিলাম। সে পেড়ে দিল। পেয়ারা নিয়ে খুশি হয়ে ছুটলাম মায়ের কাছে। মা বলল, বেশ বড় তো, সুন্দর গন্ধ।

খাঁটি সোনা রঙ ও মিষ্টি গন্ধ ছাড়ছে। মা রুটি মলতে মলতে বলল, কেটে ভাগ করে খেয়ে নে, তোর বাবাকেও দিস। দৌড়ে বাবার কাছে গেলাম। বাবা আধো ঘুমে, আধো জাগরণে। প্রেসারের ঘোরে বাবা এভাবে শুয়ে থাকে। বাবাকে ডাকলাম, বাবা, ও বাবা, পেয়ারা খাবে? নতুন গাছে ধরেছে।

তন্দ্রা থেকে জেগে বলল, এক টুকরো দে। তারপর পেয়ারাটি দেখতে দেখতে বলল, আমাদের ঘাটের পাশের গাছেও প্রথম প্রথম এত বড় পেয়ারা হতো। ঠিক সে সময় মাকে ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢুকল সাজু। আমি দরজা পেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে সাজুকে দেখতে পেলাম। তপু ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে। ভাবছি সন্ধের ঠিক আগ মুহূর্তে পেয়ারাটি কাটব কিনা, বাবাকে অসময়ে খেতে দেব কিনা। অবেলায় পেয়ারা খাওয়া ঠিক নয় বাবাই শিখিয়েছে। কিন্তু নতুন গাছের পেয়ারা বলে ধৈর্যও ধরতে পারছি না।

সাজুর ডাকে মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে সাড়া দিল। কাছে ডাকল। আমি ইশারা করার আগেই সাজু আমাকে এক চোখে মুহূর্তের মধ্যে অনেক কথা জানিয়ে দিল। মা আমাকে ডেকে বলল, সাজুকেও পেয়ারা দিস।

আমি তাড়াতাড়ি পেয়ারা কাটার ছোরা ও দুটো প্লেট নিলাম। সাজুকে খেতে দিতে পারব। কেটে দু ভাগ করতেই দেখি ভেতরটা চমৎকার লাল। সাজু আমার পড়ার ঘরে এল। আধখানা পেয়ারা ওর হাতে দিয়ে বাকি আধখানা বাবাকে দিতে চললাম। মা ডাক দিয়ে সাজুকে বলল, রাতে আমাদের সঙ্গে খেয়ো। সঙ্গে সঙ্গে সে বিনম্র ও দৃঢ় গলায় জরুরী কাজ আছে বলে জানিয়ে দিল। বাবার ঘরে যেতে যেতে আমি শুনলাম। আমার বুক তখন জোরে জোরে ধুকপুক করছে। সাজু থাকবে না? খেয়ে গেলে কথা বলার সুযোগ পেতাম। সে যুদ্ধে যাচ্ছে। সন্ধের অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে সে চলে যাবে। আবার কবে আসবে, কবে দেখা হবে জানি না। বাবার কাছে যেতে যেতে কল্পনায় আমি দেখছি পুরাণোক্ত বীরের মতো সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আমি তাকে টিপ পরিয়ে দিচ্ছি, তার হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছি, তূণে একটি একটি করে বাছাই করা তীর সাজিয়ে দিচ্ছি...। সাজু আমার দিকে পরিপূর্ণ চোখ মেলে তাকাচ্ছে। আমার ইচ্ছে পূরণ হচ্ছে, আমাকে চুমু খাচ্ছে ...।

বাবার কাছ থেকে ফিরে এসে দেখি সাজু মাকে বলে চলে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। তার একটুও সময় নেই। মা ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছে। ছুটে গেলাম দরজায়। উঠোনে নামতে নামতে সাজু ঘাটা পেরিয়ে রাস্তার মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। উদভ্রান্ত চুলে ফিরে তাকিয়ে সে বলল, বকুল, আমার এক মুহূর্তও সময় নেই, বিশ্বাস করো, মাত্র কয়েক মিনিটের সময় নিয়ে এসেছি। ইউসুফ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি গেলেই নৌকো ছাড়বে। মাথার ওপর আমাদের ঘাটার নাগকেশর ও অশোকের ছায়া-আঁধার। অস্থির হয়ে সে আবার বলল, সাবধানে থেকো বকুল, শুধু তোমাকে এক পলক দেখার জন্যে ছুটে এসেছি, কোনো কথাই বলা হল না, হাতে একটুও সময় নেই। বলেই সে আমাকে গভীর ও মধুর আবেগে বুকে চেপে ক্ষণস্থায়ী একটি চুমু খেয়ে ছুটে চলে গেল। ঐটুকু সময়ের মধ্যে আমি অবশ হয়ে গেলাম, আমি ঐ অল্পক্ষণে লক্ষ লক্ষ বছর স্বপ্নে ঘুরে এলাম কিন্তু কোনো কথাই মুখে জোগাল না।

উঠোনের খোলামেলা জায়গায় এসে দেখলাম মা আমার পড়ার ঘরে ঢুকছে। বসন্তের আমেজ ছাপিয়ে শীতের কনকনে হাওয়া নামল হঠাৎ। আস্তে আস্তে আমিও মায়ের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মা পেছন ফিরে পেয়ারার প্লেটখানা আমার হাতে তুলে দিল কিছু না বলে। সাজু আধখানা

খেয়ে বাকি আধখানা রেখে গেছে। ভাবলাম মা বুঝি নিজের হাতে ওটা ফেলতে চায় না বলেই আমাকে দিল। মনে মনে লজ্জা পেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল বাবার রাখা খাবার মা কত সহজে ও স্বাভাবিকভাবে খেয়ে নেয় সে-কথা। মা হয়তো তা ভেবে প্লেটটা আমার হাতে দিয়েছে। সুখের কান্না তখন আমার গলা ছেপে বেরিয়ে আসতে চাইছে এবং আমার সুখের জগৎটাকে একান্ত করে অনুভব করার জন্যে মায়ের কাছ থেকে নিজেকে লুকোতে চাইছি। মা বুঝতে পেরেই হয়তো বলল, আমি যাই, তোর বাবাকে খাবার দিয়ে আসি।

অসুস্থ হওয়া অব্দি বাবা সন্ধের পর পরই খেয়ে নেয়। মা-ই সব-সময় খেতে দেয়। আমি সাজুর কথা ভেবে মায়ের মুখের দিকে তাকালাম। পৃথিবীতে একমাত্র মায়ের কাছেই সব কথা বলি আমি। এজন্য মাকে সবকিছু খুলে না বললেও অনেক কিছু বুঝে নিতে পারে। মা এক ঝলক হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টকটকে লাল পেয়ারার ওপর সাজুর দাঁতের ছাপ বসে আছে। আমি ভালো করে দেখতে লাগলাম সে এক কামড়ে খেয়েছে নাকি দু কামড় দিয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আধখানা পেয়ারা সে আমার জন্যেই রেখে গেছে। আস্তে আস্তে ওতে কামড় দিলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে ওর চুমুর কথা মনে পড়ল।

পেয়ারার এক রকম মিষ্টি-কষায় স্বাদ জিব ভরে তুলল। মা ও সাজুর কথা এবং সেই সুখদুঃখ নিয়ে চিবুতে লাগলাম। খেতে খেতে বাবার ঘরে গেলাম উঁকি দিতে। বাবাও একটুখানি পেয়ারা মায়ের জন্যে রেখে দিয়েছে। আমার বুক ভরে উঠল।

বাকি পেয়ারাটুকু খেতে খেতে মনে হল যুদ্ধ থেকে সাজুর ফিরে আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারব।

মা তখন বাবার জন্যে রুটি ও তরকারী নিয়ে আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মধুর হাসি মুখে নিয়ে মা বলল, চুরি করে কী দেখতে এসেছিস?

[ইত্তেফাক, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৮]

অসচরাচর

আমার লাল রুমালের পাশে শচীর দেওয়া গোলাপী রুমালটি রাখলাম। পেছনের বাঁ পকেটে রাখাই আমার অভ্যেস। নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করে সমস্ত ঘটনাটা একবার ভেবে নিলাম। বেজির খাঁচার ওপর একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলাম। সবাই বলল বেজিটা ছেড়ে দিতে। আমি বললাম, না পুষব। আমার সঙ্গী হবে সে। শচী তো এক রকম জোর শুরু করল ছেড়ে দেবার জন্যে। আর সে জন্যেই জেদ করে পোষার সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রথম দিনেই কিন্তু বেজিটা শচীর নেওটা হয়ে গেল।

ব্যাপারটা খুলেই বলি। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু বাবুর শ্বশুরবাড়িতে শচীর সঙ্গে পরিচয়। নিয়ম অনুযায়ী বিয়ে হয় বাবুর বাড়িতে। এটাই আমাদের রীতি। বিয়ের পরদিন বর শ্বশুরবাড়িতে যায় কনেকে নিয়ে। সঙ্গে থাকে বন্ধু-বান্ধব, ছোট ভাই-স্থানীয় আত্মীয় ও বোন-জামাইরা। অন্ধকার রাতে হ্যাজাক বাতি জ্বালিয়ে পাঁচ মাইল হেঁটে আমরা বাবুর শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছি। সেখানে শচীর সঙ্গে পরিচয়। বসন্তের সেই রাতে শচী আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ওদের গ্রামের নদীর কূলে। সঙ্গে আরও একজন ছিল। সে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ। আমি জানি রুমালটা আমার জন্যে সে সেলাই করে নি। এও জানি, ওটা আমাকে দেওয়ার জন্যেই ঘাসের ওপর পেতে দিয়েছিল। সে বসে ছিল মুথা ঘাসের ওপর। ওঠার সময় বলল, ওটা আপনি রাখুন।

পরদিন গানের আসর বসল। শচী গান গেয়েছিল। দুপুরে সাঁতার কেটে নদী পেরিয়ে কাশবনের গভীরে চলে যাই একা একা। মাথার নিচে দু-হাত রেখে আকাশ পাহারা দিতে দিতে অনেকক্ষণ শুয়ে ছিলাম। সবাই ফিরে গেল আমাকে ফেলে। আমি উঠে পুরো কাশ-বন জরিপ করে একটা বেজির ছানা ধরি। ততক্ষণে নৌকোতে করে আমাকে খুঁজতে এল ওরা। চিৎকার করে ডেকে খুঁজে বের করল। আমার হাতে বেজির ছানা। ওরা ভেবেছিল আমার কোনো বিপদ হয়েছে, কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়েছি। নেউল ছানাটি একটা খাঁচায় পুরলাম। সেদিন থেকে তুলতুল আমার বন্ধু হয়ে গেল। এরপর আরও

দু বার শচীদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছিল তুলতুল। সেও শচীর প্রিয় হয়ে উঠল।

শচী আমার এক ক্লাস নিচে পড়ে। ওদের গ্রামেই ওর কলেজ। সেবার শরতের ছুটিতে শহর থেকে আমি গ্রামে এলাম আর শচী এল বাবুদের বাড়িতে। বাবুর বাবা মারা যাওয়ায় পড়া ছেড়ে তাকে বিয়ে করতে হল। জমিজমা চাষবাস দেখা ছাড়া ওর কোনো উপায় রইল না। আমার শুরু হল শচী থেকে পালিয়ে বেড়ান। শচীর আসার খবর পেয়ে আমি তৈরি হয়ে গেলাম হোস্টেলে চলে যেতে। বাবু আমাকে ডাকতে পাঠাল। আমি ততক্ষণে কাপড়-চোপড় বোঁচকা বেঁধে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছি। পথেই বাবুদের বাড়ি। ওর সামনে দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। উঠতি পা থেমে যায়। শচীকে একবার না দেখে যাই কি করে? আমার নিজের অজ্ঞান্তে রাস্তা থেকে বাবুদের বাড়ির ঘাটায় পা বাড়ালাম। ওদের বাড়ির দীর্ঘ ঘাটা পেরিয়ে পুকুর। পুকুরের পাশে বড় উঠোন, মধবী ও অপরাজিতার ঝাড় এবং সেখানে শচী দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখতে পেয়েই তুলতুল এক লাফে ওর কাছে চলে যায় আর কি! আমি টান টান করে ওকে বাধ্য করলাম সংযত হতে। কিন্তু ওযে নিরীহ বেজি মাত্র, ওকে থামাই কতক্ষণ! শচী মাধবীলতার ঝোপের নিচে দাঁড়িয়ে পুকুরের দিকে তাকিয়ে রইল। আমাকে দেখে নাকি না দেখে আমি বলতে পারব না। ওকে ডাকব কি ডাকব না বুঝে উঠতে পারলাম না। এক বার ভাবলাম না ডেকে চলে যাই। তাহলে তো এতদূর আসার অর্থ হয় না। আমার ভালো লাগা বা অবহেলারও মানে থাকে না।

শচীর পাশে গিয়ে বললাম, আমি যাচ্ছি।

শচী চমকে এবং ঝলমলে চোখে চুপ করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তুলতুল তখন চিঁ চিঁ করে ওর পা শুঁকছে। বলল, বাঃ কী সুন্দর বড় হয়ে গেছে? তারপর ওকে আদর করতে করতে আমার দিকে তাকিয়ে না তাকিয়ে বলল, কোথায় চললেন?

শচী বোধহয় ভাবল আমার কলেজ খোলা। তাই যেন তাড়াতাড়ি বলল একদিন পরে গেলে হয় না?

তুলতুল তখন দু পায়ে দাঁড়িয়ে দূরে কি যেন দেখল। আমিও এক মুহূর্ত ভাবলাম। তারপর বললাম, হ্যাঁ, তুলতুল এখন আমার সারাক্ষণের সঙ্গী, আমার সঙ্গে এক বিছানায় শোয়। আমি কলেজে গেলে একা থাকে আমার কামরায়। আমার বন্ধু।

আমি থাকব না বুঝে শচী হঠাৎ করে বলল, আমাকে কিছু টাকা দিতে পারেন?

আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, শচী আমার কাছে এভাবে টাকা চাইছে কেন? কোনো কারণ খুঁজে না পেয়ে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে টাকা বের করলাম। সঙ্গে শচীর দেওয়া রুমালও বেরিয়ে এল। রুমালটা যে কী করে টাকার পকেটে এল বুঝতে পারলাম না, কারণ ওটা থাকার কথা পেছনের বাঁ পকেটে। যাক গে; শচী দেখেও না দেখার ভান করে রইল। আমি খুচরো টাকাগুলো রেখে একটা নোট ওর হাতে তুলে দিলাম।

শচী শুধু বলল, এভাবে টাকা চাইলাম বলে আমাকে খুব ছোট ভাবছেন না তো?

আমি বলতে পারতাম, না নিলে নিজেকে খুব ছোট মনে করব।

সে আবার বলল, অত দরকার নেই। খুচরোগুলো দিলেই চলবে। হঠাৎ দরকার হয় পড়ল।

তবুও কিছুতেই মেলাতে পারলাম না ওর টাকা চাওয়ার ব্যাপারটা। ওর সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তেই পৌঁছুতে পারলাম না।

আরও কিছুক্ষণ থাকার পর শচী প্রায় আদেশের মতো বলল, আপনি আর দেরি করবেন না। সন্ধে হয়ে এল, আপনার যাওয়া উচিত। তারপর তুলতুলকে আদর করে গোমড়া মুখে আমাকে বিদায় দিল।

বাসে প্রায় তিরিশ মাইল যেতে হবে। সেটাও খুব দূরত্ব কিছু নয়। চেনা-জানা পথ। রাতবিরেতে কত আসা-যাওয়া করি। কিন্তু তুলতুল আমাকে জানিয়ে দিল সে কোথাও যেতে রাজী নয়। একটু ধমক দিলাম। দড়ি ধরে আচ্ছা করে কিছুক্ষণ শূন্যে ঝুলিয়ে রাখলাম।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি অনেকখানি দুর্বল হয়ে গেলাম। বাসে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু দিনের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। আকাশে চাঁদ উঠেছে। নদীর ওপর বালুচরে লুটোপুটি খেলছে। শচীর প্রতিটি কথার অর্থ আমার কাছে গভীর অর্থবহ হয়ে উঠতে লাগল। সে বোধহয় বোঝাতে চেয়েছে রুমালটিই আমাদের মধ্যেকার বিপত্তির কারণ। তার জন্যেই টাকা নিয়ে মিটমাট করতে চাইছে। নামমাত্র হলেও কিছু মূল্য নিতে চেয়েছে। পাঁচ পয়সা চাইলে আমি বুঝতে পারতাম। এক টাকা চাইলেও বুঝতাম। কিন্তু শচী বোধহয় বুঝতে দিতে চায় না যে রুমালের জন্যেই আমাদের মধ্যে শত্রুতা দানা বেঁধে উঠছে। আমিও ভালোবাসি

কথাটা বলতে পারছি না, সেও বলতে পারছে না হয়তো। আমারই প্রথম প্রকাশ করা উচিত বৈকি। আমি কিনা নির্বোধের মতো নিজের হাতে নিজে সব তছনছ করে চলেছি। তবুও আমি বলতে পারি নি। সেবার সে দশ দিন ছিল আমাদের গ্রামে। সেদিন বাবুর সঙ্গে দেখা না করাতে সে অপমানিত বোধ করে এবং রাগ করে আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। ওর কথা হল শচীকেও আমি অপমান করেছি। সাধারণ সৌজন্যবোধটুকুও আমার মধ্যে নেই। ভালোবাসা ছাড়াও তো মানুষের ভদ্রতাবোধ থাকে। শচী, বাবু ও বাবুর বউ—সকলকে আমি অপমান করেছি। বাবুর এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল।

সে-রাতে আমি আর শহরে যাইনি। আমি আবার সিদ্ধান্ত পাল্টালাম। পাঁচ মাইল হেঁটে শচীদের গ্রামে পৌছুলাম। শচীর ভাই তরুণের সঙ্গে ওদের বাড়িতে গেলাম। শচীর মা-বাবা খুশি হল। অনেক রাত পর্যন্ত তরুণের সঙ্গে নানা গল্প করলাম। তুলতুলের নানা খেলা ও বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ দিলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে ধরে নিয়ে এল মাছ ও ইঁদুর। লুকোচুরি খেলল টেবিল ও চেয়ারে বসে। বইয়ের ফাঁকে উঁকি মারল চমৎকার ভঙ্গি করে। শচীর পিঠোপিঠি ছোট তরুণ। ওরা ভাইবোনে চমৎকার বন্ধুত্ব। আমিও আর লুকোচুরি না করে বললাম শচীর সঙ্গে দেখা হয়েছে।

তরুণ অবাক হয়ে বলল, শচী বাবুভাই আপনাকে ছেড়ে দিল ?

বললাম, তুলতুলকে ছেড়ে দিতে এসেছি।

কেন ? আপনার কষ্ট হবে না ?

হ্যাঁ, কষ্ট হবে। ওর সঙ্গে দীর্ঘ ছয় মাস ধরে অন্তরঙ্গতা। তবুও ছেড়ে দিতে হবে। একা একা আমার সঙ্গে থেকে ও-বেচারী তার জীবন ও জগৎ থেকে একেবারে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। সে প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতির সন্তানকে প্রকৃতির মাঝে ফিরিয়ে দিতে এসেছি।

তরুণ বলল, যে কোনোখানে ছেড়ে দিলেই তো হয়।

তা হয়। তবুও ভাবছি ওর পাড়ায় ওকে ছেড়ে দেব। নিজের পাড়া, নিজের গ্রাম ও নিজের দেশ অনেক বড়।

ভোরে উঠেই তরুণ ও আমি নদী পেরিয়ে কাশবনে গেলাম। শরতের আলো হাওয়ায় কাশবন দুলছে। মাথার ওপর নীল আকাশ ও নদীর ছলোছল ঢেউয়ের শব্দ। কিন্তু আমার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। ওর গলার রশি খুলে দিলাম। যেতে বললাম। ওর বাড়ি-ঘর, প্রেম ভালোবাসা ও আত্মীয়-স্বজনের কথা বললাম। আমার সঙ্গে থাকা মানে জীবন বরবাদ। বললাম, তুলতুল, তুই মুক্ত। তোর সঙ্গী সাথী খুঁজে নে। তোর মধুময় জীবন সামনে পড়ে আছে। যা তুলতুল, আমার ভালোবাসা নিয়ে চলে যা।

আমাকে অবাক করে, হতাশ করে সে আমার পাশে ঘুরঘুর করতে লাগল। দু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস টেনে টেনে কি যেন বুঝতে চেষ্টা করল। চারদিকে তাকাল। রশিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। আবার বললাম, তুলতুলরে আজ থেকে তুই স্বাধীন, তোর পাড়া-পড়শিদের মাঝে ফিরে যা।

তুলতুল গেল না। আবার বললাম, আমার পিছে পিছে ঘুরে বেড়াতে হবে না। যা যা।

সে যায় না। দু পায়ে দাঁড়ায়, এদিক-ওদিক তাকায়, ঘাস শোঁকে, আমার দিকে তাকায়। আবার বললাম, তুলতুল, তুই কি স্বাধীনতা চাস না ? যেদিকে দু চোখ যায় চলে যা।

না, ওর কোনো ভাবান্তর নেই। যাওয়ার আগ্রহ নেই। ধমক দিলাম। সে চমকে লাফিয়ে প্যান্টের পা বেয়ে উঠতে চাইল। নিচে নেমে আমার দিকে তাকাল করুণ চোখে। হ্যাঁ, আমি ওর অনেক কিছু বুঝি। রাগ, আনন্দ ও বিষাদ আঁচ করতে পারি।

তুলতুল স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার সঙ্গে রয়ে গেল। আমারও আর কিছু করার নেই। এমনিতেই তো আমি ওকে ছেড়ে দেব বলে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শচী ওর গ্রামে ফিরলে আমাকে নিয়ে যাতে ভাবে, তার পথ করে দিলাম। শচী বুঝুক, শচী আরও বেশি আমাকে ভালোবাসুক—আমি ওর ভালোবাসা আদায় করে নিতে চাই ওকে মুগ্ধ করে।

তরুণের সঙ্গে ওদের বাড়িতে ফিরলাম। নদী পার হতে সাম্পানে উঠলাম। তুলতুল পিছু পিছু এল। সাম্পানে উঠে তরুণের কোলে উঠল। শরতের মেঘ মাথার ওপর দিয়ে ভেসে চলল অলস হাওয়ায়।

তিন মাইল হাঁটার পর সন্ধ্যা নামল। শচীর ভাবনা এত আচ্ছন্ন করে রাখল অথচ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না—বাড়ি ফিরব নাকি শহরে চলে যাব। এতদিন যাকে ভুলতে চেয়েছি, যার সঙ্গে মনে মনে লড়াই করেছি, যার কথা না ভাবতে চেষ্টা করেছি, এমনকি গতকাল এরকম অবজ্ঞা করেছি সে আজ সমস্ত ভাবনায়। শচীকে একবার দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। শুধু দেখা, আর কিছু না। দু চোখ ভরে একবার দেখা আর কিছুই চাই না। কিছুই চাই না ভাবতেই বুক কেঁপে উঠল। চাঁদের আকাশ ও আকাশের চাঁদ ডেকে ডেকে কী যেন বলল। তুলতুল

ক্লান্ত হয়ে কাঁধে উঠে বসল। কাঁধ থেকে মুখ বাড়িয়ে চুমু দিল। আমি আদর ফিরিয়ে দিলাম।

রাস্তায় উঠে বাস ধরলাম। হোস্টেলে পৌঁছে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। উদভ্রান্তের মতো দশটা দিন কেটে গেল। প্রাচীন কালে বর্ষার শেষে শরতে রাজারা দিগ্বিজয়ে বের হত। প্রবাসীরা ঘরে ফিরত। আমিও তুলতুলকে নিয়ে বাড়ির পথে বের হলাম।

বাড়িতে পৌঁছেই মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে বললাম, মা, ঘরে কে এল ?

মা ডাক দিল, মিশি এদিকে আয়।

মিশি ছুটে এল এবং আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। হাসতে হাসতে সে বলল, ডেকেছেন পিসিমা ?

মা তাড়াতাড়ি বলল, প্রণাম কর। তারপর আমার দিকে তকিয়ে বলল, তোর মামাতো বোন হয়। বেড়াতে এসেছে।

মিশিও তাড়াতাড়ি বলল, তুমি চিনতে পারলে না ? সে বছর তোমার সঙ্গে দেখা হল, আমাদের গ্রামে ...।

মা একথা ওকথা বলে, চিনিয়ে দিল। আমি ভাবলাম, কেন হঠাৎ এভাবে বেড়াতে এল। সে শহরে পড়াশুনা করে। হোস্টেলে থাকে। শচীর ভাবনা চকিতে আবার দোলা দিয়ে গেল। মিশি বলল, তোমার 'শিমুলরা বলেছে' লেখাটি পড়েছি। শিমুল যে মানুষের এত উপকারী বন্ধু আগে জানতাম না। বসন্তের এত কথা আছে আগে এভাবে কোনো দিন ভাবি নি।

মা বলল, লেখাটি আর একটা সংক্ষিপ্ত হলে ভালো হত। আর গাছ ভালোবেসে হলেও যদি দেশলাইয়ের কাঠি কম খরচ করতিস বুঝতাম তুই প্রকৃতি-প্রেমিক। এত সিগারেট খাওয়া ভালো না।

ছোট দু বোন এসে বলল, তোমার তুলতুল কই ? মিশিদিকে দেখাই।

এতক্ষণ তুলতুলের কথা ভুলে ছিলাম। সেও এই ফাঁকে কোথায় যে পালাল। তুলতুল তুলতুল বলে ডাকতেই সে ঘরে ঢুকল, সতর্ক পায়ে থমকে দাঁড়াল। লাফিয়ে আমার কোলে উঠল। মিশি চোখ বড় বড় করে ধরতে গেল। তুলতুলও কেন জানি না হাঁ করে কামড়াবার জন্যে রুখে দাঁড়াল। মিশি ভয় পেয়ে তিন হাত পিছিয়ে গেল। আমি তুলতুলের মাথায় হাত রেখে বললাম, অমন করে না। অতিথিকে চিনে রাখ। যা ওর কাছে, পরিচয় করে নে।

মা ঠিক করে নিয়েছে পরীক্ষার পরেই আমার সঙ্গে মিশির বিয়ে দেবে। মায়ের ধারণা ছেলেদের পড়াশোনা শেষেই বিয়ে হওয়া দরকার আর মেয়েদের পড়তে পড়তে বিয়ে হয়ে গেলে সবচেয়ে ভালো। বাবা ব্যবসা নিয়ে গ্রাম থেকে শহরে ছোটাছুটি করে। তাই আমার পরীক্ষা হয়ে গেলেই বিয়ে দিয়ে সংসারী করে তুলবে, বাবার ব্যবসায় ঢুকিয়ে দেবে।

আমি জানি না কিসে কি হয়ে যায়। মিশি আস্তে আস্তে আমার মনে ছায়া ফেলতে থাকে। শচীকে আরও বেশি মনে পড়ে। সেই এক সন্ধেয় মিশি আমাকে নদীর ধারে নিয়ে যায়। শরতের ভরা শান্ত নদী। জোয়ার এসে কূল ভরে দিয়েছে। একটা একটা করে সাম্পান কেঁদে কেঁদে উজান চলে যায়। কেন যে সাম্পানওয়ালা পানি দিয়ে শব্দটা বন্ধ করে না। দড়ির আঙটা পানিতে ভিজিয়ে দিলেই দাঁড়ের শব্দ ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। তার বুক মোচড়ানো দাঁড়ের শব্দ সবসময় এরকম কষ্ট দেয় আমাকে। তুলতুল কোল থেকে নামে না। মিশি তাকে যতই আদর করতে চায় সে ততই ফুঁসে ওঠে; যেন বলে, চাই না তোমার ভালোবাসা। আমি তুলতুলের কান মলে দিয়ে ধমক দেই। তবুও তার শিক্ষা হয় না। মিশির পক্ষে বেশি ওকালতি করতে যেতেই আমাকে কামড়াতে উদ্ধত হল। আমিও বুঝে নিলাম ওদের মধ্যে ভাব হবে না। মিশিও আমার কোলের দিকে হাত বাড়ান বন্ধ করে চুপ মেরে গেল। তারপর এক সময় রেগে বলল, ওটাকে তাড়াবে নাকি আমি চলে যাব। তুলতুলেও কোল থেকে নামে না। সে যেন আমাদের মাঝখানে বেড়া তুলে আগলে রাখতে চায় আমাকে। মিশি হঠাৎ আমার বাঁ হাতখানা নিয়ে আবেগ প্রকাশ করল। আস্তে আস্তে আমাকে ওর কাছে টানতে লাগল, অমনি শচী আমার কানে কানে বলল, ভালোবাসা কেমন ? তুমি কাকে ভালোবাসো ?

সঙ্গে সঙ্গে তুলতুল জোর প্রতিবাদ জানিয়ে আমার কোল থেকে নেমে নদীর কূল বেয়ে বিলের মাঝে হারিয়ে গেল। আমি এক বার ডাকলাম, তুলতুল, তুলতুল কোথায় গেলি ? কাছে আয় কথা শোন।

তুলতুল এল না। মিশি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপদ দূর হয়েছে ভালোই হয়েছে। এবার বলো তুমি আমাকে ভালোবাসো ?

মনের মধ্যে তখন শচী। আমার মাথায় তুলতুল। মিশি আবার বলল, কি! আপদ বললাম বলে রাগ করলে ? ওকে তুমি খুব ভালোবাসো জানি। কিন্তু ও যে আমাকে সহ্যই করতে পারে না।

আমি দাঁড়িয়ে আমতা আমতা করতে লাগলাম। তুলতুলের জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। মিশি বুঝে হোক না বুঝে হোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে চুমু খেল। আমি গলে যেতে যেতে আবার তুলতুলের কথা ভাবলাম, কল্পনায় শচী এসে আবার বলল, ভালোবাসা কেমন তাহলে? ভালোবাসলে সুখ কোথায় থাকে, ভালোবাসা কোথায় থাকে?
আমি আবার চঞ্চল হয়ে উঠলাম।

রাতের আঁধার ও আকাশের তারারা পাহারা দিয়ে আমাদের ঘরে ফেরত পাঠাল। সাম্পানের বুক-ফাটা চিৎকার অনেক দূর থেকে বলে চলল—ভালোবাসা কেমন তাহলে, ভালোবাসা কোথায় থাকে...

ঘরে পৌঁছে দেখি তুলতুল নেই। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, রাতদুপুর অব্দি জেগে রইলাম। ঘরের দরজা-জানালা খোলা রাখলাম। আবার বিছানা ছেড়ে উঠলাম। দরজা বন্ধ করলাম, আবার দরজা খুলে উঠোনে গিয়ে ডাকলাম। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। কালপুরুষ মাঝ আকাশে মুগুর হাতে আলদিবরণকে থামিয়ে দিয়ে বীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আলদিবরণ সুন্দরী সুরাইয়াকে ধরার জন্যে তাড়া করছে আর কালপুরুষ তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।

মা বলল, আসবে না। খুব বকবকি করেছিস কি? আজকাল তুই যা খিটখিটে হয়েছিস। বোন আলতা ও সুলতা বলল, এতদিন পর তুলতুল এভাবে চলে গেল কেন? তুমি কি বকেছ? মিশি বলল, গেছে ভালোই হয়েছে। যা রাগ দেখায় আমাকে!

সকাল ও দুপুর ছটফট করে কাটল। মিশিকে আমি কী করে বোঝাই যে তুলতুল আমার কত খানি। ভিটে খুঁজলাম। বিল, নদীর কূল হন্যে হয়ে ঘুরলাম। ভিটের যেখানে আমরা খেলতাম সেখানে বসে বসে ওকে ডাকলাম, মনে মনে কাঁদলাম। সে আমার মেজাজ-মর্জি বুঝত। আমার অসুখ করলে গায়ে-পিঠে চুলবুল করে এক রকম আরাম ঢেলে দিত। পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়লে সে নিজে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে আমাকে আনন্দ দিত অথবা আমাকেও ওরকম করতে ইঙ্গিত দিত। হ্যাঁ, আমি তা করতাম। আসলে ওর স্বভাবের মাঝে আমিই নানা ইঙ্গিত খুঁজে নিতাম হয়তো। ওর খাওয়া-দাওয়া, রুচি, মাঝে মাঝে মটকা মেরে শুয়ে থাকা—সব মনে পড়তে লাগল। মিশি এসে নানা ভাবে আমাকে ভোলাতে চেষ্টা করে। আলতা ও সুলতা আমাকে বুঝতে পরে, তারাও পাড়া ঘুরে খুঁজল। মা ডেকে সান্ত্বনা দেয়। ঘুরে-ফিরে তুলতুলের স্মৃতিরা সামনে চলে আসে। শচীকে সে খুব আপন করে নিয়েছিল। এক দিনেই শচীর মনও জয় করে, ওর সঙ্গে সঙ্গে তাই শচী ঘুরে-ফিরে আসে। শচী যেন বলে, ভালোবাসা কেমন, তুমি কাকে ভালোবাসো?

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামে। মিশি বলল, তুমি কি একটা বেজির জন্যে সব কিছু ছেড়ে দেবে? চলো নদীর কূলে যাই। কি নিয়ে যাবে না?

আমি হ্যাঁ-না কোনো জবাব দিতে পারলাম না। অন্য কথা বলে চুপ করে গেলাম। আলতা ও সুলতা আমার মতো ভেবে ভেবে কোনো কূল করতে পারে না। মিশির প্রতিও ওরা অবহেলা শুরু করল। ওদের ধারণা মিশিই তুলতুলের পালিয়ে যাওয়ার কারণ, প্রথম থেকেই মিশি ওকে সহ্য করতে পারছে না। তুলতুলও প্রথম দেখায় মিশিকে ভালোবাসতে পারে নি।

সন্ধে নামতেই দক্ষিণ থেকে জোর হাওয়া ছুটল। ভরা নদী থেকে সাম্পানের শব্দ আসে। দূর থেকে ভালো লাগে, কাছ থেকে শুনতেই বেশি কর্কশ লাগে। পুব আকাশ কৃত্তিকা তারাগুচ্ছ উঁকি মেরে তাকায়। ঠিক তখনই তুলতুলকে নিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল শচী ও তরুণ। শচীর কোলে তুলতুল। শুনেই বোনরা ছুটে এল। মা বেরিয়ে এল, মিশি এসে দাঁড়াল। কিন্তু তুলতুল শচীর কোল থেকে আমার কোলে এল না।

আমার সামনে দাঁড়িয়ে শচী বলল, তুমি কি তুলতুলকে আমার কাছে পাঠিয়েছ? ভোররাতে আমার বিছানায় উঠে এমন চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিল যে ভাবলাম তোমার কোনো বিপদ-আপদ হয় নি তো?

তরুণ বলল, সকালে আসতে পারি নি মা-বাবা ঘরে ছিল না বলে।

আলতা ও সুলতা বলল, এত দূরে ও গেল কি করে?

মা হয়তো ভাবল তুলতুল শচীর কাছে কেন গেল। তুলতুল শচীর কোলে বসে কিকি কিকি কিকি করে সেই প্রথম থেকেই বকবক করছে।

[গল্পগ্রন্থ : আকাশে প্রেমের বাদল]

প্রতিদিন একটি রক্তকরবী

মালীবাগের মোড়ে পৌঁছতেই ওর সঙ্গে দেখা। দেখেই মনে হল স্কুলের ছাত্রী। হাল্কা-পাতলা গড়ন, শাদা সালোয়ার-কামিজ গায়ে। হাতে পাটের থলেভর্তি বইপত্র, বেণীও বেঁধেছে। বেশ ঘন ও দীর্ঘ চুল। তার শরীরের তুলনায় চুল বড় ও সুন্দর, ভুরুও কালো এবং ঘন। আমিও ভালোবাসি কালো কেশবতী মেয়েদের। জেব্রা ক্রসিং-এ পা দিতে দাঁড়িয়ে আছি, তিনদিক থেকে অনবরত গাড়ি আসছে, বাসস্ট্যাণ্ডে লোকারণ্য। একটা বাস আসতে না আসতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সবাই।

মেয়েটি রাস্তা পার হওয়ার সময় আমার পাশে এসে দাঁড়াল। আড় চোখে তাকিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি, এক লহমায় ওর ব্যক্তিত্বও লক্ষ্য করলাম। গাড়ি না থাকলে তবেই রাস্তা অতিক্রম করব--তখন মেয়েটিও রাস্তা পার হবে জানি। স্কুলগামী মেয়েই বলব, নবম বা দশম শ্রেণীর ছাত্রী হয়তো--কলেজের কথা একবারও মনে আসে নি। পাশে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। রাস্তা পার হওয়ার জন্যে পা তুলতেই ওর চোখে-মুখে ব্যক্তিত্ব আবার লক্ষ্য করলাম, আমার উঠতি পা মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল। আমার পাশে পাশে পায়ে পায়ে হাঁটছে। রাস্তার মাঝামাঝি হলুদ দাগের ওপর আবার দাঁড়াতে হল, মোড়ের দিক থেকে খুব একটা লাল গাড়ি ছুটে আসছে। সকালের সূর্য তখন অনেক-খানি ওপরে উঠে এসেছে, কয়েক টুকরো কোদালে মেঘ উঠেছে দক্ষিণ আকাশে। মালীবাগ থেকে কাকরাইল পর্যন্ত প্রশস্ত সোজা রাস্তা। দক্ষিণ আকাশের ফল্‌স ক্রসের দিকে মেঘ উঠেছে, তার পাশাপাশি অগস্ত্য তারাটি ওঠে। সেদিকে তাকিয়ে হাঁটছি, পায়ে পায়ে ফুটপাতে গিয়ে দাঁড়ালাম। সিগারেট থেকে আরেকটা সিগারেট ধরালাম। মেয়েটি একটু দূরে দাঁড়াল। বাসের পর বাস আসছে, অফিসগামী মানুষের আর শেষ নেই। পাশে দাঁড়ান লোকটার সঙ্গে কথা শুরু করলাম--রিক্সা ধর্মঘটে সবার অবস্থা কাহিল।

তখন মেয়েটি কাছে এসে দাঁড়াল। ফুটপাতের লোকটি আমার কথা সমর্থন করে পড়িমরি ৬ নম্বর বাসের দিকে দৌড়ে গেল। আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, আজ আর তোমার স্কুলে যাওয়া হল না।

সে হাসল। আমি আবার বললাম, বাড়িতে বসে গল্প বই পড়ো গে, অথবা উপন্যাস।

সে হাসল খুব সরল সহজ। থলেটি দু হাতে সামনে এনে ধরল। আমাকে প্রশ্ন করল, আপনি কোথায় যাবেন ?

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়, আমি চাকরি করি।

আবার চুপ করে গেলাম। একটা খালি রিক্সা দক্ষিণ দিক থেকে দিগ্বিজয়ী বীরের মতো ছুটে এল, কিন্তু কেউ ওর দিকে এগিয়ে গেল না, কেউ কিছু জিজ্ঞেসও করল না। সবাই জানে আজ ওদের ধর্মঘট, সে হয়তো কোথাও গিয়েছিল খুব ভোরে, অথবা সে-ই হয়তো রিক্সার মালিক, হয়তো এমনিই বেরিয়েছে রিক্সা নিয়ে। ঢাকা-ময়মনসিংহের একটা লাল বাস এল, ঝাঁপিয়ে উঠল অনেকে, বাস কণ্ডাক্টরের মানা শুনল না কেউ--ফার্মগেট-মহাখালী-বনানী তো যেতে পারবে! তারপর যা হোক ব্যবস্থা একটা হবে।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে তেমনি। আমার থেকে বয়সে ছোট তবুও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ডুবে ওর নাম জিজ্ঞেস করা হল না। আরো কয়েকজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে বাসে ওঠার জন্যে; এক জনের সিঁথিতে সিঁদুর, গোলগাল ফর্সা। নাদুস-নুদুস হাতকাটা ব্লাউজ পড়া এক মহিলা এসে দাঁড়াল ফুটপাতের নিচের রাস্তায়, একটা প্রাইভেট কার এসে দাঁড়াতেই কয়েকজন লোক হুমড়ি খেয়ে পড়ল, ড্রাইভারকে সমীহ করে বলল, কোন্ দিকে যাবেন ভাই, আমাদের নিয়ে যান···।

তখনি এক জন লোক এসে বলল, মৌচাকের মোড়ে রিক্সাওয়ালাদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়ে গেছে এক দফা।

কখন ?

ভোরে।

আহত হয়েছিল কেউ ?

না, মারাত্মক কিছু ঘটে নি শুনলাম।

মেয়েটির কাছে গিয়ে জিঞেস করলাম, কোন্ ক্লাশে পড়ো তুমি ?

লালমাটিয়া কলেজে পড়ি।

আমি অবাক হয়ে বললাম, সত্যি! আমি যে তোমাকে···আবার আমতা আমতা করে বললাম, কোন ইয়ারে ?

তৃতীয় বর্ষ।

এই দ্যাখো, তোমাকে ছোট মনে করে বসে আছি। তারপর আমার বয়স ও গাম্ভীর্য সব ঝেড়ে-পুছে বললাম, মনে করো না কিছু, তুমি করে

বলছি, স্কুলের ছাত্রী বলে ধরে নিয়েছিলাম তাই····। আর্টস পড়ো নিশ্চয়ই।

না, কমার্স।

কমার্স! তুমি তো খুব শক্ত মেয়ে। তোমার সঙ্গে সমীহ করে কথা বলা উচিত ছিল।

ঠিক তাই।—সে হাসতে হাসতে এক চোট নিয়ে নিল।

ঘাট মানছি, একশো বার।

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ, আরেকটা সিগারেট ধরলাম। শেষ হয়ে গেল। অফিসে যাব কিনা ভাবছি। নয়টা বেজে গেল। বাসে ঝুলে গেলেও মগবাজারে গিয়ে অফিসের গাড়ি ধরতে পারব না। আটটা পঞ্চাশে গাড়ি দাঁড়ায় সেখানে। এখন হেঁটে অফিসে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। আবার ভাবলাম--না, আজ আর অফিস নয়।

ওকে প্রশ্ন করলাম, কোথায় থাকো, মালীবাগ?

না, শান্তিবাগ।

তুমি তো আমার প্রতিবেশী। আমি মালীবাগ থাকি।

আমার শরীরে তখন শিহরণ খেলছে। ওর চোখের ভাষা আর অনুরাগ আমার অগোচরে নেই। এক রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে ভেতরটা গলে গলে যাচ্ছে। অনেকদিন পর বুকের ভেতর গনগনে আগুন জ্বলে উঠল।

সে আমাকে রমনা পার্কে নিয়ে গেল, সোরওয়ার্দি উদ্যানে। একেশিয়া গাছের নিচে দাঁড়িয়ে চিনিয়ে দিল গাছপালা, ফুল ও কয়েকটি পাখি। একরকম ছোট ছোট ফুলের গাছ দেখাল। ফুলগুলো ছোট দানার মতো, গোলাপী ফুলগুলো ঘাসের ওপর পড়ে বেগুনি হয়ে আছে। এভাবে কোনোদিন ফুল ও গাছপালার দিকে তাকাই নি আমি। চেরী জাতের একরকম ফুল গোলাপী ও বেগুনি হয়ে ফুটে আছে।

নাগকেশর গাছে নিচে দাঁড়িয়ে সে বলল, আপনি তো দেখি কোনো ফুলই চেনেন না।

আমি বললাম, তোমাকে ঠিক চিনে নিতে পারব, হাজার ভিড়ের মাঝ থেকে বের করে নিতে পারব।

কি করে মনে রাখবেন? আমার নামই তো জানেন না।

সত্যি! তোমার নাম কি?

না বলব না। আমি মনে করিয়ে দিলাম তাই জিজ্ঞেস করলে। নইলে আমার কোনো দরকার পড়ত না।

সে কিছুতেই নাম বলল না বরং আমাকে তুমি সম্বোধন শুরু করল। বকফুল, কাঞ্চন, রাধাচূড়া, সপ্তপর্ণী গাছ চিনিয়ে দিল। শেরাটন হোটেলের পেছনের মোড়ের নাগলিঙ্গম গাছটি কাটার কাহিনী বলল। বলল, নটরডেম কলেজে আরো দুটি গাছ আছে, বলধা গার্ডেনে আছে অনেক দুষ্প্রাপ্য গাছ। বাকল ছেড়ে তন্বী হয়ে ওঠা ইউক্যালিপটাস গাছটি দেখিয়ে আমাকে এক দুর্জ্ঞের ইঙ্গিত দিল। পাশাপাশি বসে হাত ধরল আমার। ওর ছোট পেলব মুঠো খুলতে খুলতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম—এত নরম হাত, এত সুন্দর আঙুলে যে দুমড়ে ভেঙে দিতে ইচ্ছে করে। চুমো খেতে মন চায়।

তোমার নাম কি বলো?

আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখে নিল। তারপর বলল, আমি বলব না, তুমি কী করবে করো।

তাহলে নাম দেই তোমার! তোমার নাম, নিম।

ইস কী বিচ্ছিরি তেতো! তারপর চুপ করে থেকে আবার বলল, ও নামে কে চিনবে আমাকে, আমাকে খুঁজে নেবে কি করে?

শান্তিবাগের রাস্তায় বসে থাকব, কলেজে ধর্ণা দেব, সকালে মালীবাগ মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকব। খুব ছোট বয়সে অমি গ্রামের ছেলেদের নিয়ে দল গড়তাম, আমি হতাম নেতা, কেউ দলের শৃঙ্খলা না মানলে তাকে শাস্তি দিতাম, শাস্তির ভয়ে অনেকেই দল থেকে বেরিয়ে যেত। কিন্তু দলের শৃঙ্খলা রক্ষায় কখনো নরম হই নি।

রাখো তোমার নেতাগিরি। কই এখন কি করছ? দুঃস্থ মানুষের সাহায্যে কি করো, ট্রাকে চাপা পড়ে ছাত্ররা মরল, তুমি কি করেছ তাদের জন্যে?

চুপ করে গেলাম আমি। ওর প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। প্রতিদিন কোথাও না কোথাও মিছিল হচ্ছে, মানুষ মরছে।

বসন্তের হাওয়ায় ফুল আছড়ে পড়ছে কপালে, কোকিল ডাকছে দূরে, ওর প্রশ্নগুলোও উদ্দীপনায় ভরা ঝলমলে তরুণের মতো। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওকে যে মালীবাগের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকব বলেছি তা কি সম্ভব? দু' দিন পর অফিস সকাল সাড়ে সাতটায় হবে, তখন কোথায় থাকবে সে আর কোথায় আমি!

তখনই শাহবাগের দিকে হৈ-হল্লা শোনা গেল। আমরা কান খাড়া করলাম।

নিম বলল, শুনতে পাচ্ছ, জঙ্গী মিছিলের শব্দ!

মিছিল ও আন্দোলনের নামে আমার বুক কেঁপে উঠল। পত্রিকার পাতায় প্রতিদিন দেখি মিছিলের খবর, প্রতিদিন গোলাগুলি ও মৃত্যুর, সেই মৃত্যু নিয়ে আবার মিছিল...আবার প্রতিবাদ ও মিছিল...।

দেখতে দেখতে মিছিলের শব্দ উত্তাল হয়ে উঠল। লোকজন ছোটাছুটি করছে, উদ্যানে ঢুকে পড়েছে মানুষ, রাস্তায় গাড়ি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে, অল্পক্ষণের মধ্যেই রাস্তা গাড়িশূন্য হয়ে পড়ল। আমরা উদ্যোনের পশ্চিম দিকে তখন, ওর বইয়ের থলে আমার হাতে, উদ্যানে ঢুকে পড়া মিছিলের মানুষ আরো জঙ্গী হয়ে উঠেছে। নাগকেশর ও বকুল গাছের আড়ালে আড়ালে আমরা ছুটছি। ওকে টেনে নিয়ে ছুটতে ছুটতে উদ্যানের পুকুর পাড়ে পেঁীছলাম। একটু নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় পেলাম, জঙ্গী জনতাকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছি। ওর ঘামে ভেজা চোখ-মুখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, এক মুহূর্তে মনে হল পাকিস্তানি সৈন্যদের গুঁড়িয়ে দেওয়া কালীবাড়িটি ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, আর সেই বিশাল কালীমূর্তি আমাকে জিভ বের করে গ্রাস করতে আসছে। নিম ভয়ে আমার বুকের ভেতর সেঁধিয়ে আছে। চিৎকার করে সে বলল, তোমার বুকে মাথা রেখে আমি মরতে পারি, আরো জোরে চেপে ধরো আমাকে, আমাকে বুকের ভেতর পুরে নাও। আমার ভীষণ ভয় করছে। মাথা ঝাড়া দিতেই সব ঠিকঠাক দেখতে পেলাম। পুকুরের জল অনেক শুকিয়ে গেছে। রাস্তার এক মেয়ে চান শেষ করে ভেজা কাপড়ে উদ্যান পাড়ি দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, একটা কাক ও শালিক ঠোঁটে তুলে পানি খাচ্ছে। নিম হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, পালিয়ে যাচ্ছ তুমি? তুমি না এক সময় পাড়ার ছেলেদের দলপতি ছিলে? কেউ দলের শৃঙখলা ভাঙলে তুমি না শাস্তি দিতে?...

নিম, সে অনেক পুরোনো কাহিনী।

লোকজনের ঢেউ এসে পড়ল আমাদের গায়ে। সে আমার হাত চেপে ধরে বলল, কোথায় পালাচ্ছ, অফিসে গিয়ে লুকোবে, আমাকে ফেলে পালাতে চাও?

তোমাকে ফেলে পালাব কেন? চলো চলো...

সে তখন থরথর কাঁপছে আর বলল, ঐ দ্যাখো ঢুকে পড়েছে। আর পালাবার সময় নেই, দক্ষিণ দিক থেকেও ছুটে আসছে। মুহূর্তের মধ্যেই প্রলয় ঘটে গেল। মানুষের চিৎকারে গাছপালা ও উদ্যানের পাখিদের ডাক চাপা পড়ে গেল, লাঠির আঘাতে এক একজন লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে, বুম বুম শব্দ হল অদূরে কোথাও, বন্দুক ও লাঠি-পেটায় রক্তের নহর ছুটল আর দেখতে দেখতে আমার চোখের সামনে আহত লুন্ঠিত নিম একটি রক্তকবরী গাছ হয়ে গেল।

নিশ্চিহ্ন সেই কালীবাড়ির ওপর রক্তকরবী গাছটি নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে এখন। আমি প্রতিদিন অফিস থেকে ফেরার পথে অথবা অফিসে যাওয়ার সময় গাছটি দেখে যাই। উদ্যানের তরুণ মালী সালাউদ্দীনকে বলে দিয়েছি, গ্রীষ্মকালে সে যেন গাছের গোড়ায় জল দেয়, যেন কোনো রকম অযত্ন না হয়।

আমি অপেক্ষা করে আছি, কবে সে-গাছে ফুল ফুটবে।

[গল্পগ্রন্থ : নদীর নাম গণতন্ত্র]

গীতিময় স্নান

পানি পানি পানি।

বোশেখ পড়ার মুখেই পানির অভাব শুরু হল। প্রথম প্রথম সপ্তায় দু-এক দিন, তারপর অবস্থা একেবারে আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। সারা দিন এক ফোঁটা পানি নেই। শুধু খাওয়ার পানিটুকু জোগাড় করলে তো চলে না। রান্নার কাজে কম করে দু-তিন কলসি লাগে। তারপর ধোয়া-মোছাতে আরো বেশি। আছে চান করা। শৌচকর্মও অপরিহার্য কাজ। চাল ও তরকারী ধোয়ার পানি দিয়ে টবের গাছের প্রয়োজন মেটান যায়। কিন্তু ঐ পানি দিয়ে আবার এক প্রস্থ থালা-বাসন ধোয়ার কাজ সারতে হয়। এরপর কাপড় কাচার কাজে কত লাগতে পারে তা আপনারাই ভেবে বলুন।

জিয়াদ না হয় অফিসে গিয়ে দিন-শুরুর শৌচকর্ম সারতে পারে। কিন্তু দাড়ি-গোঁফ কাটা। অভাব যখন শুরু হয় অফিসও রেহাই পায় না। প্রকৃতির ছোবল অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। মার খেতে খেতে একেবারে কোণঠাসা হলে তবেই প্রকৃতি চোখ তোলে। এই জল-হাওয়ার দেশে পানির এই অভাব কি কেউ কোনো দিন ভাবতে পেরেছিল? মানুষের দয়া-মায়া কমে যাওয়ার সঙ্গে কি এর কোনো সম্পর্কে আছে? পদ্মা-মেঘনা-যমুনা ঘেরা ঢাকার এই অবস্থা হয় তো পঞ্চগড় কোথায় দাঁড়াবে! পানি বিশেষজ্ঞরা বলে, এ হল নদীর উজানে বাঁধ দেওয়ার ফল। কেউ বলে ভূগর্ভস্থ পানির অপরিকল্পিত ব্যবহার। কিন্তু যমুনা ও মেঘনার উজানে তো বাঁধ নেই। কেউ বলে বর্ষায় পানি ধরে রাখতে হবে, জলাধার তৈরি করতে হবে। শহরের পানি যোগান দিতে হবে নদী আর তৈরি জলাধার থেকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ অত-শত বোঝে না। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, পানির অভাব ও লোড শেডিং বোঝে। ঢাকা শহরে কত লক্ষ গ্যালন পানি দরকার এবং সেটা কোথা থেকে আসবে তার দায় ওয়াসার। দিনে এনে দিনে খাওয়া মানুষ তো পানির সমস্যা মেটাতে বৈঠকে বসতে পারে না। এমন কি দুদিনের জন্যে পানি ধরে রাখবে সেরকম বড় একটা ড্রামও থাকে না সবার।

কষ্ট এক দিন চরমে উঠল। সকাল থেকে ট্যাঙ্কে পানি নেই। রাতে যেটুকু এসেছিল তাকে ঠিক আসা বলে না। নিচের ট্যাঙ্ক থেকে মেশিনে ছাদের ট্যাঙ্কে তুলতে না তুলতে পানি শেষ। মাত্র চার বালতি পানি ধরল দলমা। সেই পানি রেশনের ওপর রেশন করে দুপুর পর্যন্ত কাটল। নাওয়া হয় নি, বাসি কাপড়-চোপড় ধোওয়াও নয়। এক বালতি খাওয়ার জন্যে, এক বালতি বাথরুমের ব্যবহারের জন্যে, এক বালতি দিয়ে রান্নাবান্না আর এক বালতি দুঃসময়ের জন্যে সঞ্চয় হিসেবে। বালতি ঢাকা থাকে যাতে আরশোলা টিকটিকি না পড়ে। ছুটা কাজের মেয়ে আঙুরকে বিদায় দিল ঘর ঝাড় দিয়েই। ছেলেমেয়ে দুটিকে স্কুলে নিয়ে গেল জিয়াদ। সেখানে থেকে অফিসে পৌঁছে দেখে অফিসও কারবালা। প্লাস্টিকের গ্যালন হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক ছুটছে রাস্তার বাসিন্দা ছেলেমেয়েরা। বস্তি থেকে এল পানি নিতে। সবার মুখে একই কথা—পানি নেই, পানি নেই। জিয়াদ টেলিফোন করতে বসল পত্রিকা অফিসে। পরিচিত সাংবাদিককে পেয়ে জানতে চাইল শহরের অবস্থা কেমন। সাংবাদিক বন্ধুও ফিরিস্তি দিল কোন কোন এলাকায় পানি নেই। শাজাহানপুরের গৃহবধুরা কলসি হাতে মিছিলে নেমেছে। পানিটোলায়ও একই অবস্থা। বাসাবোতে আছে জিয়াদের আরেক বন্ধু। তার অফিসে ফোন করতেই উত্তর এল—ভাবছি, বউ ছেলেমেয়েদের গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। শুনে জিয়াদও বলল, তাহলে আমিও তাই করব।

দুটো বাজতেই জিয়াদ ছুটল বাসায়। সারা পথ ভাবল পানির কথা। বাসে দেখা গেল তিনজন যাত্রী ভাগ্যবান। তাদের পানির কষ্ট নেই। তবে বাড়িওয়ালা রেশন করে পানি দিতে আরম্ভ করেছে। ট্যাঙ্কে সব সময় অর্ধেক পানি রিজার্ভ রাখছে। জিয়াদ ও সবাই তাদের মনে মনে ঈর্ষা করে গেল।

বাসায় পৌঁছল সে। ট্যাঙ্কের মুখ খোলা। তলা পর্যন্ত খাঁ খাঁ করছে। দলমা দরজা খুলল গোমরা মুখে। ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকে এনে খাইয়ে দিয়েছে। এক গ্লাস পানিতে মুখ-হাত ধুয়ে সেও খেতে বসল। ব্যস, প্রথম দফায় হাতে লেগে গ্লাস ভর্তি খাওয়ার পানি উল্টে গেল। জীবনে এই প্রথম সে ভাবল, পানি যদি না হয়ে কঠিন পদার্থ হত তো কুড়িয়ে নিতে পারত। দলমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে কষ্টকর হাসি-মুখ করে সে বলল, এক গ্লাস পানির জন্যেও এখন অপরাধ বোধ। তারপর আবার চুপ মেরে গেল

দু জনে। পানির কষ্ট শুরু হওয়ার পর থেকে ওদের মধ্যে কথা-বার্তা কমে গেছে। কথা বললেই ঘুরে-ফিরে চলে আসে পানির প্রসঙ্গ। সরকারের বননীতির সমালোচনা করে কয়েক দফা। একটি দেশের জন্যে কত ভাগ বনের দরকার, পরিবেশের ভারসাম্য ইত্যাদি কত কথা।

বিকেলে আঙুর এল পানি এসেছে কিনা দেখতে। না, আসে নি। তার হাতে দুটি প্লাস্টিকের গ্যালন। তাদের বস্তির অবস্থা একেবারে কাহিল। তারও আমার মতো প্রাণ-চাঞ্চল্য নেই, কথায় কথায় হাসি নেই। আধ মাইল দূরে বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় কিন্তু পানির অভাব নেই। ওরা কলের মুন্ধ বন্ধ করে না বললেই চলে। সেখান থেকে কেউ কেউ কলসিতে করে পানি আনে। এক দিন দু দিন চাইলে পানি দেয়। তৃতীয় দিন মুখ গোমরা করে বিরক্তি দেখায়। তারপর নিশ্চয়ই সোজা না করে দেবে। আঙুরদের বস্তির পাশেই একটা নতুন বাড়ি উঠছে। চারতলায় গাঁথুনি চলছে। বাড়ির মালিকের দয়ার শরীর। যে কেউ পানি নিতে গেলে এক কলসি দেবে। সারা দিন বাড়ির কাজ তদারক করবে আর কাকে একবার পানি দিয়েছে চেহারা দেখেই মনে রাখতে পারে। একবারের বেশি কাউকে পানি দেবে না। মহল্লার সবার বাড়ি ও নম্বর তার মুখস্ত। জিয়াদ একটা বালতি নিয়ে বের হল। ভদ্রলোক পানি পাঠিয়ে দিল লোক দিয়ে, এবং বলল, এক বালতির বেশি কাউকে দেই না। জিয়াদ ভাবল আঙুরকে পাঠাবে কলসি নিয়ে, শিখিয়ে দেবে কি বলতে হবে না হবে। তারপর আঙুরকে পাঠাল এবং যথারীতি ধরা পড়ে ফেরত এল।

বিকেল কাটল অস্বস্তিতে। দলমার সঙ্গে মন খুলে কথা হয় না। ট্যাঙ্কে পানি আসছে না। পানির চিন্তায় দলমার রক্তচাপ বেড়ে গেল। সে সটান শুয়ে পড়ল। দলমাও কী আর করবে। আঙুর আগে প্রতিদিন কাজ শেষে দু গ্যালন পানি নিয়ে যেত। সেদিন সে মুখ ভার করে বলল, ঘরে একটুকও পানি নাই। কেউই আর পানি দিবার চায় না। দিন দিন দুইন্যাই কেমুন হইয়া যাইতেছে।

দলমা বলল, কি আর করবে। পানি তো আমাদেরও নেই। থাকলে তো পেতে।

আঙুর মেয়েটি বিশ্বাসী। জিয়াদ ভাবে তাকে সারা দিনের জন্যে রাখতে পারলে ভালো হত। তাতে করে তাকে দু বেলা ভাত দিতে হবে। তার ওপর চা-পানি ও এক শ' টাকা আছে। দুই ঈদে কাপড় দিতে হবে। এক ঈদে শাড়ি দিলে অন্য ঈদে ব্লাউজ-পেটিকোট। এভাবে হুট করে খরচ বাড়ালে সামলাতে বেগ পেতে হবে। বিলাসিতা হয়ে যায় আঙুরকে সারা দিনের জন্যে রাখলে। সে বলেছে তা না হলে পোশাক তৈরির কারখানায় চাকরি খুঁজবে। ছুটা কাজের মেয়েও পাওয়া মুশকিল। বিশ্বাসী বলে আঙুরকে ছাড়াও যায় না। ওকে ঠকানো হচ্ছে সেটাও ঠিক। মাত্র ষাট টাকার বদলে ধোয়ামোছার কাজ, মরিচ-মশল্লা বাটা, মাঝে মাঝে মাছ কোটা—বলতে গেলে তাকে শোষণ করার সামিল। বেচারী না করে না। এজন্যে তোষামোদও করতে হয়। দলমাকে না জানিয়ে পাঁচ-দশ টাকা বকশিস দেয়। কত কম দামে শ্রম বেচে ওরা। বিয়ে হয় নি বলেই হয়তো এসবের পাত্তা দেয় না সে। যে কাজ তাকে দেওয়া হয় কোনো প্রতিবাদ ছাড়া সে তা শেষ করে। ছেলেমেয়ে দুটিকেও মাঝে মাঝে দেখাশোনা করে। ওরা পাশের বাড়ির উঠোনে খেলতে যায়। বিকেলটা ওদের জন্য মুক্তি। সারা দিন ওরা এই বিকেলের জন্যে হাঁ করে থাকে। শহুরে জীবনে এর বেশি মুক্তি আর কোথায়।

শুধু ঘর ঝাড় দিয়ে আঙুর চলে গেল। কাপড়-চোপড় স্তূপ হয়ে আছে। হাঁড়ি-পাতিল থেকে চামচ দিয়ে নিয়ে খাওয়া সারতে হয়। একটা বাটি ধোওয়াও অভাবের দিনে বাড়তি বোঝা।

রাত একটা নাগাদ ট্যাঙ্কে পানি আসবে। সময় কাটাবার জন্যে জিয়াদ বই নিয়ে বসে। পড়ায় মন বসে না। ছেলেমেরা ঘুমিয়ে পড়েছে। মাথায় পানির চিন্তা নিয়ে উপন্যাস পড়াও এগোয় না। 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প' বইটি টেনে নিল। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীরাই তো তার অফিস দখল করে আছে। বাছাই করে করে তাদের উঁচু আসনে বসান হয়েছে। তার মতো চুনোপুঁটিদের কথা কে মানে! ইন্দোনেশিয়ার মুখতার লুবিস-এর 'ভয়' উপন্যাসটি মুখ বাড়িয়ে আছে। মাহমুদুল হক-এর 'প্রতিদিন একটি রুমাল' গল্পটি কয় দিন আগে পড়েছিল। তাঁর কোনো গল্প সঙ্কলন নেই। খুব আস্তে আস্তে পানি আসতে শুরু করেছে ভূগর্ভের ট্যাঙ্কে। ঘড়িও চলে যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। চোখে ঘুম নেমে আসে। কিন্তু ঘুমোলে চলবে না। রাত যত হোক একবার পানি দেবে। নিচে নেমে দেখে আসবে কিনা ভাবল। পাঁচ তলা বাড়ি। দশটা ফ্লাট। সব বাসায় এক জন দু জন জেগে আছে পানি ধরবে বলে। বালতি, হাঁড়ি-পাতিল, ড্রাম সব খালি। এক ড্রাম পানি পেলে এই আকালে দু দিন চালান

যেত। অত পানি একেবারে পাওয়া মানে তো সমস্যার সমাধান। মাঝে এক বার কুকুরের ডাক থেমে গেল। শহরের বড় রাস্তায় গজরাতে গজরাতে ট্রাক চলে গেল। পুলিশ লাইনে লোহার পাতে ঘণ্টা পেটানর শব্দ হয়। ঠিক সাড়ে তিনটায় পানি এল যেন লাজলজ্জা ভুলে। একটা ছোট ড্রাম আর চারটে বালতি ভরতে পারলে হয়। দলমা সেই ফাঁকে কাপড় কেচে নিতে চায়। দুটো বড় হাঁড়ি আছে। কিন্তু সব কাজ শেষ করার আগে পানি বন্ধ হয়ে যাবে বুঝতে পারল দলমা। সে বলল, ঐ শোনো, মেশিন বন্ধ হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি করো। জিয়াদ বলল, কত আর তাড়াতাড়ি করব। আস্তে আস্তে আসছে পানি।

জিয়াদ নিচে গিয়ে দেখে এল। ট্যাঙ্কে পানি আসা বন্ধ হয়ে গেছে। অর্থাৎ আগামী দিন আবার একই অবস্থা। ···না, এভাবে চলা যায় না। আর দু দিন দেখে দলমাদের গ্রামে পাঠিয়ে দিতে হবে। পানির এ অবস্থার জন্যে সে ছেলেমেয়েদের ওপর পর্যন্ত চোটপাট শুরু করেছে। অথচ ওদের কী দোষ! জিয়াদ সব বোঝে। দলমা বলে, ওদের রাগ দেখাচ্ছে কেন বলো তো।

ঠিক তাই। গ্রামে পাঠাবার আগে ছেলেমেয়েদের খুব আদর-সোহাগ করল। দলমাকে চুমো খেতে খেতে বলল, ওদের সাঁতার শেখাতে চেষ্টা করো। দশ-বিশ বছর বাদে হয়তো সাঁতার কাটার মতো পানিই দেশে থাকবে না, তবু।

দলমা বলল, বর্ষাও বুঝি হবে না? তুমি এত হতাশ হয়ে পড়ছে কেন?

কে জানে! আমার মনে হয় বর্ষার পাঠও বুঝি উঠে যাবে।

পাগলামো বন্ধ করো।

ঠিক আছে। তবে ওদের পুকুর থেকে সামলে রেখো। ঘাট খুব খারাপ। তুমিও সাবধানে নেমো।

আরো নানা উপদেশ দিয়ে দলমাদের গ্রামে পাঠিয়ে দিল। স্টেশন থেকে অফিসে ফিরে চট্টগ্রামে ফোন করে দিল দলমার ভাইকে। বাসায় ফিরে একা একা কতক্ষণ বই ঘাঁটাঘাঁটি করল। সচিত্র আরব্য রজনী বইটির ছবিগুলো উল্টোপাল্টে দেখল। বইটি মূল থেকে সরাসরি অনুবাদ। দেহকে ওরা কতভাবে যে নাড়াচাড়া করেছে, নরনারীর দৈহিক সম্পর্কে কত অকপট, গল্পের অবাধ যাত্রা······। তিন শ' একানব্বইতম রাতে তরুণ ও তরুণীর দেহ-সৌষ্ঠব বর্ণনায় সে আটকে গেল। পড়ল, নারীর আকাঙ্ক্ষাতেই সূক্ষ্ম মসলিন আবিষ্কৃত হয়েছিল। যত সূক্ষ্ম সূচীকর্ম দেখেন তা শুধুমাত্র নারীর মনোরঞ্জনের জন্যেই তৈরি হয়। নারীর রূপ···তারপর আবার পানির সমস্যায় ডুবে গেল। আলো না থাকলে কোনো মতে চলে। আলো না থাকলে পাখা ঘুরবে না, গরমে সেদ্ধ হতে হবে। তবুও তো বাঁচা যায়। পানি না হলে যে একেবারেই চলে না। নদীর ধারে জিয়াদের বাড়ি। পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন সভ্যতা নদীর কূল-কেন্দ্রিক। ছেলেবেলা থেকে সে নদীতে সাঁতরে দুরন্তপনা করেছে। বাজি ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নদীতে ভেসেছে। বর্ষার নদীর পলিমাখা পানিতে ফিটকিরি দিয়ে খাবার পানি করেছে। তখন তাদের গ্রামে একটিও চাপকল ছিল না। গাঙের কূলে ঘর বলে গরম কালে পুকুরের পানি কমে যায়, কিন্তু সেটা কখনো খুব বড় সমস্যা ছিল না। বর্ষায় নদী পুকুর বিল থই থই করে। বান হত কোনো কোনো বছর। পলি পড়ে চরের জমি হত উর্বর। পরের বছর সে জমি থেকে দ্বিগুণ ফসল উঠত। এখন আর তেমন করে বান হয় না। কালেভদ্রে বান হলেও চর ডোবে না। সেই জিয়াদের এক জীবনে পানির জন্যে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। অনেক গ্রামেও এখন পানির সমস্যা।

দলমাদের গ্রামে পাঠিয়ে জিয়াদ অনেকখানি মুক্ত। দু-এক বালতিতে দিন কাটিয়ে দিতে পারে। বালতিতে পানি নিয়ে মাথা ধুয়ে সে পানি গায়ে ঢালে। গামছা ভিজিয়ে গা মুছে নেয় রাতে। গরম পড়ছে যেন রাগ পুষে। এক দিন তাপ উঠল একচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেদিন রাত তিনটেয় চার বালতি পানি ধরে চমৎকার একটা চান সেরে বিছানায় গেল ঘুমোতে। ক্লান্ত শরীরে ঘুম নামে তাড়াতাড়ি। সকালে অফিসে যাওয়ার আগে আর চান করল না। অনেক দিন পর হাল্কা শরীর নিয়ে অফিসে গেল। বিকেলে আঙুর এল। ওদের অবস্থা আরো খারাপ হচ্ছে দিন দিন। কলে দিনেরাতে একটুও পানি আসে না। আশপাশ চুঁড়ে পানি সংগ্রহ করে।

আবার দু'দিন নাওয়া নেই। দু রাত বলতে গেলে পানি আসেই নি। মেশিন চালিয়ে পানি তোলা যায় না। বালতিতে রশি বেঁধে সব বাসায় দু' বালতি করে পানি ভাগ করে দিয়েছে বাড়িওয়ালা। জিয়াদ হোটেলে খেয়ে আসে। মেয়েটি এসে শুধু ঘর ঝাঁট দিয়ে যায়। পানি নেই এ ভাবনাটিই বেশি কাহিল করে দেয়। পত্রিকায় লেখালেখি চলে। উত্তরবঙ্গে মরুপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞ এক

রিপোর্টার তার ভাষ্য ছাপে। আর কুড়ি বছরের মধ্যে রাজশাহী অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে, এই মুহূর্ত থেকে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। বর্ষায় যে-সব নদী পানিতে খলবল করে সে-সব এখন একে বারে খাঁ খাঁ। এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রামে লোকজন ছুটছে খাবার পানির জন্যে। পদ্মা ও যমুনায় নতুন চর জাগছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেদিন আঙুর এসে বলল, ভাইজান, আমাগো বস্তির মানুষ দ্যাশে চইলা যাইতাছে। আমরাও যামু। তিন দিন গোসল নাই। বাঁচনের আর পথও নাই।

জিয়াদ বলল, আমিও চান করি না।

সে বলল, আমাগো বস্তির লগে একটা পুকুর আছে। টলটল পানি। মস্ত বড় পুকুর। তার মালিক দিনভর চাবুক লইয়া পাহারায় থাকে। পুকুর পাড়েই চা খায়, সিগারেট খায়। দুপ্‌রে খাইতে গেলে বড় মাইয়ারে রাইখা যায়। এক বদনা পানিও লইবার দেয় না। কাইল ফজর সময়ে আন্ধার থাকতে থাকতে আলীর মা কাপড় ধুইবার গেছিল। ধোওয়াও শেষ কইরা আনছিল। কিন্তু কপাল খারাপ। ধরা পইড়া গেল। পাষণ্ডটা বেবাক কাপড় কাঁচি দিয়া ফ্যালা ফ্যালা কইরা পুকুরে ফেইলা দিল। বালতিখানও এক্‌কেরে পুকুরের মইধ্যে।

পরদিন শুরু হল পানির লাইন খোঁড়াখুঁড়ি। ট্যাঙ্কও পরিষ্কার করল। জিয়াদ-এর বুকটা হু হু করে ওঠে। ট্যাঙ্কের তলানির পানিটুকুও নেই। আঙুর এসে বলল, আমারে কিছু ট্যাহা দিবেন? মাস ত শেষ হয় নাই, যে-কয় দিনের পাই দেন। দ্যাশে চইলা যামু। মায়ও যাইব। ভাইডা শুধু থাকব। ব্যবসাপাতির ট্যাহা আটকা পইড়া আছে। অহন চইলা গেলে সব শেষ হইয়া যাইব।

গ্রামে তোর কে আছে রে?

বড় ভাইজান আছে। সে জুদা। আর চাচায় আছে।

মাসের শেষ সপ্তাহ চলছে। হাতে টাকা নেই বললেই চলে। তার ওপর দলমার জন্য একটা আটপৌরে শাড়ি কিনেছে। আঙুরকে বলল, আর কয়টা দিন অপেক্ষা কর। এই দু দিন। পুরো মাসের টাকাই দেব। আঙুরও বলল গরম শেষ না হলে ওরা ফিরে আসবে না। দেশ-গ্রামে কাজ নেই। গার্মেন্টসে তার কাজ পাওয়ার আশা আছে। কিন্তু পানির কষ্টের সুরাহা না হলে শহরে থাকবে কী করে।

সপ্তাহের শেষ দিনটি আর কাটতে চায় না। পানির লাইনের খোঁড়াখুঁড়ি শেষ। দু' ফুট নিচু করেছে। জিয়াদ পার্কে বসে বিকেলটা কাটাল। বন্ধু ও আত্মীয়ের বাসায় যাওয়ার কথা মনে পড়েছিল। অন্য সময় হলে যেত। মাথায় পানির চিন্তা নিয়ে কারু কাছে গেল না। পার্কেও খুব ভালো লাগল না। গাছগুলো কেমন নেতিয়ে পড়েছে। নাগকেশর, অশোক ও জারুল ফুল কেমন ঝিমিয়ে আছে মনে হল। পার্কের পুকুরে অনেক লোক। পাখিরাও নাইছে। ওদের জন্যে শান বাঁধান ঘাটের দরকার পড়ে না। সে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। ওপরের পানি গরম। একবার ভাবল গায়ের কাপড় সুদ্ধ নেমে পড়বে কিনা! লুঙ্গি ও গামছা আনলে শরীর জুড়োতে পারত। শেষে মুখে ও ঘাড়ে পানি দিল। শার্ট খুলে গায়ে ভালো করে দিল। আবার শার্ট গায়ে দিল। শার্টের অনেকখানি ভিজে গেছে। এক মেয়ে শাড়ির নিচে হাত দিয়ে ভরা বুক মাজছে। ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে পূর্ণতা দেখা দেয়। ওদিকে নেমেছে আরো দু' জন। সিঁড়িতে কাপড় ধুচ্ছে পুরুষরা। সেই মেয়েটি কাপড় বদলাতে বদলাতে জিয়াদের দিকে তাকাল। চোখে চোখ পড়ল। প্রায় আঙুরের বয়েসী, কিন্তু বিবাহিতা মনে হয়। মেয়েটি হাসল না, কিন্তু শাসন করল। নিজেকেও শাসাল ঘুরে দাঁড়িয়ে। জিয়াদ তখন প্যান্ট গুটিয়ে হাঁটছে। সে নাগকেশরের গন্ধ পায়। অশথ গাছে কয়েকটা দাঁড়কাক চুপচাপ বসে আছে। বেশ কয়েক মিনিট ধরে ওরা ডাকছে না। এরকম মৌনব্রত নিলে ওদের গরম কমে কিনা ওরাই জানে। চুপচাপ থাকলে কি আয়ু বাড়ে? সেও অনেকক্ষণ কথা বলছে না। কার সঙ্গেই বা বলবে, একা একা কি কথা বলা চলে?

হঠাৎ তার খুব গান গাইতে ইচ্ছে করল। 'চৈত্র পবনে মম চিত্তবনে' গানটি কেন মনে পড়ল কে জানে! দলমা না থাকলেই শরীর টাটাতে থাকে। মাহবুবের প্রস্তাবের কথা মনে পড়ে। একা একা থাকলে অনেক মুখ মনে পড়ে যায়। পুরনো প্রেম, পথের দেখা নারীর সঙ্গ কামনায় আকাশ-কুসুম গড়ে। শুধু ভাবে কে যেন আসবে। এসে ডাকবে দরজা খুলতে। পার্কে দেখা প্রতিটি নারীকে সুন্দরী ও ভালোবাসার যোগ্য ভাবে। দু' দিন আগে মাহবুবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ওর দোকানে। খুব সস্তায় একখানা শাড়ি দিয়েছিল। বলেছিল পানি সমস্যার কথা। দলমাদের গ্রামের পাঠানর কথা। মাহবুব বলেছিল, একা আছিস? সময় কাটে কি করে? সঙ্গী চাই

তো বল। ঐ যে দেখছিস পেছন ঘুরে আছে মেয়েটি! সে খবর নিতে এসেছে। ওকেও নিতে পারিস। বাসায় চলে যাবে। সারা দিনও রাখতে পারিস, রাতেও।

পার্কে সন্ধে কাটিয়ে হোটেলে গেল খেতে। কোনো মতে এক থালা খেয়ে বাসায় ফিরল। পানি আসে নি। আরো এক দফা ক্লান্তি জাপটে ধরল। এত ক্লান্ত যে বিছানায় পড়াই শুধু বাকি। বিছানাও ডাকছে। তবুও জাগতে হবে। বাড়ির দু' নম্বর মালিক বয়সে তরুণ। জিয়াদ থেকে অনেক ছোট। সে আশ্বাস দিয়ে গেল পানি আসবে বলে। ভোরে পানি পাওয়া যাবে। রাতটা নিশ্চিন্তে ঘুমুতে বলল। সপ্তাহের শেষ দিন। ছুটির দিন ঘুম থেকে উঠে পানি মিলবে বলে গভীর আশ্বাস দিয়ে গেল। জিয়াদও আর রাত জাগবে না ভেবে বিছানায় গিয়ে টানাটান হয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর বালিশটা কোলে টেনে নিল। ঘুম আসবে বৈকি! পার্কের স্নানরতার ছবি মনে পড়ে চকিতে। মাহবুবেব সেই মেয়েটিও কম না। একা থাকলে কত ভাবনা!

ঘুম ভাঙল দেরিতে। সুর্য উঠতে উঠতেই চরাচর গরম করে তুলছে। জিয়াদ ক্লান্তি নিয়ে আরো কিছুক্ষণ পড়ে রইল। বিছানা ছাড়তেও ভয়। যদি পানি না আসে! কলের মুখ বন্ধ করে রেখেছে। মেশিন ছাড়ার শব্দও পায় নি। ঘুম হচ্ছে মৃত্যুর যমজ ভাই। শরীরে এক মুঠো জোর নেই। তার চেয়ে ভয় যদি পানি না আসে। এমন সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল। ছুটির দিনে কে এত সকাল সকাল কড়া নাড়তে পারে ভাবতে ভাবতে জিয়াদ উঠল। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে বনবন। গেঞ্জিটা-লুঙ্গিটা পাশ থেকে টেনে নিল। একা থাকলে সে এরকম শোয়। উলঙ্গ শোওয়াটা তার বিলাস।

দরজা খুলতেই দেখে আঙুর। এক ঝলক মোহনীয় হাসিতে মুহূর্তের মধ্যে জিয়াদের শরীরে ঝড় বইয়ে দিল। থর থর করে কেঁপে উঠল সেই ভুবনমোহিনী হাসিতে। দলমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ও হাসির মুহূর্তগুলো ছবির মতো ছুটে এল। জিয়াদকে এক রকম ঠেলে আঙুর ঢুকল। দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, পানি আইছে, পানি আইছে।

পানি এসেছে? পানি? সত্যি!—আর এক মুহূর্তও দেরি না করে আঙুরকে এক রকম ধাক্কা দিয়ে ঠেলে এক টানে গেঞ্জি খুলে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে এক লাফে বাথরুমে ঢুকে পড়ল। দরজা বন্ধ করে এক মোচড়ে ঝর্ণা খুলে দু' হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল। আফ্রিকার আদিবাসীরা প্রকৃতির কাছে যেমন প্রার্থনা জানায় তেমনি দু' হাত তুলে দাঁড়াল। পানি আসাও প্রকৃতির আশীর্বাদ। জিয়াদ মনে করে প্রকৃতি ছাড়া মানুষের বাঁচার আর কোনো উপায় নেই। মানুষ প্রকৃতি থেকে দু' হাতে গ্রহণ করে নিষ্ঠুরের মতো, কিন্তু প্রকৃতিকে দিতে চায় কৃপণের মতো। প্রকৃতিও এক সময় রুদ্র রূপ নিয়ে এক হাত দেখে নেয় মানুষকে। আনন্দে উল্লাসে জিয়াদ হাত তুলল, ফুর্তিতে গান ধরল, জলতরঙ্গ বাজে......। কেন এ গানটি মনে পড়ল সে জানে না। সারা গায়ে দু' হাত খেলা শুরু করছে। চোখ-মুখ-কপাল ঘষল। কানের পেছনের ঘাম তুলল। বগলের নিচে সাবান মাখল। বুকের ছাতি ফোলাল। নিজের উদোম শরীরটা বার বার দেখল। একান্ত অন্তরঙ্গ অঙ্গে সাবান দিতে দিতে কিছুক্ষণ খেলা করল। মাথার ওপর ঝমঝম ঝর্ণা আর শরীর নিয়ে খেলায় সুখ খুঁজল। দলমা না থাকলে শরীর নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভালো লাগে। মনে পড়ল গ্রামের নদীতে সাঁতার কাটার স্মৃতি। ভাদ্রের গরমে নদীতে সাঁতার কাটার মতো দুরন্ত আনন্দ আর কিছুতেই হয় না। সারা শরীর জলের স্পর্শে রোমাঞ্চিত হয়ে ভেঙে ভেঙে পড়ে। এ জন্যেই বুঝি মানবসভ্যতা নদীকেন্দ্রিক। এজন্যে জলই জীবন। এজন্যে পানির অভাবে এত উত্তেজনা, এত বিষাদ, এত উদ্বেগ। পানি আসার সঙ্গে সঙ্গে তাই সে শরীর নিয়ে পড়ল। মুহূর্তে মুহূর্তে মনে পড়ে একেক কথা। ছেলেবেলার কথা, কৈশোরের কথা, দলমার। গ্রামে ফেলে আসা সেই মেয়েটি তাকে বার বার কাছে ডেকে চুমু খেত। এক বার মাত্র শোনা একটি গানের কথা মনে পড়ল। এক দিনের খাওয়ার কথা মনে পড়তেই হঠাৎ খুব খিদে পেল। আঙুরকে বললেও হত। ডিম ও আলু সেদ্ধ বসাত। বয়ামে টমেটোর জেলি থাকতে পারে। মিরতিঙ্গা চা বাগান থেকে একজন কিছু উৎকৃষ্ট চা পাঠিয়েছে ক'দিন আগে। আঙুর মেয়েটি কেমন তাও ভাবল মনে মনে। সে কি করছে এখন? আবার গান গেয়ে উঠল, আমার এ ভালোবাসা কি যে তার নাম...।

কতক্ষণ কল খুলে শরীর জুড়িয়েছে...কতক্ষণ আকাশপাতাল ভেবেছে...। তারপর মনে পড়ল লুঙ্গি তোয়ালে কিছুই নেয় নি। আঙুরকে ডাকতে তো হবেই। গলা খুলে ডাকল, আঙুর, একটা লুঙ্গি আর গামছা দে। মনে আর কোনো আবিলতা বুঝি নেই। কোনো গ্লানি বা অভিযোগ নেই কারো প্রতি। শুধু আঙুরের ভাবনা মনের ভেতর খচখচ করছে। তাই তাড়াতাড়ি ঠিক করল দলমা ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসার কথা।

একটা চিঠি লিখবে দলমাকে। কতদিন দলমাকে চিঠি লেখার সুযোগ হয় না। দলমার প্রতি তীব্র আকর্ষণও অনুভব করল। দরজা খুলে বের হতেই দেখে আঙুরের চোখে-মুখে করুণা। টেবিলে খাবার পরিবেশন করছে সে। এক জোড়া ডিম পোচ। একসঙ্গে এক জোড়া ডিম দিল কেন? সে তো এক জোড়া ডিম কোনো দিন খায় না। রাঙা আলু সেদ্ধ থেকে ধোঁয়া উড়ছে। খোসা খুলে পরিপাটি করে চিনো মাটির বাটিতে রেখেছে। ঢাকা দিয়েছে কাচের প্লেট দিয়ে। খাবার ঢাকাও হল আবার দেখাও যায়। এত সুন্দর করে পরিবেশন করেছে যে জিয়াদের চোখে পড়ল। পাশে জেলির বয়াম। তলায় পড়ে আছে। বিস্কিটও আছে। আরেকটা টিনে কি আছে কে জানে! চা বানিয়ে পটে ঢেকে রেখেছে। চিরুণি হাতে দাঁড়াতেই আঙুরের সঙ্গে আয়নায় চোখাচোখি হল। সে বাথরুমে যাচ্ছে। এইমাত্র সে বলেছে ওদের পানির কষ্ট মিটবে না। একটা ডোবা থেকে পানা সরিয়ে ধোয়ার কাজ সারে। ওদের বস্তির মালিক বলে দিয়েছে পানি আসার কোনো সম্ভাবনা নেই।

খুশির চোটে একটা ডিম আঙুরের জন্যে রেখে দিল। রাঙা আলুর ভাগ রাখল। এক বার ভাবল দলমার জন্যে কেনা শাড়িটা আঙুরকে দেবে কিনা। তাহলে সে চান করতে পারবে। গায়ের ঘাম কত দিন পরিষ্কার করতে পারে না সে-ও! মেয়েটি ভালো। আবার ভাবল, নতুন শাড়ি দেওয়ায় যদি অন্য অর্থ করে। ঘরে ঢোকার সময় হাসির অর্থ কি শুধু পানি আসার জন্যে! নাকি আচ্ছন্নতা?

দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব শেষ করে সে উঠল। আলমারী খুলে শাড়িখানা নিল। নতুন কাপড়ের একরকম গন্ধ আছে, একরকম মাদকতা আছে, আছে আনন্দ। পায়ে পায়ে বাথরুমের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই বুকের দুরু দুরু শুনল। শরীরে শিহরণ খেলে গেল। আর...হাতের চাপে নতুন শাড়ি শব্দ করে উঠল।

[গল্পগ্রন্থ : আকাশে প্রেমের বাদল]

ভালোবাসার দুই কদম

নদীর ধারে কুঁড়ে ঘর। বৃষ্টি পড়ছে অঝোরে। সকাল কি দুপুর নাকি সন্ধে বোঝার উপায় নেই। মাঝে মাঝে হাওয়ার দাপটে কনকনে ঠাণ্ডা নামছে। নদীর ওপার থেকে কে একজন ডাক দিল, পার করে দাও মাঝি। ও মাঝি ভাই, পার করে দাও।

অঝোর বৃষ্টির শব্দ ভেদ করে সেই ডাক কুঁড়েঘরের লাজো ও রাজীর কানে আসে। রাজী ঘরের ভেতরে থেকে লাজোকে ডেকে বলে, কে ডাকে, এই বাদলায় কে আবার ঘাটে আটকা পড়ল।

বৃষ্টির জন্যে বুড়ো মাঝি নৌকো ছেড়ে ঘরে চলে গেছে। আহা রে বেচারী, বলে লাজোও দুঃখ করতে লাগল।

রাজী ততক্ষণে লাজোর সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরের দরোজার মুখে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনল ডাকটা চেনাজানা কিনা। কিন্তু ভারী বৃষ্টির জন্যে লোকটির গলা চিনতে পারল না। রাজীর স্বামী মতি গরু জোড়া নিয়ে গেছে কাঁধে-লাঙলে পরের জমিতে চাষ দিতে। মতি মাঝে মাঝে পরের জমিতে গরু নিয়ে মজুর খাটতে যায়। তাতে একবেলায় চল্লিশ টাকা পায়। তবে পুরোদিন খাটে না, গায়ে-গতরে সারাদিন খাটা খুব কঠিন। শরীরে রস-কষ কিছুই আর থাকে না।

আবার সেই করুণ ডাক শোনা যায়, মাঝি ভাই, পার করে দাও। রাজীর খুব কষ্ট হতে লাগল। বুড়ো মাঝি নৌকো ছেড়ে ঘরে বসে আছে, পাহাড়ী ঢল নেমেছে নদীতে, ঠাণ্ডা ঘোলা পানি খলখল করে ছুটছে। মাঝে মাঝে পাড় ভাঙার শব্দও শোনা যায়। কে তাকে পার করবে এখন? লাকড়ি ও খড়কুটো ভেসে যায় স্রোতের টানে। কূল-ভাঙা গাছপালা, পাখির বাসা এবং গাছ ব্যবসায়ীর চেরাই করা বড় বড় টুকরো গাছও ভেসে যায়। পথেঘাটে একটি লোকও দেখা যায় না। দু দিন ধরে সমানে বৃষ্টি ঝরছে। বিলে পানি জমে গেছে, নদীর পানিও কূল ছুঁই ছুঁই করছে।

রাজী ডাকল, ও লাজো, যা না, নৌকোটা নিয়ে ওকে তুলে আন না বোন।

নদীর স্রোতকে আমার বড় ভয়, ভাঙনকেও ভয়। এরকম বৃষ্টিতে

আমার হৃদপিণ্ডের পাড় ভাঙতে থাকে ঝপাং ঝপাং। মনে হয় ভাঙতে ভাঙতে একসময় সব শেষ হয়ে যাবে, আমি মরে যাব, নদীর কূলও ভাঙতে ভাঙতে দরিয়া হয়ে যাবে।

রাজী বলল, সেদিন কেন বুঝলি না, কেন তাহলে অমন করে সুরুজের বুকে ছুটে গেলি। তুই আসলে সুরুজকেই ভালোবাসিস। ভালোবাসার অমন কাঙাল আমার দেওরটা তোর জন্যে আজ ঘর ছাড়া। ও কত না তোকে ভালোবাসতো। ওর আবেগের কোনো দামই দিলি না তুই।

আমিও তো ওকে আজো ভালোবাসি। ওর জন্যে পাঁচ-পাঁচটি বছর অপেক্ষা করে আছি। ঘর থেকে বের হই না। বাপের বাড়ি থেকে নিতে আসলেও যাই না। অপেক্ষা করে আছি কবে সে আসবে! পাছে এসে আমাকে না পায় সেই ভয়ে কোথাও যেতে পারি না।—বলতে বলতে লাজো মুখ ফিরিয়ে নিল, মুখে আঁচল চাপা দিল। আর কি কি বলল আঁচল ও বৃষ্টির শব্দের জন্যে শোনা গেল না।

এমন সময় আবার ডাক শোনা গেল। রাজী ছেলেকে ডাক দিল, বাদল বাইরে কি করছিস? বৃষ্টিতে ভিজিস না। ভিজলে পিটুনি খাবি।

বাদল বারান্দা থেকে চিৎকার করে বলল, বসে বসে বৃষ্টির খেলা দেখছি। মা দেখে যাও, পানিতে উঠোন ভরে গেছে। পিঁপড়েগুলো দলামোচা হয়ে ভাসছে। বোধহয় বান হবে।

মা রাজী বলল, অপয়া কথা বলিস না। এমনিতে চলে না, বান হলে উপোস করে মরতে হবে।

লোকটা আবার ডাক দিল। ঠাণ্ডায় ওর গলাও কেঁপে গেল মনে হয়। এমন সময় মতি গরু জোড়া গোয়ালে বেঁধে উঠোনে এসে দাঁড়াল। ডাকাডাকি করে সোরগোল ফেলে দিল। মাথার বড় টোকা খুলে, লাঙল-জোয়াল দাওয়ায় রেখে, কাঁপতে কাঁপতে বলল, লুঙ্গিটা দে বউ। বাদল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকবক করতে লাগল। রাজী লুঙ্গি নিয়ে বেরিয়ে এসে বলল, নদীর ওপারে কে যেন আটকা পড়েছে, যাও না নৌকোটা নিয়ে, বেচারী অনেকক্ষণ ধরে ডাকছে। লাজো ঘরের ভেতর ছটফট করতে লাগল, ভাবল, যদি জামাল হয়! আবার ভাবল জামালের গলা তো সে চিনবে। একশো বছর পরে ফিরে এলেও ওর গলা সে চিনতে পারবে। সুরুজ হলেও চিনবে বৈকি! জামালকে সে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। ভালোবাসা সব সময় লাজোর বুকে টগবগ করে। সুরুজকে দেখলেও বুকের ভেতর তোলপাড় ওঠে, কিন্তু জামাল...হ্যাঁ, জামাল তার প্রথম ভালোবাসা।

মতি শীতে কাঁপতে কাঁপতে বিরক্ত হয়ে বলল, মরুক গে। বাপের বেটা হলে সাঁতরে আসতে পারে না? না যদি পারে বউয়ের আঁচল ধরে ঘরে বসে না থেকে বেরিয়েছে কেন?

এমন সময় লাজো মাথায় আঁচল দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। মুখে কিছু না বলে ছলছল তাকিয়ে রইল। নীরবে অনেক কথা বলে নিল। বাদল বলে উঠল, বাবা, আমিও যাব। চলো, আমিও যাই তোমার সঙ্গে। যদি জামাল কাকু হয়?

রাজী তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ঠাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর বাঁধালে তবেই তোর শান্তি। যা তো দেখি, ঠ্যাং ভেঙে দেব।

জামালের কথায় মতির বুকটা ধক করে উঠল। কতদিন ছোট ভাইটিকে দেখে না, কোলে-পিঠে করে তাকে মানুষ করেছে, কাজ শিখিয়েছে চাষবাসের, নিজের হাতে বিয়ে দিয়ে সংসারী করেছে, সে ভাই আজ বউয়ের জন্যে অভিমান করে ঘরছাড়া, বেচারী লাজোর ওপর সব দোষ দিতেও পারে না। নষ্টের মূল তো সুরুজ, বন্ধু হয়ে সে বন্ধুর বউয়ের দিকে হাত বাড়ায় কী করে! ভাবতে ভাবতে মতি বলল, বৈঠাটা দে তাহলে। দেখি কোন মেয়েছেলে কাঁদছে। জামাল যদি হয় তো দুটো থাপ্পর দিয়ে কান ধরে নিয়ে আসি। অন্য কেউ হলে দুটো কথা শুনিয়ে দেব। লাজো তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে মুখ-চোখ মুছতে লাগল।

টোকা মাথায় দিয়ে বৈঠা হাতে মতি তেমনি চলে গেল। নদীর কূল ঘেঁষে ঘর, আম কাঁঠাল ও মাদারের ঘন সারির জন্য নদী দেখা যায় না বলে দূরে মনে হয়, কলকল শব্দটা ঠিকই শোনা যায়। বছর দুয়েক হল এদিকে পাড় ভাঙছে না, তা না হলে কবেই ভিটেমাটি নদীতে ভেসে যেত। পাড়ে গিয়ে মতি গলা ফাটিয়ে ডাক দিল, কে ওখানে, এখনো কি বেঁচে আছ, নাকি মরেই গেলে। সঙ্গে সঙ্গে ওপার থেকে সাড়া দিল, পার করো মাঝি ভাই, ঠাণ্ডায় মরে···। কথা শেষ না হতেই বৃষ্টি ও হাওয়ার ঝাঁপটায় অসমাপ্ত কথাগুলো একদিকে ধুয়ে-মুছে সাফ করে নিয়ে গেল। দূরে কোথায় বাজ পড়ল, একটা কুকুর কেঁদে উঠল পাশের কোনো বাড়ি থেকে, ব্যাঙগুলো বাজ পড়ার শব্দে একটু থেমে আবার একঘেয়ে ডাকতে লাগল আর আগের মতো বৃষ্টির শব্দ একটানা তো চলছেই। নদীতে ঢেউ, স্রোতের কোলাকুলি, গাছপালার ডাল এ-ওর গায়ে পড়ে কাকুতি-মিনতি করছে। অথবা ঝগড়া করছে, একের কথা অন্যকে বোঝাতে চেষ্টা করছে, অথবা একজন বলে আমার কথা আগে, আরেকজন বলে আমার কথা আগে শোন—হাওয়া না উঠলে ওরা কখনো একে অন্যের

সঙ্গে মারামারি ঝাঁপাঝাঁপি করে না। নদীর বুকও অমন ওঠানামা করে না, কূলও বুক ফাটিয়ে নদীর বুকে আছড়ে পড়ে না। আজ কাল পরশু কতদিনের জমা ব্যথা ওরা বলাবলি করছে, কতদিনের রুদ্ধ আবেগ এলোপাতাড়ি বেরিয়ে আসছে···তখন মতি বৈঠা হাতে নৌকোয় উঠে বসল। শেকলটা খুলে নিল, স্রোতের টানে নৌকো ঘুরে যেতে চায়। পাহাড় থেকে নামা এক রোখা ঢল, চুল-ছেঁড়া তার স্রোত।

ঘাট থেকে কিছু দূর উজানে গিয়ে পাড়ি দিল মতি। স্রোতের টানে অনেকখানি নিচে গিয়ে ওপারে পেঁীছল। ভিজতে ভিজতে নৌকের কাছে এসে দাঁড়াল সুরুজ। তাকে দেখেই গর্জে উঠল মতি। কোথা থেকে এলি আবার, তোর মুখ দেখতে চাই না, তোর জন্যে আমার ভাই আজ ঘরছাড়া, আর তুই কিনা ঘাটে এসে ডাকাডাকি করছিস। দূর হয়ে যা, আমার চোখের সামনে থেকে চলে যা।

সুরুজ মিনতি করে বলল, আগে আমার কথা শোনো, আমি অনেক দূর থেকে আসছি, কত জায়গা ঘুরলাম, কত মানুষের কাছে গেলাম, শেষ পর্যন্ত ওর দেখা পেলাম। জামালের দেখা পেয়েছি। সে আমাকে ভুল বুঝে দূরে সরে রইল। আমি কত করে বোঝালাম। সে বুঝেও বুঝতে চায় না। সেও তোমার মতো দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল।

জামালকে পেয়েছে শুনে মতি একটু নরম হল। উৎসাহী হয়ে তার কথা আরো কিঁছু শুনতে চাইল। তার একমাত্র ভাই, মা মরার সময় ওর হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। বাবা মরার সময় তো দু জনেই ছোট ছিল। মা তাদের বড় করেছে। মাত্র দু বিঘে জমি আর ভিটেটুকু এখনো আছে। দিনরাত পরিশ্রম করে মতি ও জামাল নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়েছে, আর সুখের দেখা পেতে না পেতেই সামনে এসে দাঁড়াল সুরুজ। জামালের বন্ধু। এক প্রাণ দুই হৃদয়। সেই সুরুজ লাজোকে ভালোবাসলো কি করে? অথবা লাজোই সুরুজকে চেয়ে বসল?

সুরুজ মিনতি করে বলল, দোহাই তোমার ভাই, আমাকে পার করে দাও, না হয় এই ঠাণ্ডায় মরে যাব। তুমিও তো শীতে কাঁপছ।

মতি চুপচাপ শুনল শুধু। সত্যিই সেও ঠক ঠক কাঁপছে। গায়ে হুল ফুটছে। বেশিক্ষণ এই কাঁপুনি সহ্য করা সম্ভব হবে না। সে আর কিছু না বলে নৌকো কূলে ভিড়িয়ে দিল। সুরুজও এক লাফে উঠে লগি মেরে নৌকো উজানে নিয়ে চলল। অনেকখানি উজানে না গেলে হবে না। চোখের পলকে ছুটছে স্রোত। মতির বুকের ভেতরটা তবুও ধকধক করছে। সে আজ শত্রুকে নিজের হাতে বর্ম দিয়ে সাজিয়ে তুলছে,

নৌকোয় তুলে পার করতে যাচ্ছে। লাজোর সামনে নিয়ে যাবে তাকে? সব কথা শুনবে, ঘরে নিয়ে যাবে, লাজোর সামনে নিয়ে গিয়ে সব কথা শুনবে?

নদী পাড়ি দিল ওরা। ঘাটে গিয়ে নামল। দুজনেরই তখন এক চিন্তা, উষ্ণতা চাই, আগুন চাই। কোনো মতে নৌকা বেঁধে কোনো দিকে না তাকিয়ে কাঁপতে কাঁপতে এক সুত্র বাঁধা পড়ে গেল ওরা। মতি একবারও পিছন ফিরে তাঁকাল না। দু জনেই যখন দাওয়ায় উঠল তখন কারো মুখে কোনো কথা নেই। রাজী থমকে দাঁড়িয়ে ভাবল, চিৎকার করে তাড়িয়ে দেবে সুরুজকে। আবার এসেছে বন্ধু বেশে শত্রুটা!

কিন্তু ওদের দুজনের অবস্থা দেখে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি দুটো লুঙ্গি আর গামছা বের করে দিল। বাক্স খুলে সুরুজের জন্য একটা শার্ট ও খদ্দরের চাদর বের করল। দাওয়া ভিজিয়ে একটা একটা করে কাপড় নিঙড়ে বারান্দায় টাঙানো বাঁশের ওপর শুকোতে দিল। তারপর ওরা যখন ঘরে ঢুকল তখন ওদের চেহারা ভেজা ও ফ্যাকাশে, ঠাণ্ডা লেগে জ্বর উঠলে যেমন কাঁপে তেমনি কাঁপছে। মাটির মালসায় আগুন এনে দিল লাজো। বুকের ভেতরটা ধকধক করে একেবারে থেমে যাবে মনে হল। স্পর্শ নেই কথা নেই তবুও লাজোর শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। নেচে নেচে বয়ে চলল সেই বিদ্যুৎ, তার শুরুও নেই শেষও নেই। বাইরে বৃষ্টিও একটানা ঝমঝম করেছে দুদিন ধরে, তার শেষ কোথায় যেমন কেউ জানে না তেমনি লাজোর অবশ বুকের পাশ থেকে বেরিয়ে যাওয়া হাত দুটো আপনা-আপনি ওদের সামনে আগুনের মালসাটা রাখল। কিছুই বলল না সে। চোখ দুটো তুলে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। আর অমনি শরীরে তড়িৎ তরঙ্গটা ঢেউ তুলে, আরেক দফা ভেঙ পড়ে ধাক্কা দিল। মনে মনে লাজো বলল, কেন এলে, আবার কেন এলে? আজ পাঁচ বছর জামাল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। এখনো আশায় পথ চেয়ে আছি। প্রতিদিন পথ চেয়ে থাকি কবে এসে ডাকবে, লাজো···আমার লাজো। এত অভিমান, এত ঈর্ষা? নাকি ঘৃণা! কেন ঈর্ষা, কেন ঘৃণা, আমি তো তোমারই জামাল।

রান্নাঘরে গেল লাজো। পা দুটি অবশ, বুক ভারী, মাথা ঘুরছে। রাজী বলল, আমি জানি ওকে দেখলে তুই কাহিল হয়ে পড়িস, সেদিনও এমনি ঝড়-বাদলা ছিল। না, আরো বেশি। বানে চারদিক ডুবে গিয়েছিল। দু' ভাই গিয়েছিল নৌকোর খোঁজে।

লাজো ওর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলল, তুই তখন বিছানায় কাতরাচ্ছিস প্রসব বেদনায়, আমি একবার ঘর আরেকবার দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলাম। উঠোন ডুবে ঘরের দাওয়ায় উঠতে আর মাত্র এক হাত বাকি। ওরা দু' ভাই গেছে যেখানে নৌকো পায় নিয়ে আসতে। একজন দাইয়েরও দরকার। মানানা দাই আশ্রয় নিয়েছে স্কুলে, ওর নাতির সঙ্গে থাকে তো! নাতি আর নাতবউ আর তিন ছেলে, মানানা দাইয়ের বড় হাত যশ। ওর হাতের কাটা নাই পাঁচ দিনে শুকিয়ে সাফ, চার দিনে কালো গুটি হয়ে সাতদিন যেতেই ঝড়ে পড়ে যায়।

রাজী আবার নিজে নিজে বলল, এখন এসব কথা থাক, চায়ের পানি তুলেছি, দু' বাটি রঙ চা দিয়ে আয়, এক চুমুক খেলেই গা গরম হয়ে যাবে।

বাদল একবার রান্নাঘর আবার সুরুজের কাছে গিয়ে কথা শুনছে। জামাল কাকু কেমন আছে, বারবার তার গল্প শোনাতে বলছে। কবে আসবে, কেন এতদিন আসে না কত প্রশ্ন। মতি ছেলেকে একবার জোরে ধমক দিল। যা, দাওয়ায় বসে বসে বৃষ্টি দেখ গে। উঠোনে নৌকো ভাসিয়েছে কে? শাদা কাগজ দিয়ে নৌকো বানাতে হয়? কয়টা খাতা শেষ করেছিস? লাট সাহেবের মতো শাদা কাগজ দিয়ে নৌকো বানাচ্ছিস। সুরুজ ওকে কাছে টেনে নিল, আদর করে বলল, হ্যাঁ আসবে, অনেক টাকা-পয়সা নিয়ে তবেই আসবে। তোর কথা কত জিজ্ঞেস করেছে! বাদল বলল, কাকু ভালো না, কাকীকে দেখে না, কোনো খবর দেয় না। মতি আবার ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল, যা এখান থেকে যা বলছি, নইলে ঠ্যাং ভেঙে দেব।

সুরুজ বলল, আমি তো ওর কাছে সব স্বীকার করেছি। আমি জানি লাজো ওকে ভালোবাসে। আমাকে নয়। ভালোবাসা তো কত রকম হয়। মাও ছেলেকে ভালোবাসে, একটি মেয়েও একটি যুবককে ভালোবাসে, বোন ভালোবাসে ভাইকে। যুবকের ভালোবাসা একরকম, আবার সেই যুবক তার বোনকে ভালোবাসে, তার বড় ভায়ের বৌকে ভালোবাসে, মাসি-পিসিকে ভালোবাসে, বন্ধুর পত্নীকে ভালোবাসে। ভালোবাসার কত রকম ফের, কত রূপ! জামালের বৌকে আমি শ্রদ্ধা করি।

শ্রদ্ধার আরেক নাম ভালোবাসা, যাকে ভালোবাসে, তাকে শ্রদ্ধা করতে হয়।

না, লাজোর প্রতি অন্যায় দোষ দিও না।

লাজোকে দেখে এইমাত্র কেঁপে উঠেছিস তুই।

এসময় লাজো আরেকটা মালসা হাতে ঘরে ঢুকল। সুরুজের কাছাকাছি রেখে দিতেই সুরুজ টেনে নিল। হাতে হাত লেগে গেল বুঝি! লাজো চলে গেল। চুপচাপ চারদিক, শুধু ব্যাঙ ডাকছে। মতি বলল, মালসায় ওর ছোঁয়া আছে, হাত বুলিয়ে তুলে নে। মিথ্যাবাদী কোথাকার!

সুরুজ চিৎকার করে বলল, মতি ভাই, দোহাই তোমার।

মেয়েদের একজনের থাকতে দেওয়াই ভালো, নইলে ঘর আর বার দুই-ই নষ্ট হয়। তুই যদি ওকে কেড়ে নিয়ে যাসতো দেখবি সে আর তোর নয়...সে যে আসলে জামালের তখন বুঝতে পারবে লাজো, তুইও টের পাবি। এখন তোর মনে হচ্ছে লাজো তোর। সে মনে করছে পৃথিবীতে তুই ছাড়া পুরুষ মানুষ নেই—এরকমই মনে হয়।

মতি ভাই···

আমি সত্যি কথাই বলছি। তবে ওকে যদি ভুলে থাকতে দিস তো সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই ওকে বলে যা জামাল কবে আসবে। নিজের মুখে বলে যা জামাল ওকে কতখানি ভালোবাসে।

সুরুজ সমীহ ভরে বলল, মনকে নিয়ে আর কত পারি! জামালকে ফিরিয়ে আনতেই তো এই এক বছর ধরে ঘুরলাম। সেও তোমার মতো আমাকে দুষছে, আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমার কোনো কথাই বিশ্বাস করতে চায় না। আমার কোনো অনুরোধ সে রাখে নি।

রাজী লাজোকে চায়ের বাটি দুটি নিয়ে যেতে বলল। লাজো নিজেকে ভয় পায়, নিজের আবেগক ভয় পায়, ভাগ্যকে নিয়ে লড়তে সাহস পায় না। কেন এই ভয়? সামনে তো মতি আছে। কেন সে নিজেকে সহজ করে নিতে পারে না? সহজ হবার জন্যেই সে আগুনের মালসা নিয়ে গিয়েছিল। এইতো সুযোগ, নিজেকে সবকিছুর ওপরে তুলে সে বলে দিতে পারে, আমি জামালের বিবাহিতা স্ত্রী। রাজীর কথার উত্তরে বলল, ওর সামনে গেলে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়, নিজেকে সামলাতে পারি না।

রাজী ঠাট্টা করে বলল, লোকজনের সামনে আলিঙ্গন করবি নাকি! কি নির্লজ্জ রে বাবা! এমন মেয়ে বাপের জন্মেও দেখি নি।

দোহাই তোর, অমন করে বলিস না। তুই যা।

রাজী এবার গম্ভীর হয়ে বলল, সুরুজকে ভালোবাসার কিছুই নেই। তোর জন্যে জামাল কী না করেছে। বড় ভায়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, অথচ সে কোনোদিন মুখ তুলে কথা বলত না। পাড়ার লোকজনের বিরোধিতা সত্ত্বেও পাগল হয়ে ছুটে গেছে তোর কাছে। শেষ পর্যন্ত ভায়ের

মত আদায় করে তোকে ঘরে তুলেছে। বিয়েতে তোর ভাসুর সাধ্যমতো করেছে। জমি পর্যন্ত বন্ধক দিয়েছে। সে-জমি আবার ফিরিয়ে আনতে দু' ভাই কত হাড়ভাঙা খাটুনিই না খেটেছে। আর তুই কিনা মজে গেলি ওর বন্ধুকে দেখে?

লাজো একবার ভাবল কিছুই বলবে না। কি হবে পুরোনো কথা ভেবে, কি হবে বলে! এইতো মাত্র সেদিনের কথা। থৈ-থৈ করছে বানের জল। নৌকো নিয়ে দেখতে এল সুরুজ। দু' ভাই তখন নৌকো খুঁজতে গেছে পানি সাঁতারে। নৌকো বেঁধে সুরুজ যখন দাওয়ায় উঠল তখন তার সারা গা ভেজা। ভেজা কাপড়ের নিচে তার পেশীগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে নাচছে। লাজোকে দেখে প্রথমে জামালের কথা জিজ্ঞেস করেছিল। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে শুকনো গামছা এনে ওর হাতে দিতেই ছোঁয়া লেগে গেল আঙুলের সঙ্গে। বিদ্যুৎ শিহরণ সেই যে খেলে গেল তা আর থামল না। এখনো সেই ঢেউ চলছে সারা শরীরে। লাজো শুধু বলল, আজ বৃষ্টির দাপাদাপির সঙ্গে আরো বেশি উথাল-পাথাল করছে সেই স্মৃতি, জোর করে রুখে রাখতে পারি না, থামিয়ে দিতে চাইছি বলে বিদ্রোহ করছে মন।

রাজী বলল, কি বলছিস তুই? এতদূর?

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আমি তো আর বেশি কিছু চাই নি। জামালকে আমি ভালোবাসি, ওর জন্যে পাঁচ-পাঁচটি বছর অপেক্ষা করে আছি। চিরদিন থাকব।

রাজী হতাশ হয়ে বলল, কে জানে সুরুজের মাঝে কি আছে! আমি তো আলাদা কিছুই দেখি না।

তুই কি করে দেখবি? তোর চোখ তো মতি ভায়ের চোখে বাঁধা পড়ে আছে। ছেলে আছে। তুইও তো বাপের কাছে গোঁ ধরে বসেছিলি ওকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবি না বলে!

মেয়েদের একজনের হয়ে থাকাই ভালো। দু' নৌকোয় পা দিয়ে সংসার হয় না, দুই পুরুষের কাছে মন দিয়ে জীবন চালান যায় না।

বাইরে তেমনি বৃষ্টি হচ্ছে। বাদল দাওয়ায় বসে বসে বৃষ্টির গান ও ছড়া কাটছে। মতি ও সুরুজ চুপচাপ করে আছে। লাজো শুধু বলল, সেদিন ঢেউয়ের আঘাতে থেকে নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছি, সরিয়ে কূলের কাছে নিয়ে এসেছি, তোর কাছে ছুটে গেছি, কিন্তু পাল খাটানো নৌকো তো আর বাতাস থেকে সরিয়ে নেয়া যায় না, নিজের ইচ্ছে মতো চালাতে হলে কৌশল করতে হয়। পাল নামিয়ে নিলেও হাওয়ার দাপট থেকে রক্ষা পাওয়া মুশকিল।

লাজোর মন তখন ঐ পালের মতো হাওয়ায় বুক ফুলিয়ে তরতর ছুটে চলেছে; সেদিন থেকেই লাজোর ভয়। মনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাগে আনতে না পেরে জামালের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কাঁপতে কাঁপতে জ্বর এসে গেল তার। তখন জামাল জানতে চেয়ে বলেছিল, কি হয়েছে, কেউ কিছু বলেছে, পাড়া-পড়শি, রাজী ভাবী? লাজো সব খুলে বলল। হাতের স্পর্শে থেকে লুঙ্গি ও শার্ট দেওয়া, ওর ভেজা কাপড় শুকোতে দেওয়া, তারপর রাজীকে ধরাধরি করে নৌকোর গলুয়ের নিচে নেওয়া, সব। আবার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিতে বারবার ঘরে ঢোকা, তখন কী যে হয়ে গেল লাজোর। বাক্সে-কাপড় তুলতে গিয়ে সুরুজের সঙ্গে মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। মাথায় শিং গজাবে বলে আবার যখন টোকা খেতে গেল তখন লাজো আর পারল না, সুরুজের বুকে মাথা রেখে বসে পড়ল। সুরুজ হাত বুলিয়ে দিল ওর পিঠে। হাত তো নয় যেন সোনার কাঠি রুপোর কাঠি। একে একে জেগে উঠল প্রতিটি রোমকূপ, প্রতিটি কোষ। শরীরের বাঁধন থেকে তো অনুভূতি বেরিয়ে যেতে পারে না যতক্ষণ না তার নিবৃত্তি হয়। আস্তে আস্তে লাজোর বুক থেকে সুরুজের শরীরে সেই কাঁপুনি পার হচ্ছে, একটু একটু সুস্থ হচ্ছে সে।

বাটিতে চা ঢালতে ঢালতে রাজী বুঝল লাজোকে চা দিতে পাঠান যাবে না। তাছাড়া জামাল কেমন আছে, কী করছে জানা দরকার। এতদিন যখন বাড়িতে আসে নি আর কোনোদিন কি আসবে? আর এসেও যদি থাকে সুরুজ এসেছে বা লাজোর এসব কথা শুনলে আবার কি চলে যাবে না চিরদিনের মতো? অথচ লাজোকে রেখে দ্বিতীয় বিয়ে করবে না, তালাকও দেবে না। সে এটুকু বুঝল—লাজোর কপাল পুড়েছে, নিজেদের সুখও নষ্ট হয়ে গেছে। কী কুক্ষণেই না সেদিন সুরুজ নৌকো নিয়ে এল। একটু দেরিতে এলেই তো হত। জামাল নৌকো বেঁধে ঘরে ঢুকল। কেন যে ওর আসার শব্দ লাজো একটুও টের পেল না, বৃষ্টি ও বাজবিজুরী যে কেন অমন করে তখন ঝাঁপিয়ে নামল⋯হয়তো নিয়তির খেলায় এই যোগসাজস হয়েছে। নইলে সুরুজের সঙ্গে মাথা ঠোকাঠুকিই বা কেন হবে, কেনইবা ঠিক তখন জামাল এসে সব দেখতে পেল⋯।

রাজী বাটি দুটো নিয়ে গেল। ওরা দু জন তখন চুপচাপ বসে আছে, কারো মুখে কোনো কথা নেই। সেও কিছু বলার সাহস পেল না, দু'-একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে খাও বলে চলে এল।

লাজো আগের কথার খেই ধরে বলল, ও এসে দেখল, দেখেই চিৎকার করে উঠল, সুরুজকে কিছু না বলে আমার দিকে এগিয়ে এসে এক

গণ্ডুসে পান করার মতো দু' হাত ধরে যা বলল সেসব শোনার পরও কেন আমি বেঁচে আছি জানি না। তারপর একসময় নিজে নিজে থেমে আমাকে বলল, যা, এই মুহূর্তে আমার সামনে থেকে বেরিয়ে যা ওর নৌকোয় চড়ে। ততক্ষণে মতি ভাইও ঘরে ঢুকছে। তারপর দু ভাই মিলে তোকে সুরুজের নৌকো থেকে নিজেদের নৌকোয় তুলল। ওর নৌকো খালি করে দিয়ে আমাকে বলল, যা আমার চোখের সামনে থেকে যেখানে ইচ্ছে দু জনে চলে যা। মতি ভাই ওকে থামাল। তুইও বলিল, আমার কোনো দোষ নেই, সব দোষ সুরুজের।

রাজী সেই অতীতে ফিরে গিয়ে ভাবল, কেন তার অমন করে পৃথিবীর জোড়া প্রসব বেদনা শুরু হল, কেন লাজোকে চোখে চোখে রাখতে পারল না।

মাথা নিচু করে সুরুজ নৌকো নিয়ে চলে গেল। এক লহমায় কূলভাঙা মাটি নদীতে যেমন পড়ে যায়, তারপর যেমন কিছুক্ষণের জন্য শান্তি ও নীরবতা নেমে আসে তেমনি লাজোর বুক হাল্কা হয়ে উঠল। কিন্তু সেও ক্ষণিকের জন্যে, আবার কূলের মাটি তলে তলে ক্ষয় হতে থাকে এবং একটু পরেই আবার ঝপাৎ করে মাটির আরেকটা চাঙর ধসে পড়বে।

স্কুলের কামরায় সেদিন রাজীর কোলে এল বাদল। সুখের নিঃশ্বাস ফেলল রাজী। সেই দুর্যোগের ভেতর বাদল সবার মনের মধ্যে সুখের সেতু গড়ে তুলল। সারারাত দাই মানানা জেগে রইল, সবাই মিলে কত কথা, লাজো যেন হারানো সুখ খুঁজে পেল। আশপাশের লোকজন সারাক্ষণ খোঁজ নিচ্ছে, সাহায্য করতে ছুটে আসছে, মোট কথা বানে আশ্রয় নেওয়া লোকগুলোর মনে আনন্দের জোয়ার এনে দিয়েছে বাদল। রাজীও নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করে সুখে চোখ খুলছে ও বাঁধছে। আর এদিকে…।

হ্যাঁ, বাদল ও রাজীকে দেখে জামাল সেই খুশির সকালে কী একটা ছল করে যে বেরিয়ে গেল আর এল না। একবার মনে হয়েছে জামাল বুঝি বানের জলে ডুবে মরেছে বা কোনো দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। কিন্তু সেরকম কিছু যে হয় নি পরে বোঝা গেল। পুরুষ মানুষের রাগ, শুধু তাই নয় প্রতিশোধরও আগুন জ্বলছে। যাওয়ার সময় একটি কথাও বলল না লাজোর সঙ্গে। রাজী বলে, পুরুষ মানুষের জেদ থাকা ভালো, নইলে পৃথিবীতে এত বড় বড় কাজ হত না।

উত্তরে লাজো বলল, আর মেয়েরা বুঝি ঐ জেদের পায়ের নিচে পিষে মরার জন্যে জন্মেছে?

তোরই বা বড়াই করার মতো কি আছে? তুই নিজেই তো নিজের সর্বনাশটা করলি। কেন সুরজের অমন কি আছে? কী পেয়েছিস একবার বল।

কি করব। মনটা সেদিন অমন ভিজে ফুলে-ফেঁপে উঠল কেন? কত যত্ন করে মনটাকে বেঁধে রেখেছিলাম, কত সাবধান ছিলাম, কত সতর্কতা! কিন্তু জামাল তো জানত আমি ওরই, একা ওর।

নিজের চোখে দেখাকে অবিশ্বাস করবে কি করে? তাছাড়া তার সবচেয়ে আপন বন্ধুকে কিনা তুই ভালোবাসতে গেলি। প্রেমে পুরুষরা অবিশ্বাসকে সহ্য করতে পারে না।

লাজো ফুঁপিয়ে উঠে বলল, কিন্তু সবাই শুধু বাইরেরটাই দেখল। আমার মনটা একটু কোমল, আমার মন যদি এভাবে তৈরি না হত তাহলে আমি কি অমন করতাম কখনো? আমার চোখমুখ নাক আলাদাভাবে মোটেই সুন্দর নয়। মনটাও আবেগে ভরা, জন্মও তুলা রাশিতে বোধহয়। আমার মুখে যদি বসন্তের দাগ থাকত, যদি খেঁদিপেঁচি হতাম, খোঁড়া হতাম কিংবা এক চোখ কানা হত তাহলে কেউ ভালোবাসতে আসত না, আমিও বেঁচে যেতাম। এ অবস্থা হত না।

কিসের সঙ্গে কী কথা আনছিস। যতসব আজেবাজে কথা। খোঁড়া হবি কেন?

লাজো কিছুটা সংশয় আর কিছু দ্বিধা নিয়ে বলল, কে জানে সুরুজের ভালোবাসায় কি আছে? ও কিছুই জোর করে চায় না। প্রায় নরীবে আর অভিমান ভরে সরে সরে থাকে। একটা কিছু বললেই অমনি মুখ গোমরা করে থাকে, নীরবে মেনে নিয়ে চুপ করে যায়।

সুরুজের সঙ্গে তুই একা দেখা করিস নি?

না, কখখনো না। আমি ভয় পাই আমাকে। ওকে দেখলে দূর থেকে সরে যাই, পাশ দিয়ে নীরবে চলে যাই, সে যখন গরু নিয়ে যায় আমি তাড়াতাড়ি অন্যপথে চলে যাই, ওর চোখের সামনে পড়লেই আমার শরীর কেমন করতে থাকে, মুখ বন্ধ হয়ে যায়, বুকে ঢোল বাজতে থাকে।

ওকে ভয় পাস?

ওকে নয়, আমার নিজেকে। আমার আবেগকে, আমার নিয়তিকে। জামালকে। ওকে দেখলেই জামাল আমার সামনে এসে চোখ তুলে দাঁড়ায়, শাসায়।

তুই একটা আস্ত পাগলী। তুই যদি জামালকে ভালোবাসিস তো আর সব ছেড়েছুঁড়ে দিতে পারিস না কেন?

চা খেয়ে মতি বলল, এবার যা তুই। আর কোনোদিন এ-বাড়ি আর এ-মুখে হবি না। তারপর ছাতাটা সুরুজের হাতে তুলে দিয়ে বলল, কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিস, তুই আসবি না, খবরদার।

সুরুজ আবার প্রতিবাদ করল, আবার বলল যে সে সব কথা জামালকে জানিয়েছে, ফিরে আসতে বলেছে, ফিরে এলে সব ঠিক হয়ে যাবে এবং জামাল এলে সে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে বলেও জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মতির এক কথা, সুরুজের জন্যই ওদের জীবন বরবাদ হয়ে গেল।

সুরুজ বলল, আমি তো ইচ্ছে করে কিছু করি নি, জোর করে কারো মনের ওপর হাত দেই নি। আমি···

মতি বলল, আর সাফাই গাইতে হবে না, নেহাৎ চিনতে পারি নি, নইলে ওপার থেকে আনতেও যেতাম না। মরাই তোর উচিত ছিল।

সুরুজ বলতে চাইল, আমি তো···

আর একটি কথাও নয়, এখখুনি বেরিয়ে যা, এই মুহূর্তে।

লাজো তখন নদীতে চান করতে গেছে। ঝমঝম বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ভাবল, একবার যদি জানতে পারতাম জামাল কেমন আছে, আমাকে ছাড়া কী সুখে আছে, কি করছে সে? ক্ষমা করে দিয়ে কেন ফিরে আসে না? ভাবতে ভাবতে উজ্জ্বল অতীত দেখতে পায়, একবার এরকম বৃষ্টিতে দু' জনে নদীতে নেমেছিল, জামাল ডুব দিয়ে ওর পা ধরে টেনে গভীর জলে নিয়ে গিয়েছিল, পা থেকে সারা শরীর ধরে এদিক-ওদিক করে আবার বুক-জলে টেনে এনে কাঁধে তুলে নিয়েছিল। জলের একটা আলাদা রহস্য আছে, ডুব দিয়ে একজন আরেকজনকে আবছা দেখতে পায়, দু' দিক থেকে দু' জনে আঙুল ছুঁয়ে দেখতে পারে—স্বপ্নের মতো মনে হয় তখন সবকিছু। ডুব মেরে একজন আরেকজনকে ডাকলে ঝিমঝিম একটা শব্দ পাওয়া যায়, নিঃশব্দে বসে থাকলে বৃষ্টির ধাতব আওয়াজ শোনা যায়। আর আজ সুরুজ এল অথচ জামালের কথা জিজ্ঞেস করার উপায় নেই। কোনো মতে একা হয়ে যদি সুরুজের কাছ থেকে জেনে নিতে পারত? উপায় নেই। জামালের ঠিকানা, শরীর কেমন আছে, আগের মতো লাজো লাজো ভাবে কিনা? কতদিন দেখা হয় না, বিরহের পাঁচ বছর কী সহজ কথা, মেয়েটাও যদি বেঁচে থাকত হয়তো তার টানে জামাল ফিরে আসত। পুরুষ মানুষ দেহের আকর্ষণে ব্যাকুল হয়ে সাড়া দেয়, সন্তানের মায়ায় ঘরে ফিরে আস। বিয়ের প্রথম বছরটা কী উদ্দাম কেটে গেছে। ঘর-বাড়ি মাতিয়ে রাখত সে, বাজার থেকে সামান্য একটা কিছু হলেও নিয়ে আসত। একটা লেবেনচুষ, এক গজ ফিতে, একটা ছোট্ট ক্লিপ বা আলতা। আলতা পরাতে সে খুব ভালোবাসতো। কতবার নিজের হাতে আলতা পরিয়ে দিয়েছে। পুরুষ মানুষ মেয়েদের পায়ে হাত দিয়ে আলতা পরিয়ে দিলে কার না লজ্জা করে? সঙ্গে সঙ্গে গর্বে বুকও ভরে যেত। তারপর লাজো জামালের পা কপালে ঠেকাত। স্বামীর পা ধরতে লজ্জা কিসের। মাঝে মাঝে লাজো হাঁফিয়ে উঠত, তবুও চাইত, স্বামীর সোহাগ আর দৌরাত্মি সমান কথা। একবার যদি জামালকে পায় তাহলে জিজ্ঞেস করবে, ভুলেই যদি যাবে তো কেন এত উজাড় করে ভালোবেসেছিলে। মুহূর্তের ভুলটুকুই কী সব, সেদিন যা ঘটেছিল সেটাই কী জীবনের সবকিছু!

ভাবতে ভাবতে নদী থেকে উঠে এল। ভিজতে ভিজতে নদীর কূল থেকে ঘাটের পাশের কদম গাছের নিচে ছাতা মাথায় কে দাঁড়িয়ে আছে অনুমান করতে চেষ্টা করল। অবিকল জামাল, জামালের লুঙ্গি শার্ট গায়ে। মুহূর্তের জন্যে লাজো ভুল গেল যে ঐ জামা ঐ লুঙ্গি রাজী বের করে দিয়েছিল সুরুজকে। সেই সুরুজ দাঁড়িয়ে আছে। ছুটে গেল লাজো, তারপর ছাতার নিচে মুখ বাড়িয়ে যখন দেখল সুরুজকে তখন সে হু হু কেঁদে দিল। সুরুজও ততক্ষণে ওকে ধরে বোঝাতে লাগল, কেঁদো না, আমি অনেক খুঁজে ওর দেখা পেয়েছি। সব কথা খুলে বলেছি। তোমার কোনো দোষ নেই, কোনো অপরাধ হয় নি তোমার। আসলে রাজী ভাবীর কথা ভেবেই তো তুমি সেদিন ভেঙে পড়েছিল, তোমাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে হঠাৎ কি যে হয়ে গেল; কেন জিনিসপত্র গোছগাছ করতে তোমার মাথার সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল—সবই বুঝি দৈব! নিয়তি এভাবে আমাদের বঞ্চিত করেছিল, সুখ থেকে আমাদের এক জায়গায় নিয়ে দাঁড় করিয়েছিল। আমাদের তো কোনো দোষ ছিল না, বন্ধুর প্রতি আমার তো কোনো হিংসে নেই, ঈর্ষাও নয়।

লাজো ভাবল, কেন সে এভাবে পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সেদিনের

মতো আজও কেন বৃষ্টি ও আঁধারে চাপা পড়ে আছে সবকিছু। নদীর কূল ছাপিয়ে উঠছে জল। বান। বানের জল উঠে আসতে আর বেশি দেরিও নেই বোধ হয়। ঐ বুঝি সে নৌকো নিয়ে এল, কে যেন নদীতে গান গাইছে,

ভালোবেসে সুখ হারালাম আমি
আমি ইচ্ছে করেই অতল জলে নামি...

গান শুনে শুরুজ ভাবল, কে না কে যাচ্ছে! জামাল তো আর আসবে না। দু দিন আগে সে সাতকানিয়া থেকেও পালিয়েছে। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে বলেই আবার পালাল। আমাকে অবহেলা ও ঘৃণায় পথের ঘাঁস বানিয়ে ছাড়ল। হায়, যে মানুষ এভাবে পালিয়ে বেড়ায় তাকে কি ধরে আনা যায়? ফিরিয়ে এনেও কি লাভ? সে তো থাকবে না।

লাজো বলল, কি বলেছে সে? কোনোদিন আসবে না বলেছে? কিন্তু তাকে আসতেই হবে। আমার ভালোবাসার কাছে ফিরে আসতে হবে।

না, সে আর আসবে না। তুমি ওর কথা ভুলে যাও।

অমন করে বলো না। আমাকে আর অমন করে ছুঁয়ো না। সেদিনের স্পর্শে এখনো মুছে যায় নি, ঢেউ তুলছে এখনো।

সুরুজ বলল, কেন ছায়ার পেছনে ঝুড়ি নিয়ে ছুটবে? পাঁচ-পাঁচটি বছর কেটে গেল, আমার সবকিছু স্বীকার করার পরও যখন সে ক্ষমা করল না আর কেন অপেক্ষা করবে? আমিও কেন সত্যকে তাড়িয়ে বেড়াব?

আমি ওকে ভয় পাই, আমি নিজের মুখে কিছু কথা বলতে চাই।

সুরুজ অস্থির হয়ে বলল, কিসের ভয়, কি কথা বলবে?

লাজো সজাগ হয়ে বলল, ঐ শোনো, আবার গান গাইছে? লোকটা নৌকো নিয়ে কূলে ভিড়ছে। আমাদের ঘাটে, ওই বুঝি আসছে!

কখখনো না। সে আসবে না, কোনোদিন আর আসবে না।

আসবে, তাকে আসতেই হবে। জবাব দিয়ে যেতে হবে।

লাজোর মনের ভুল সব সময়ই হয়। ভাবনায় এলোমোলো আর বড্ড কল্পনাপ্রবণ। সে বলতে লাগল, হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি সে নৌকো থেকে নামছে, উঠে আসছে কূল বেয়ে রাস্তায়, আর একটু এলেই বাড়ির ঘাটা তারপর পুকুর পাড়। কল্পনার সে ছবি আঁকতে লাগল। সুন্দর জীবনের আলপনা, সোনালি ভোরের স্বপ্ন এঁকে দেখতে পায় জামাল আসছে। ওর বুকে বিদ্যুৎ খেলে যায়, তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছোটে, ভেঙে পড়ে আর গড়ে ওঠে। সেই ঢেউ উদ্দাম, অনন্ত সেই প্রবাহ—শেষ নেই। ভাবতে ভাবতে সে এগিয়ে যায় সুরুজের দিকে।

সুরুজ বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে, সব ভয়ের অবসান হয়ে।

লাজো সুরুজের হাতে মাথা ঘষতে ঘষতে শুনতে পায় নিজের বুকে ঢোল বাজছে, নৌকোর বাইচ হচ্ছে, দাঁড় টানছে কেউ জোরে জোরে। মনে মনে বলে, তোমার হাতে কি এমন কোনো দাওয়াই নেই যে এক নিমেশে সব ঠাণ্ডা করে দিতে পারে! কেন পারো না বুকের ঝড় শান্ত করতে, কেন পারো না হৃদপিণ্ডের দাপাদাপি থামাতে?

সুরুজও নিজের মনে বলে চলল, আজ আমি এসেছি, ওর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছি, সে আর ফিরবে না। দ্যাখো, সেদিনের মতো ঝড় উঠেছে! বাজ পড়ল শুনলে?

লাজো আরো ভয় পেল। এক মুহূর্তে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বুকে। সুরুজ বলল, এই ঝড় একদিন আমাদের আলাদা করেছে আজ আবার এক করে দিল।

লাজো আবার ভাবল, ঐ বুঝি জামাল এল, ঐ তার আসার শব্দ, পায়ের শব্দ, গলা খাঁকারির আওয়াজ। বুকের ওপর থেকে সে মাথা আলগা করল, ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াল। সে ঠিক শুনতে পেল জামাল এসেছে। তারপর বলল, ঐ দ্যাখো, ঐ তো এসেছে। তোমার পিছনে।

জামাল বলল, হ্যাঁ আমি জামাল। আমাকে দেখে সতর্ক হওয়ার কি দরকার?

লাজো যেন অনেক দূর থেকে বলল, জামাল!

জামাল তেমনি নিস্পৃহ গলায় বলল, তুমি ওর বুকে মাথা রেখে বলতে পারো, আমি আর কিছুই মনে করব না। সেদিন যা দেখেছি তার বেশি আর কি দেখব? আমি জানতাম সুরুজ তোমার কাছে ছুটে আসবে।

জামাল, তুমি এত নিষ্ঠুর হয়ো না। আমাকে ভুল বুঝো না।

ওর পাশে গিয়ে একটু দাঁড়াও। দেখি।

লাজো কাঁদতে কাঁদতে বলল, না না না।

কেন নয়, ওর গায়ে তো আমার শার্ট, লুঙ্গি।

জামাল দেখল, তার স্মৃতি নেই, বাঁচার আগ্রহ নেই, লাজোর

প্রতি অবিশ্বাসও নেই। নাকি হিংসা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা এবং ভালোবাসাও নেই? দিন-মজুরের কাজ করতে করতে তার মনটাও যেন ছোট হয়ে গেছে। একবার ভাবল, যেসব অভিযোগ জমা হয়েছে সব একে একে বলে দেয়। চিৎকার করে বলে, কেন দেখলাম, কেন তোমাদের দু জনকে এক সঙ্গে দেখতে পেলাম। আবার সুরুজের দিকে তাকিয়ে বলতে চাইল, তুই বন্ধু হয়েও কেন আমার এত বড় সর্বনাশ করলি, ঘরছাড়া করলি, সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা করলি, আমার শান্তি হরণ করে নিলি?

লাজো কিছুই করতে না পেরে ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, তোমার ভালোবাসার দোহাই, আমাদের এই নদীর দোহাই, এই কদম গাছটির দিব্যি···আমাদের সুন্দর দিনগুলো আর ভাবী বংশধরের শপথ···তুমি চুপ করো, আমাকে ক্ষমা করো।

জামাল বলতে চাইল, কেন চুপ করব, কার জন্যে, কিসের মোহে? বলতে বলতে সে হাঁটতে লাগল। লাজোও তার নাগাল পেতে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল। আরো কাছে গিয়ে হাত ধরল, শরীরের সঙ্গে মিশে গেল। জামাল নিজেকে মুক্ত করতে করতে বলল, আমাকে যেতে দাও। লাজো কাঁপতে কাঁপতে বলল, এই নদী সাক্ষী, গাছপালা সাক্ষী, কতবার দাওয়ায় আনমনা বসে থেকেছি, পথের ধারে ছুটে গেছি···।

জামাল বলল, আমি যাব। যেখানে আমার স্বপ্নরা থাকে, স্মৃতিরা খেলা করে, যেখানে গেলে ফিরে আসতে হবে না···।

লাজো এবার আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল, তোমার ঘরেই আছে ওরা, চলো সেখানে।

জামাল না না বলতে বলতে চলে গেল।

সুরুজ মনে মনে বলল, চলে গেল, আবার চলে গেল।

লাজো তখন সুরুজকে গালাগালি করে বলল, তুমি, তুমি কেন দাঁড়িয়ে আছে, যাও···চলে যাও। এক্ষুনি চলে যাও।

এসময় রাজী এল, মতি এল। ছাতা মাথায় বাদলও এল।

লাজো চিৎকার করে বলতে লাগল, ওকে থামাও, ও চলে গেল! ও চলে গেল।

রাজী বলল, কে?

হ্যাঁ, এসেছিল। আবার চলে গেল।

ওরা কেউ কথা বলতে পারল না। মতি ও রাজী ছুটে এল তবুও দেখা পেল না। বাদল অনেকক্ষণ আগে থেকে আসতে চাইছিল, সেও দেরি করে ফেলল। জামাল একটুও দেরি না করে ঘাটে গিয়ে নৌকোয় উঠল, মতিও কথা না বলে ভিজতে ভিজতে ছুটল। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল, বাজ পড়ল, কাক ডেকে উঠল। ঝাঁপটা মেরে হাওয়া এল, আবার আকাশের এ-মাথা থেকে ও-মাথা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে বিদ্যুৎ চমকে গেল।

রাজী তখন বলল, চল, ঘরে চল বোন। আমরা ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করি।

[গল্পগ্রন্থ : আকাশে প্রেমের বাদল]

লঘু নিঃশ্বাস

ভোর হতেই পুঁটলিটা গলির মুখে আবর্জনার স্তূপে পড়ে থাকতে দেখা গেল। প্রতিদিনের মতো ভোরের কাকগুলো রাস্তায় নামল খাবার খুঁজতে। মেথর-ঝাড়ুদাররা ঝাড়ু ঠেলা বালতি নিয়ে কাজে নেমেছে. রোজকার মতো শ্রাবণের ভোর থমথমে মুখ নিয়ে আকাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। গলির ওপারে বড় রাস্তার পাশে মাথা উঁচু করে বঙ্কিমচন্দ্রের পাগড়ির মতো মস্ত বড় জলের ট্যাঙ্ক চারদিক তাকিয়ে আছে। পত্রিকা নিয়ে হকার তখনো পথে নামে নি। কে একজন প্রাতঃভ্রমণ-বিলাসী ছড়ি হাতে ক্যাম্বিশের জুতো পায়ে হনহন করে গলি থেকে বেরিয়ে গেল। মতিঝিলের বড়বড় ইমারতগুলো দিগ্বিজয়ী বীরের মতো বুক টানটান করে মাথা উঁচিয়ে লুপ্তপ্রায় ঝিল ও আশপাশের বস্তির ওপর নজর দিয়েছে। তবে মনে রাখবেন পৃথিবীর অনেক কিছুই বা এসব দৃশ্যাবলী সব সময় সুন্দর নয়, শহরের সব দৃশ্যও আবার কৃত্রিম বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

পুঁটলিটা? হ্যাঁ, কাগজের ঐ পুঁটলিটা মতিঝিলের বস্তির কাগজ-কুড়িয়ে এক ছেলে আবর্জনার ওপর প্রথম দেখতে পায়। দেখেই মোড়কটি কুড়িয়ে নেয়, তারপর রাজপথ ধরে হাঁটতে থাকে। বেশ সুন্দর ও যত্ন করে বাঁধা। ওপরটা পত্রিকা দিয়ে মোড়া। পত্রিকা খুলে সে বস্তার মধ্যে পুরে নেয়। আবার কাগজ এবং তার ওপর প্লাস্টিকের রশি দিয়ে বাঁধা। বেঁধেছে সুন্দর করে, প্রতিটি পেঁচ আর গিঁটের মধ্যে যত্ন লুকিয়ে আছে। পত্রিকার ওপর বিরাট একটা পাখির ছবির আধখানা দেখা যাচ্ছে, ওদিকে মিল্কভিটার গরুর চিন্তিত মুখ। ছেলেটি সুতোর গিঁট খুলতে খুলতে হাঁটছে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে, খোলা হলে হাঁটতে থাকে, আবার দাঁড়ায়, আবার হাঁটে।

রাস্তা প্রায় ফাঁকা, কচিৎ দু-একটা রিক্সা রাস্তা জুড়ে ছুটে যাচ্ছে স্টেশনের দিকে, নিশ্চয়ই সুন্দরবন মেল বা উল্কা ধরবে। তাছাড়া এত ভোরে রিক্সায় চড়ে কে কোথায় যাবে। রাস্তার কলতলায় ভিখিরি মেয়ে স্নান করছে। ফুটপাতের ওপর তার বোঁচকা-পুঁটলি। তার এক বছরের মেয়েটি ফুটপাতে বসে বসে মায়ের পবিত্র হওয়া দেখছে। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আরো দুটি ছোট মেয়ে। দক্ষিণ আকাশে জলভরা মেঘ, তার ছায়ায় শহরের ওপাশটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে, সেদিকে বড় রাস্তায় কয়েকটি কৃষ্ণচূড়া দেখা যাচ্ছে, কদম গাছও একটি হবে। ওদিকটা ভি. আই. টি. এ্যাভেন্যু, পাশে পল্টনের ময়দান, যেখানে একদিন বড় বড় নেতারা ঐতিহাসিক জনসভা করে জনপ্রিয় হয়েছেন এবং একদিন যাঁদের পায়ের তলায় ফ্যাসিস্ট পাকিস্তানি বাহিনী মাথা নুয়ে দিয়েছিল। হ্যাঁ জনগণ, জনগণই চূড়ান্ত ক্ষমতার অনন্ত উৎস। আর হা-ঘরে নেতারা বুঝতে না পেরে নিজেদের ইচ্ছে মতো জনগণকে ব্যবহার করতে চায়—তার উচিত শিক্ষাও জনগণ দিয়েছে ঐ ময়দানে। ছেলেটি সেই পল্টন ময়দানের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ ডানদিকে একটা গলির মুখ পেয়ে ঢুকে পড়ল। ইতিমধ্যে সে হাতের পোঁটলার সুতোর বাঁধন খুলছে, পত্রিকাটি বস্তায় পুরল। মোড়কটি তখন ফ্যাকাসে ও খসখসে রঙের মোটা কাগজে মোড়া, তার ওপর টেপ দিয়ে সুন্দর করে আঁটিকান। ছেলেটি বাড়ির রকে কেন বসে পড়ল বোঝা গেল না।

এবার সে মায়ামমতা না দেখিয়ে মোটা কাগজটি ছিঁড়ে ফেলল। তারপর বেরিয়ে এল ওষুধ কোম্পানির চৌকো ছোট্ট বাক্স। ছেলেটি এবার বিরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দেখে তো আর ফেলা যায় না। সে ভাবতে লাগল বোধহয়--ভেতরে কি থাকতে পারে? বেশ ভারিই মনে হচ্ছে। খোলার আগে সে ঝুনো নারকেল নাড়ার মতো বাক্সটা ঝাঁকুনি দিয়ে নেড়ে দেখল, কেমন যেন থলথল করে এপাশ-ওপাশ হল। ধুত্তুরি, কুত্তির বাচ্চা-টাচ্চা নয় তো? তবুও কেন যেন মনটা আবার খুশিতে জ্বলজ্বল হয়ে উঠল, কী জানি কী জিনিস আছে ওতে। ভাবতে ভাবতে আরো মনোযোগী হয়ে উঠল। মনে মনে গাল দিল। আবার ভাবল, ভেতরে যদি তেমন কিছু থাকে। খুশি মনে ওপাশের দোতলা বাড়ির দিকে একবার তাকাল।

ছোট্ট গলি। দু পাশে বাড়ি। বাড়িগুলো উঠেছে খুব বেশিদিন হয় নি। কোথাও নতুন বাড়ি উঠছে। কোনোটা এক তলা, কোনোটা তিন তলা উঠে থেমে গেছে। ছাদের ওপর লোহা ও থাম দেখা যায়, তার পাশে বুকের পাঁজরের মতো টি ভি-র এনটেনা তো রয়েছে। প্রায় প্রতিটি বাড়ির চৌহদ্দিতে আছে নারকেল পেয়ারা বাগানবিলাস, বেটপ হয়ে ঝুলে আছে ইলেকট্রিকের তারগুলো, আছে নতুন ওঠা বাড়ির অগ্নিকোণে একটা লম্বা বাঁশের মাথায় মাটি কাটার ভাঙা ঝুড়ি ও ঝাড়ু। সবকিছুই রাতের বৃষ্টিতে ভিজে ঝলমল আচ্ছন্নতায় দাঁড়িয়ে

আছে আর নেমে আসা মেঘভারনত থমথমে আকাশ। গলির মোড়ে বাঁ দিকে একটা বড় গাছে ঝাঁক বেঁধে কদম ফুটে আছে। ছেলেটি যদি পুঁটলিটা নিয়ে মগ্ন না হত তাহলে এতক্ষণ সে নির্ঘাত কদম ফুল তুলত, তারপর কিছুক্ষণ 'ফুল চাই, কদম ফুল', ডেকে ডেকে খদ্দের খুঁজত। বস্তির ছেলে সে, এই দশ কি বারো বছর বয়স, অফিসে ভাত নেওয়ার ঠিকে কাজ করে, কাগজ কুড়োয়, কখনো ফুল বেচে আর সিনেমাও দেখে। শহরের এদিকটা সম্পর্কে তার আছে নখদর্পণ জ্ঞান। কাগজের বাক্সের ভেতর কি থাকতে পারে? রাস্তাঘাটে মানুষ নামতে থাকে। লোকজন দেখে ফেলবে তা সে বেমালুম ভুলে যায়। ভেতরে যদি যাচ্ছেতাই আজেবাজে জিনিস থাকে? বোমা-টোমা কিছু? আজকাল আবার যখন তখন বোমাবাজি হচ্ছে শহরে।

অথবা? …ওপাশে যে দোতলা বাড়িটা, বাড়ির জানালার পর্দাটা কেন একটু কেঁপে উঠল? নারকেল গাছের চিকচিক পাতার ফাঁক দিয়ে এক তরুণী চোখ তুলে তাকিয়েছে, তাকিয়ে-তাকিয়ে তাকে দেখছে, তার বুকের ভেতর হাতুড়ির শব্দ হচ্ছে, চিনচিন ব্যথা, বিষণ্ণ ভার--কিছুই দেখছে না ছেলেটি। আস্তে আস্তে লোক চলাচল বাড়ছে, রোজকার মতো দুধওয়ালা পানি মেশানো দুধ নিয়ে বাড়ি বাড়ি ছুটছে, নিত্যদিনের মতো মরণচাঁদের মিষ্টির দোকানে দই-এর ভার নিয়ে ভুঁড়িওয়ালা লোকটি হেলেদুলে চলেছে। ছেলেটির দিকে আড় চোখে একবার তাকাল সে। বেওয়ারিশ কুকুর ও কাক নেমেছে আবর্জনার স্তূপে, লাইটপোস্ট থেকে এইমাত্র বাতি নিভেছে, পেয়ারা গাছে যে-কটি গুটি পোকা বাসা করেছে তারা একটু মৌতাতে মেতেছে। গলিটা এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে আড়-মোড়া ভাঙল। যেভাবে সে প্রতিদিন ঘুম থেকে জেগে চারদিক চোখ তুলে তাকায়, যেভাবে সকালের কাজে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়, যেভাবে তার সাজবদল হয়—গলিটা সব কিছুই একে একে সেরে নিল। ছেলেটিও বাজিখেলায় মেতেছে। খেলাটা কিছুই নয়। হয়তো একটা বাচ্চা ছেলে খেলতে খেলতে এমন অকম্মটি করেছে, অথবা বেড়ালের মরা বাচ্চাকে কোনো ছেলে এভাবে মমি করে ফেলে দিয়েছে। যাক গে কাগজগুলো তো পাওয়া গেল, তাও কম লাভ?

তা কি করে হয়? তবে এবার সত্যি কথাটি বলা যাক। শহরের ঘুম ভাঙার পর মেথর ও বাসার কাজের মেয়েদের মতো গৃহশিক্ষকরাও বেরিয়ে পড়ে। আমিও ছাত্রী পড়াতে বেরিয়ে এই ঘটনার সঙ্গে ক্ষণিকের জন্য জড়িয়ে পড়লাম—সেটা বর্ণনা করা যায় কিনা দেখা যাক। সবাই গল্পের শেষটা আগে শুনতে চায়, অথবা আমরা সবাই শকুনের মতো, মানুষের দুর্দশা দেখলে আনন্দ পাই। আচ্ছা…আচ্ছা মানলাম, সবাই নয়। কেউ কেউ তো বটেই!

দেখা যাক সাত সকালে ছেলেটি কী করছে। ঘুমের আলসেমিটা কাটানর জন্য ছেলেটির দিকে মন দিলাম। ছেলেটি কোনো দিকে তাকাচ্ছে না, ওদিক থেকে একজন আসছে, ঝি-মেয়েটি দোতলা বাসায় ঢুকল। আমি ছেলেটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম আর তক্ষুণি ছেলেটি রঙিন পলিথিনের মোড়কের শেষ গিঁটটি খুলে সুতোখানা কোলের পাশে রাখল। হাঁ করা মুখটি দেখে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল, সারা শরীরে শিরশির শীত বয়ে গেল, চোখের ভুরু কুঁচকে গেল—একটি অপূর্ণ মানব-শিশু!

ছেলেটি মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল, একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নেড়ে দিল, একবার যেন শিশুর মুখে হাত রেখে আদর করল, আবার হাত দিয়ে নাভিরজ্জু দেখল, দেখল চোখ দুটো…চোখ দুটো বোজা, গম্ভীর, বিমর্ষ-ভাব বুঝি…মুঠো-করা হাতে যেন অন্য জগতের কিছু একটা ধরে আছে, ফিনফিনে পাতলা চুল, গায়ের রঙ ফ্যাকাশে শাদা, মাথার পেছনটা একটু বড় ও উঁচু নিচু…সবকিছু সে মন দিয়ে দেখে নিল, দেখতে দেখতে তার মুখের ভঙ্গিও পাল্টে গেল, কী এক জান্তব আকর্ষণে তাকিয়ে আছে সে…তার কাছে সবকিছু বিস্ময়, এত কাছ থেকে এরকম কিছু সে আগে দেখে নি…তারপর কী একটা অচেনা ও অজানা শিহরণ সারা শরীরে খেলে গেল…হঠাৎ সে চোখ তুলে তাকাল। আমার সঙ্গে চোখা-চোখিতে বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল।

আর আমি…কিছু বুঝে বা না বুঝে কেন যে ছেলেটির কান ধরে চিৎকার করে উঠলাম, যেন সমস্ত অপরাধ ঐ ছেলেটির—এ্যাই, ফেল…রাখ, কোথায় পেয়েছিল বল…কোথায়…?

কথাগুলো সত্যিই কি আমি বলেছিলাম…অথবা খুব একটা ভেবেও বোধ হয় বলি নি! অথবা আদৌ কিছু বলি নি, সবই আমার ভাবনা শুধু। ছেলেটি বসা-অবস্থায় আমাকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখল, অথবা ছেলেটি চোখের পলকে ভ্রূণশিশুটি দলামোচা করে আমার মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরে খিলখিল করে হেসে দৌড় দিল। আমার ফুসফুসের ভেতর দম আটকে গেল, বমি ছুটে এল, মাথা ঘুরে উঠল—ততক্ষণে ছেলেটি গলি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ততক্ষণে স্থানকাল সম্পর্কে আমার জ্ঞান হল, একজন লোক এসে আমার পাশে দাঁড়াল, আরো

একজন এল, তারপর আরো একজন। তারপর জল্পনা-কল্পনা, আস্তে আস্তে ভিড় বেড়ে যাওয়া, নানা জনের নানা উক্তি...। তারপর মেথরেও শিশুটি নিতে চাইবে না, তারপর পুলিশে ডায়েরী করা, টানাপোড়েন, গলির বাড়িতে বাড়িতে অবিবাহিত মেয়েদের সম্পর্কে আন্দাজ অনুমান যুক্তিতর্ক খাড়া করা, ঝি-চাকরানীদের মুখে মুখে পাচার হওয়া কাহিনী...তারপর সবকিছু একদিন শেষ হয়ে যাবে, হ্যাঁ, একদিন ধামাচাপা পড়ে যাবে—তবে পাঠকগণ জানেন পৃথিবীটা শুধু এরকম নয়, এরকম ঘটনা হরহামেশা ঘটে না, এই দৃশ্যটিই গলির একমাত্র পরিচয় নয়। আমাকেও দায়ী ভেবে বসবেন না যেন। আমি একেবারে ধোয়া তুলসী পাতা।

এবার ওপাশের দোতলা বাড়ির পর্দার ফাঁকে দাঁড়ান কুমারী মেয়েটির অবস্থা কী হল জানা দরকার। মেয়েটি খুব কষ্টে জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। শ্রাবণের আকাশের মতো ওখানে দাঁড়িয়েছিল। হয়তো তার আলো-হাওয়া দরকার, অথবা শ্রাবণের আকাশটাই তার দোসর, অথবা এসব তার অভ্যেস...ঝি-গিরির মতো প্রতি ভোরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছেলেমেয়ে পড়াতে যাওয়া যুবককে দেখতে দাঁড়িয়েছে, মানুষের কত রকম সখ-অভ্যেস আছে। মেয়েটি প্রথমে আকাশের চেয়ে বেশি থমথম হয়ে গেল, তারপর নিচের দিকে তাকাতেই তার স্নায়ু এক পায়ে দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে বেজে উঠল, তখন ছেলেটি কাগজের পুঁটলি খুলে ভ্রূণশিশু দেখছে। দেখে মেয়েটির বুক, বুকের ভেতর হৃদপিণ্ড, হৃদপিণ্ডের ভেতর শব্দ, শরীরের লক্ষ লক্ষ জীবকোষ, স্নায়ুতন্ত্র, স্নায়ুর রাজা মস্তিষ্ক, একে একে সকলেই বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তার সমস্ত ভালোবাসা ঐ ছোট দুর্বল অপূর্ণ মৃত শিশুটির জন্য...এই ভালোবাসার মাঝেই নিহিত আছে অপরিসীম দুঃখ...কোনো এক লজ্জাকর পরিস্থিতি? অথচ কয়েক ঘণ্টা আগেও ভ্রূণটি কত আপন ছিল! প্রতি ঘণ্টা, প্রতি সেকেণ্ড, প্রতিটি পল-অনুপল একজনের রক্ত থেকে শক্তি নিয়ে বেঁচেছিল, ভালোবাসা ও কষ্ট দিয়েছিল। ছেলেটির এতটুকু দয়ামায়া নেই আর তার পাশে দাঁড়ান যুবক? সে কেন দাঁড়িয়ে, ছেলেটি অমন করে পালাল কেন? পালাবার আগে যখন থপ করে মাটিতে ফেলল তখন.. তখন মেয়েটির সন্তান ধারণক্ষম গর্ভাশয়টি কে যেন হাত দিয়ে চিরতরে নষ্ট করে দিল...তার কাল্পনিক গর্ভপাতের আশঙ্কা অর্থাৎ তেমন এক নিষ্ঠুর যন্ত্রণার ছায়া তাকে ঝাপটে ধরল। সে দাঁত দিয়ে তার নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল, রক্তের নোনতা স্বাদ পেল এবং অমনি তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। তখন মেয়েটির প্রচণ্ড কামনা জেগে উঠল—একবার শুধু একবার ঐ শিশুকে চুমু খেতে, দু হাতে আগলে ধরে অনুভব করতে, অশেষ ভালোবাসায় কোলে তুলে বুকের বোতাম খুলে দুধ খাওয়াতে, শুধু একবার যদি বুকের ভালোবাসা বিলিয়ে দেওয়া যেত! মেয়েটির বুক সত্যি ভারি হয়ে উঠল।

আস্তে আস্তে জানালার শিক ধরা দু হাত শিথিল হয়ে গেল, তারপর আরো আস্তে আস্তে দেয়াল ঘেঁষে মেঝের ওপর মেয়েটি লুটিয়ে পড়ল। তারপর ঘর হাওয়া শহর প্রকৃতি বাল্যপ্রণয় কুমারীজীবন এবং পৃথিবীর যাবতীয় শোক-সঙ্গীত তার বোধে ঝড় তুলল। সে যখন পা ছড়িয়ে চিৎপাত পড়ে গেল, তার মানানসই বুক, তার নিজের ইচ্ছের অপরিণত শিশু, গর্ভের ভেতরকার দস্যিপণা করা ছেলে, তার প্রেমিক...স্বপ্নে স্বপ্নে সারা শরীরে এক মধুর যন্ত্রণাময় অতৃপ্তি ছড়িয়ে পড়ল। বুকের গভীরে তিরতির করে দুধের অন্তঃসলিল নিঃসরণ কী তৃপ্তিকর...কী মিষ্টি লঘু নিঃশ্বাস! সেই লঘু নিঃশ্বাস...যা পৃথিবী থেকে আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, যে লঘু নিঃশ্বাস এক সময় সবার বুক থেকে সুখে বেরিয়ে তাকে আরো সুখী করে তুলত...আঃ, আহা!

আর আমি?

আমার কথা এখন থাক। ক্ষমা করুন, ক্ষমা করবেন।

[গল্পগ্রন্থ ঃ আকাশে প্রেমের বাদল]

উল্কি

দীর্ঘ কুড়ি বছর স্বেচ্ছা-নির্বাসনে থেকে কোব্বাদ মিয়া ডাক্তার হয়ে গ্রামে ফিরে এসেছে। দেশে ডাক্তারের সংখ্যা খুব কম। দু-দশ গ্রামেও একজন এল. এম. এফ. ডাক্তার নেই, গ্রামের মানুষদের ডাক্তারি-বিধান দেয় কবরেজ-হোমিওপ্যাথরা। তখন দেশে সবেমাত্র ধন্বন্তরি পেনিসিলিন এসেছে। হাতুড়ে ডাক্তাররা সাধারণ জ্বর ইত্যাদি সব রকম রোগে ঐ পেনিসিলিন দিতে শুরু করেছে। গ্রামের মানুষও একদিনে ভালো হয়ে মাঠে চলে যায় কাজকর্মে। সে-সময় অদ্ভুত স্বভাবের কোব্বাদ ডাক্তার এসে ডিসপেনসারি খুলে বসল বাজারের এক মাথায়। সারাক্ষণ চুরুট মুখে থাকে, আর লোক পেলেই শুরু করে বকবক গল্প। ডাক্তারির কী বোঝেন কে জানে! কোথায় শিখেছে কেউ জানতে চাইলে লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে বসে, সেই ফিরিস্তি থেকে আসল সত্য বের করা খুব কঠিন। কিন্তু তার দরাজ গলা, প্রাণ খুলে হাসির শব্দ কিংবা দেখা হলেই ভালো-মন্দ খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্যে লোকজন দু দিনেই তাকে আপন করে নিল। ছোটকাল থেকেই তার এই স্বভাব। মাঝখানে দীর্ঘ কুড়ি বছর দেশের বাইরে থাকার জন্যে তার সম্পর্কে নানা কাহিনী গড়ে উঠেছে। এখন তো সে আর পনেরো বছরের কিশোর নেই, কিংবা বেকারও নয় যে সবাই করুণা করবে। বরং ডাক্তারহীন গ্রামে সে একজন ডাক্তার হয়ে ফিরে এসেছে, সকলেই তাই তাকে সমীহ করে, খাতির রাখতে চেষ্টা করে সবাই। রাতারাতি সে এভাবে শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠল। কিন্তু দীর্ঘ বিশ বছর গ্রাম থেকে অনুপস্থিত সে, কেউ কিছু জানে না তার সম্পর্কে—আর জানে না বলেই কৌতূহল সবার। সেই কৌতূহলও একদিন থিতিয়ে পড়বে, কোব্বাদ ডাক্তারও হয়তো সবার মতো ভিড়ে হারিয়ে যাবে।

কারও বাড়িতে ডাক্তার হিসেবে রোগী দেখতে শুরু করার আগেই একটা কাণ্ড ঘটল। গরমের এক সকালে কোথা থেকে একটা খেঁকি কুকুর তার ডিসপেনসারির সামনে এসে মরতে বসল। কোব্বাদ ডাক্তার ঘেন্নাপিত্তি বিসর্জন দিয়ে কুকুরটাকে কোলে করে ডিসপেনসারিতে তুলল। জলাতঙ্ক রোগ নয়, তাহলে তো পাগল হয়ে মানুষ কামড়াতে ছুটত।

সকালের বাজার জমে উঠেছে রোজকার মতো, লোকজন তরিতরকারি নিয়ে দোকান খুলে বসেছে, মুদি দোকানদার খদ্দেরের আশায় বসে আছে। লোকজনের ভিড় দেখে কোব্বাদ ডাক্তার তার স্বভাব-সুলভ ধৈর্য হারিয়ে বকাবকি শুরু করল। সকলকে একে একে ডিসপেনসারি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে কুকুরটাকে নিয়ে বসল। কম্পাউণ্ডার নেই তার, তাই সাহায্যও করার জন্যে আনাড়ি এক লোককে হাত ধরে টেনে ঘরের মেঝেয় বসিয়ে দিল। বলল, কুকুরটা ধরো।

মরতে বসা কুকুরটাও চিৎপাত শুয়ে চুপ হয়ে রইল। কোব্বাদ ডাক্তার আলমারি খুলে ইনজেক্শনের সিরিঞ্জ, ডিসটিল ওয়াটারের এ্যাম্পুল এবং পেনিসিলিন বের করে নিল। একজন মানুষকে পেনিসিলিন দিতে যা যা করতে হয় প্রত্যেকটি কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করল। স্পিরিটের বাতি জ্বেলে গরম জল করা, সিরিঞ্জ ধুয়ে বীজাণু মুক্ত করা—কোনো কাজ বাদ দেয় নি। তারপর কুকুরটার পেছনের বাঁ পায়ের উরুর লোম সরিয়ে তিরিশ লাখ পেনিসিলিন পুরে দিল মমতা ভরে। সিফিলিস বা ভাইরাস রোগে তখন পেনিসিলিন মহৌষধ।

ইনজেক্শন দেওয়ার সময় শার্টের আস্তিন গোটাতেই কোব্বাদ ডাক্তারের বাঁ হাতে দেখা গেল মাছের এক উল্কি। মীন রাশির দুটি মাছ পাশাপাশি আঁকা। লোকটি হাঁ করে তাকিয়ে রইল ডাক্তারের দিকে। গ্রামে উল্কি আঁকা লোক একটাও নেই। চা বাগানের মেথর সর্দারের বাড়িতে উল্কি আঁকা লোক আছে। আর উল্কিদার ঐ কুলি সর্দার সবার কাছে শ্রদ্ধেয় এবং অনেকটা রহস্যময় ও দুর্জ্ঞেয় লোক। চা বাগানের কুলিরা প্রায় সবাই সাঁওতাল। তারা উল্কি আঁকে না মেথরদের মতো। সাঁওতালদের কালো রঙ শরীরে উল্কি মানায় না। তবুও কেউ কেউ কচিৎ উল্কি আঁকতে চায় বৈকি! কিন্তু উল্কি আঁকতে জানা লোক এ তল্লাটে একজনও নেই। কোব্বাদ ডাক্তারের হাতে উল্কি দেখে তাই সমীহভরে তাকিয়ে রইল লোকটি।

কোব্বাদ ডাক্তারের কুকুরকে ইনজেক্শন দেওয়া আর উল্কির কথা একদিনেই পাড়াময় রাষ্ট্র হয়ে গেল। পরদিন কুকুরটাও উঠে দাঁড়াল এবং দিব্যি সুস্থ হয়ে খাওয়া-দাওয়া, পা তুলে পেচ্ছাব করা ইত্যাদি কুকুরের স্বভাব মতো সব কাজ শুরু করল। কোব্বাদ ডাক্তারেরও নামডাক হয়ে গেল এক লহমায়। চা বাগানের বস্তিতে খবর রটে গেল, রোগীর ভিড় বাড়তে লাগল। ডিসপেনসারিতে একজন লোক রেখে কম্পাউণ্ডারি শেখাতে লাগল কোব্বাদ ডাক্তার।

বাজার থেকে মাইল খানেকের মধ্যেই বাগান, বাগানের কারখানা থেকে সারাদিন শোনা যায় ঘন্টা পেটানোর শব্দ, রাত যত গভীর হয় ঘন্টার শব্দ হয় আরও বড়, মাঝে মাঝে বাতাসের তোড়ে ভেসে আসে শুকোতে দেওয়া চায়ের গন্ধ। ছুটির পর কারখানা থেকে কুলি-মজুররা বেরিয়ে আসে হল্লা করে, আদিবাসীরা চলে যায় নিজেদের বস্তিতে, মদের দোকানে জমে ওঠে ভিড়। কোব্বাদ ডাক্তারেরও আনাগোনা শুরু হল বস্তিতে, কুকুরটিও ছায়ার মতো তাকে অনুসরণ করে সবখানে। কুকুর তো অকৃতজ্ঞ নয়; প্রভু বলো, জীবনদাতা বলো, সেতো ঐ কোব্বাদ ডাক্তার—কুকুরটি তার ডাক্তারি পেশায় প্রতিপত্তি বাড়িয়ে দিল প্রথম দিনেই, আর ডাক্তারও তাকে তাড়াতে পারল না। এভাবে শুরু হল তাদের পরস্পর পরস্পরের নির্ভরতা। সেই নির্ভরশীলতার কোনো সংজ্ঞা নেই, সীমরেখাও টানা যায় না। কোব্বাদ ডাক্তার বিয়ে-বউহীন মানুষ। ঘরে আছে সমবয়সী খুড়ো, খুড়োর পরিবারেই খায়-দায়। পাড়াপড়শী তাকে ভালোবাসে, রোগশোকে ডাকে, মাঝে মাঝে কাউন্সিলের বিচার-আচারেও ডাক পড়ে। তবে পারতপক্ষে সে ওসব ঝামেলা এড়িয়ে চলে।

বাগানে গরমের দিনে কলেরা, বর্ষায় আমাশয় বা মাঘ-ফাল্গুনে বসন্ত রোগের উৎপাত লেগেই আছে। বাগানের ডাক্তার থেকে ওরা ওষুধপত্র, বিধি-ব্যবস্থা পায়। কিন্তু কোব্বাদ ডাক্তারের প্রতিপত্তি সেই ডাক্তার ঠেকাতে পারল না। সে উল্কি আঁকাতে জানে। তাই অনেকেই তার করুণা চায়। কিন্তু উল্কি আঁকার ব্যাপারে সে কারও কথায় ওঠ-বস করে না। মেথরদের মধ্যে উল্কি আঁকার রেওয়াজ তো আছে, দু'-একজন করে সাঁওতালও উল্কি আঁকার জন্যে তার কাছে ধরনা দিতে শুরু করেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে সে হিসেবের বাইরে এক পাও হাঁটবে না। কুলি সর্বদারের ছেলের গায়ে তীর-ধনুকের উল্কি এঁকে দেওয়ার পর তার প্রতিপত্তি বেড়ে গেছে। ঝমরু সেই থেকে শিকারে গেলে কোনোদিন খালি হাতে ফেরে না। বন শুয়োর, বন মোরগ এমনকি একদিন আস্ত একটি হরিণ শিকার করে নিয়ে এল। যদিও হরিণের চেয়ে শুয়োরের মাংসই তাদের বেশি প্রিয় তবুও দুর্লভ হরিণ শিকার করার পর ঝমরুর নাম তার বাবার চেয়েও বেড়ে গেল।

কোব্বাদ ডাক্তারের মনে তবুও শান্তি নেই। তার ডাক্তারিবিদ্যা আর উল্কি আঁকা শেখার অনেক কাহিনী আছে। সেসব কথা সে কাউকে কোনোদিন বলে নি। মাঝে মাঝে বলতে খুব ইচ্ছে করে। ছোটকাল থেকে সে অনেক দেখেছে, অনেক ঘুরছে। দীর্ঘ কুড়ি বছর সে দেশছাড়া ছিল। মাঝে মাঝে তার বুকের ভেতর হাহাকার ওঠে। যখন সে উল্কি আঁকা শেখে তখন তার গুরু একটি কথা বলত—উল্কি আঁকা সৌন্দর্যচর্চার অঙ্গ। এক সময় সে উল্কি আঁকতে শেখে। তার নিজের গায়ে যখন একে একে উল্কির সুইয়ের ফোঁড় লাগে, সিঁদুরের রঙে ডোবানো সুই যখন তাকে একে একে বিদ্ধ করে, সে-যন্ত্রণার মাঝেও তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা সে উল্কি আঁকতে শিখবে। আদিম সমাজে কবে থেকে এর সূত্রপাত তা কোব্বাদ ডাক্তার জানে না। শুধু জানে যে এখনও আদিম সমাজের মানুষ উল্কি আঁকে। সুন্দরী নারীর শরীরে একটি ছোট উল্কি কী মোহনীয় আকর্ষণ সৃষ্টি করে সে তার নির্বাসন জীবন কাটানোর সময় দেখেছে। উৎকল দেশ ঘুরতে ঘুরতে সে এই নিয়ে অনেক ভেবেছে। মাদ্রাজ ও পুরীর সমুদ্র তীরে সে খুঁজেছে সুন্দরী তরুণী। তার গুরু তাকে বলেছিল, খবরদার শুধু টাকার লোভে কারও গায়ে উল্কি আঁকতে হাত বাড়াবে না। সৌন্দর্যচর্চার নামে তুমি এই বিদ্যা আমার কাছ থেকে শিখতে পেলে। গুরু তাকে আরও বলেছিল, কালো ছিপছিপে ভারী উরুর কোনো মেয়ের শরীরে নির্লোভ একাগ্র মনে যদি উল্কি আঁকো তবে সেই নারী পাবে উল্কির প্রাণীর সব গুণাগুণ। মন দিয়ে উল্কি আঁকবে, প্রতিটি ফোঁড় দেবে মমতা ভরে, আর মনে রাখবে এ-কাজ শিল্পকর্মের অঙ্গ, যে-নারীর গায়ে উল্কি আঁকবে তার প্রতি কখনও লালসার হাত বাড়াবে না। শুদ্ধ শিল্পে ও সৌন্দর্য-চর্চাতেই মানুষের মুক্তি।

সেই থেকে কোব্বাদ ডাক্তার খুঁজে বেড়াচ্ছে তেমন একজন নারীকে, কিন্তু কোনো নারীর উরু দেখা তো সহজ নয়। একমাত্র অভিজ্ঞ লোকই শুধু পায়ের গোড়ালি দেখে উরুর লঘু-গুরু মাপ আঁচ করতে পারে। পায়ের গোড়ালি যাদের একটু ভারি তাদের উরুও ভারী হতে বাধ্য। কোব্বাদ ডাক্তার নানা লোকের কাছে কম্পাউণ্ডারি ও ডাক্তারি শিখেছে। ডাক্তারি শিখতে শিখতে উল্কি আঁকার কথা সে ভোলে নি। শরীরবিদ্যা তো একদিনে শেখা হয় না। আর শরীরের অন্ধিসন্ধি মনে রাখতে গিয়ে সে ভোলে নি উল্কি-গুরুর কথা। বাগানের কুলি মেয়েদের সে দেখে, ডাক্তারি করতে গিয়ে অনেক নারীর সংস্পর্শে আসে, কখনো কখনো মশারির বাইরে থেকে রোগীর সঙ্গে কথা বলে, রোগীকে ব্যবস্থা-পত্র দেয়। পর্দানশীন মেয়েদের চিকিৎসা করার দুর্ভোগ এবং তাদের সংস্পর্শে এসেও তাদের দেখতে না পাওয়া—একমাত্র গ্রাম্য ডাক্তাররাই

এই সমস্যার মুখোমুখি হয়। কিন্তু চোখ-কান সে বরাবরই খোলা রাখে।

এক সন্ধেয় কোব্বাদ ডাক্তার বস্তি থেকে ফিরছে। কুকুরটিও তার আগে আগে, পিছে পিছে। হঠাৎ তার পাশ দিয়ে এক তরুণী চলে গেল। ছিপছিপে গড়ন, গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামল। বেণী দুটি ঝাঁপিয়ে পড়েছে পিঠ ছাড়িয়ে নিতম্বে। কুকুরটি সঙ্গে সঙ্গে এমন শব্দ করে উঠল যে, মেয়েটি তাই হয়তো ভয় পেয়ে আরো জোরে হনহন করে চলে গেল। কেন যে কুকুরটি এভাবে ডেকে উঠল, বা কুকুরকে চুপ করতে বলার সময়ও সে পেল না। আর আলো-আঁধারেও সে আঁচ করে নেয় মেয়েটির উরু হবে সুগঠিত, সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে রোমাঞ্চকর অনুভূতি খেলে গেল। কিন্তু ভালো করে দেখা এবং কথা বলার আগেই মেয়েটি বস্তির ঘর-বাড়ির উঠোন দিয়ে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল।

ডিসপেনসারিতে ফেরার পর সে কাজে মন বসাতে পারল না। কম্পাউণ্ডারকে কিছু না বলে ছুটি দিয়ে দিল। কুকুরটাকে রীতিমাফিক আদর না করে ভেতরের কামরায় ঢুকে চুরুট জ্বেলে আরাম কেদারায় গা এলিয়ে ভাবতে লাগল, বস্তিতে যখন দেখা পেয়েছি তাকে খুঁজে পাবই। ডিসপেনসারিতেই ডাকব, উল্কি এঁকে দেব বললে সে স্বেচ্ছায় চলে আসবে, এসে উল্কির মধুর যন্ত্রণা হাসিমুখে গায়ে তুলে নেবে।...তারপর উল্কির ছবির গুণাগুণ পেয়ে সে চা-বাগান দাপিয়ে বেড়াবে।

পরদিন...তারপরও কয়েকদিন কেটে গেল। কোব্বাদ ডাক্তার আর সেই মেয়েটিকে দেখতে পায় না। নামও জানে না যে কাউকে জিজ্ঞেস করবে। প্রতিদিন বস্তিতে চলে যায় সে, রোগী দেখার ডাক আসুক না আসুক বস্তির গলিতে গলিতে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে সে খোঁজ-খবর নেয়। সবাই যখন চা বাগানে চলে যায় তখনও ছুটে যায় বস্তিতে। এক দুপুরে মংলু সর্দারের বাড়ির পাশে মেয়েটির সঙ্গে আবার দেখা। অমনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, কাদের মেয়েগো তুমি?

ওমা তুমি চেনো না বুঝি, ঐ যে আমার বাড়ি, সর্দারের পাশের বাড়িই তো! এই বলে তাড়াতাড়ি তাকে ঘরে নিয়ে গেল। কথা বলতে বলতে ডাক্তার শুধু ভাবছে, এইতো সেই মেয়েটি যাকে সে দীর্ঘদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পায়ের গোড়ালি দেখে আবার বিড়বিড় করে বলল, কী সুন্দর, কী সুন্দর! মেয়েটির শরীরের গড়নও অস্বাভাবিক সুন্দর। এমন সৌন্দর্য সচরাচর চোখে পড়ে না। মেয়েটি তাকে গুড় দিয়ে এক গ্লাস জল খেতে দিল। হাজার হোক ডাক্তার মানুষ, উল্কি আঁকতে জানে,

লোকে বলে তার অসীম ক্ষমতা, সে ইচ্ছে করলে অদ্ভুত সব কাণ্ড করতে পারে। মানুষের শরীরে উল্কি এঁকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী করে দিতে জানে।

চৈত্রের গরমের দুপুরে এক গ্লাস পানি ও গুড় তার শরীর জুড়িয়ে দিল। তারপর সে মেয়েটির নাম জেনে নিল, এবং আস্তে আস্তে লখিয়াকে বোঝাতে শুরু করল। লখিয়া তো নিজেই উল্কি আঁকার কথা বলত, কিন্তু তার আগেই কোব্বাদ ডাক্তার তার ব্যাগ থেকে একটা ছবি বের করে দেখাল। ছবিটি রানী মৌমাছির। তারপর মেলে ধরল রানী পিঁপড়ের ছবি। তারপর একটি অতিকায় মাকড়সার ছবি বের করতেই লখিয়া চোখ বুজে চুপ করে গেল। আরেকটি ছবিতে রানী মৌমাছি পুরুষ মৌমাছিকে হুল ফুটিয়ে মেরে ফেলছে দেখেই লখিয়া কেঁপে উঠল। কোব্বাদ ডাক্তার বলল, সঙ্গম শেষে পুরুষ মৌমাছির জীবনে নেমে আসে এই ভয়াবহ পরিণতি।

কোব্বাদ ডাক্তার জিজ্ঞেস করল, তুমি উল্কি আঁকবে? তোমার মতো মেয়েদের জন্ম হয়েছে পুরুষদের শাসিয়ে বেড়াবার জন্যে। তুমি চাও তো মৌমাছি বা মাকড়সা যে-কোনো একটি উল্কি আঁকতে পারো, তাদের শক্তি করায়ত্ত করতে পারো। পৃথিবীতে শক্তিমতী হয়ে বেঁচে থাকার মতো সুখ আর নেই।

শুনতে শুনতে লখিয়ার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। বলল, না না, ও-কথা বলবেন না, আমি ঘর-সংসার নিয়ে সবার মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই। কিন্তু মনে মনে সে লোভী হয়ে উঠল। পুরুষ মানুষকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা...তার কুমারী দেহে এক অজানা শিহরণ খেলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে অচেনা ভয়ও তাকে জাপটে ধরল। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ডুবে সে বলল, অমন কথা বলবেন না, আমার খুব ভয় করছে। তারচেয়ে একটা মহুয়া ফুলের উল্কি এঁকে দিন আমার হাতে।

বসন্ত শেষ হতে বসেছে। চা বাগানের কোথাও মহুয়া গাছ আগের মতো নেই। আগে বাগানের কয়েকটি টিলা জুড়ে ছিল মহুয়ার বন। আদিবাসীরা মহুয়া খেয়ে নেশায় মেতে থাকত বলে বাগান কর্তৃপক্ষ ধীরে ধীরে মহুয়ার বন শেষ করে দিয়েছে। কোব্বাদ ডাক্তার দেখল মেয়েটির মনের গভীরে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা আছে। তাই আস্তে আস্তে সে তার মনের পর্দায় রঙ লাগাতে শুরু করল। বলল, হ্যাঁ, মহুয়ার উল্কি আমি এঁকে দিতে পারি, কিন্তু তুমি বোধ হয় জানো না আমি যাকেতাকে উল্কি এঁকে দিই না। সর্দারের ছেলের গায়ে এঁকে দিয়েছি। তুমি তো সাধারণ নও,

তুমি সেই নারীর বংশ যে পুরুষের মুখে লাগাম দিয়ে দাসখত লেখাতে পারে। তোমার এই সৌন্দর্য দিয়ে তুমি হতে পারো সর্বশ্রেষ্ঠ নারী, এই বাগানের পুরুষ হবে তোমার করুণা-প্রার্থী।

লাখিয়ার আদিম রক্তে ঢেউ খেলে গেল। মাতৃতান্ত্রিক সাঁওতাল সমাজে নারীই সর্বেসর্বা, কাজেই এই সুযোগ সে ছাড়তেও চায় না। সে লোভী হয়ে উঠল।

পরদিন লখিয়া কোব্বাদ ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে গেল। নদীর ধারে বাজার, দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদ চারদিকে, লোকজন নেই। কম্পাউণ্ডার বসে বসে ঝিমুচ্ছে, ডাক্তার ভেতরের ঘরে আরাম কেদারায় বসে চুরুট টানছে। লখিয়া তখন ঘরে ঢুকল। ডাক্তার বুঝল লখিয়ার রক্তে উল্কির নেশা ধরেছে। লখিয়া বলল, আমার বাবাকে বলেছি, তুমি আমাকে মহুয়ায় উল্কি এঁকে দেবে? কোব্বাদ ডাক্তার তবুও আশা ছাড়ে না, সে জানে একবার যখন উল্কির নেশায় পেয়েছে তখন লখিয়াকে ইচ্ছেমতো চালান যাবে। কোব্বাদ ডাক্তার তখন উঠে আলমারি থেকে একটা ছবি বের করল। রানী ক্লিওপেট্রার ছবি। লখিয়া জানে না ক্লিওপেট্রা কে। কিন্তু ছবির রাজরানী রূপ তার স্নায়ুতে শিহরণ জাগিয়ে দিল। কোব্বাদ ডাক্তার তাকে বলল, কে এই রানী জানো? পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ একদিন এই নারীর অনুগ্রহ কামনা করত, সঙ্গ-কামনায় উন্মত্ত হয়ে উঠত। রানীও তার পছন্দমতো পুরুষকে বুকের কাছে টেনে নিত। পুতুলের মতো পুরুষরা রানীর ইচ্ছার কাছে লুটিয়ে দাসখত লিখে দিত।

লখিয়ার তরুণী দেহে শিহরণ খেলে গেল। শরীর থেকে স্বেদবিন্দু ঝরতে লাগল। সে কী করবে বুঝতে পারল না। তার মনের কোণে জমে আছে একটি সংসারের স্বপ্ন, চা বাগানের ছায়াচ্ছন্ন জীবন, উৎসবের দিনে মাদলের নৃত্য-গীত, তারপর আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের সঙ্গে রাত্রিবাস... লখিয়া কোনোমতে জোর করে বলল, একটি মাদার ফুলের পাশে যদি মাদলের উল্কি আঁকতে চাই? তুমি দেবে না?

সেদিনও কোব্বাদ ডাক্তার লখিয়াকে যেতে দিল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান না ঘটিয়ে। লোকজন, বাজারবাসী সবাই জানে কোব্বাদ ডাক্তার ভালোমানুষ। পাড়া-পড়শীরা তাকে দেবতাতুল্য শ্রদ্ধা করে। চা বাগানের সর্দার, কুলি কেউ তার সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারে না। কোব্বাদ ডাক্তার দেখতে চায় তার নিজের সৃষ্টি। সৌন্দর্যের পাশাপাশি ধ্বংসের রূপ স্বচ্ছন্দে সহাবস্থান করতে পারে কিনা, তার দীর্ঘ ভবঘুরে জীবনের বিচিত্র শিক্ষার সঙ্গে এই স্থির জীবনের মিল কোথায় তা পরখ করে দেখতে

চায়। বসন্তের মহুয়া খেয়ে ভালুকও নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, আদিবাসীরা উৎসবে মেতে ওঠে মহুয়ার গন্ধে—কোব্বাদ ডাক্তার লখিয়াকে নতুন করে গড়ে চা বাগানে ছেড়ে দিতে চায়। সে যে উল্কি আঁকা শিখেছে, সেই শিল্পের পরিণতি দেখতে চায়। সৌন্দর্যই পৃথিবীকে শাসন করবে, লখিয়াই চা বাগানের পুরুষশাসিত সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করবে—কোব্বাদ ডাক্তার তা দেখতে চায়।

সেদিন চৈত্র পূর্ণিমার উৎসব। চা বাগানে উৎসবের ধুম লেগে গেছে। লখিয়া তার মন স্থির করে নিল। সে ছবির ঐ রমণীর মতো রূপসী হয়ে উঠবে, রাজরানী হবে। পৃথিবীর সব রূপবান পুরুষ তার কামনায় অধীর হয়ে উঠবে। কোব্বাদ ডাক্তারও ছুটল লখিয়ার খোঁজে। উৎসবের উঠোনের বাইরে দু' জনের মুখোমুখি দেখা। মংলু সর্দারও অনুমতি দিয়েছে। আস্তে আস্তে ওরা লখিয়ার বাড়ির দিকে চলল। লখিয়ার মা তাদের ঘরে ডেকে নিল। রাত গভীর হচ্ছে।

ডাক্তার ব্যাগ থেকে সুই, রঙ আর উল্কির ছবি বের করল। তারপর বলল, লখিয়া তোমার সমস্ত শরীর-মন এখন উল্কির দিকে নিয়ে যাবে। তোমার মন এখন উল্কির যন্ত্রণার কথা ভাববে না, ভাববে তুমি সুন্দরী ও শক্তিমতী হচ্ছ, তোমার রূপ ও গুণ বেড়ে বহুগুণ হচ্ছে, তুমি রাজরানী হতে যাচ্ছ।

কোব্বাদ ডাক্তার সুই তুলে সিঁদুরের রঙে ডোবাল, তারপর লখিয়ার পিঠের মসৃণ ত্বকে যত্ন করে প্রথম দাগ বসাল। সংগে সংগে লখিয়ার পিঠের ত্বকে মৃদু কাঁপন উঠল। সে-ব্যথা যেন কোব্বাদ ডাক্তারের শরীরেও সঞ্চারিত হল। একের পর এক সুইয়ের ফোঁড়ে লখিয়ার পিঠে ভেসে উঠতে লাগল ছবি। যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে লখিয়া। কোব্বাদ ডাক্তার বলে, মনকে সজাগ করো, তোমার মধ্যে অলৌকিক শক্তি পুরে দিচ্ছি সুঁইয়ের প্রতিটি ফোঁড়ে। লখিয়ার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, আবার সে মনকে শক্ত করে। একাগ্র মনে ভাবে, সে চা বাগানের রানীর আসনে বসে আছে, মাথায় সেই ছবিটির মতো মুকুট, হাতে রাজদণ্ড। সে আর আগের মতো নেই।

লখিয়ার মা পাশের ঘরে, ঘর থেকে কান পেতে শুনতে চায় মেয়ের যন্ত্রণার শব্দ আসে কিনা। একসময় সেও উৎসবে চলে যায়। লখিয়ার বাবা সেই থেকে উৎসবে নেশায় ডুবে আছে। লখিয়ার ভাইয়েরও সময় নেই আজ। মাদলের শব্দ আসছে গুরু গুরু, গানের সুর ভেসে আসছে। পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য লখিয়ার মাঝে পুরে দিতে চায় কোব্বাদ

ডাক্তার। সে সবচেয়ে সুখী মানুষ আজ, সে মাঝে মাঝে থেমে যায়, দুই আঙুলের ডগায় সুই ধরে রেখে রানী মৌমাছির ভারী শরীরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। হুলটা হওয়া চাই তীক্ষ্ণ। সমস্ত শরীরের মাঝে এই হুল সূক্ষ্মতম। মাকড়সার ছবিও সে আঁকতে পারত। মাকড়সার মধ্যেও সংহার শক্তি আছে। রানী মৌমাছির আয়ু মাত্র তিন বছর। তার মিলনের প্রয়োজন হয় বছরে একবার মাত্র। সুতরাং চাকের শত শত পুরুষ মৌমাছির মধ্যে একটিই মাত্র মিলনের দুর্লভ সুযোগ পায়। আর এই মিলনের ফল পুরুষ মৌমাছির জন্যে মারাত্মক। কোব্বাদ ডাক্তারও চায় রানী মৌমাছির মতো যে পুরুষ তার সংস্পর্শে আসবে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ! সে পুরুষ হবে তার আজ্ঞাবহ, তার জীবন হবে লখিয়ার পায়ের তলায়। কাঁকড়া বিছেও আঁকতে পারত। লখিয়ার পিঠ জুড়ে একটি অতিকায় কাঁকড়া বিছের ছবি, আর তা দেখে ভয়ে কাঁপতে থাকা পুরুষ--এসব ভেবে শেষ পর্যন্ত রানী মৌমাছির ছবিই আঁকতে শুরু করল।

ভোর হতে হতে কোব্বাদ ডাক্তার তার কাজ শেষ করল। সুই আর ছবি তুলতে তুলতে বলল, এবার তুমি উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো। ঘুম থেকে উঠবে দুপুর নাগাদ, এর মধ্যে পিঠে কাপড় লাগাবে না, কিছু খাবে না। তারপর তোমাকে চান করতে হবে, সিঁদুর গোলা পানিতে চান করার পর তুমি মুক্ত। তুমি নতুন কাপড় পরবে, খাবে। তারপর তুমি দেখবে সৌন্দর্য তোমার হাতের মুঠোয়, সকল পুরুষের কাম্য নারী তুমি। তখন লখিয়ার মা এসেছে, বাবা এসেছে। মা এসে দেখল লখিয়া শুয়ে আছে। ওর মা-বাবা ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলল, খেতে দিল বাটি ভরা চা। রাতের উৎসবের পর ওরা ক্লান্ত, তবুও ডাক্তারকে আপ্যায়ন করতে ভুলল না। চৈত্রের ফুরফুরে হাওয়ায় চা বাগান মেতে উঠল, শিমুল-গোটা থেকে তুলো উড়ছে বাতাসে, কলি আসতে শুরু করেছে বাগানের কৃষ্ণচূড়া গাছে। কোব্বাদ ডাক্তার এক ঝাঁক শালিকের ডাক শুনতে শুনতে বাগান ছেড়ে চলল ডিসপেনসারির দিকে। একটু ঘুম দরকার। আরাম কেদারায় বসে বসে কিছুক্ষণ ঘুমালেই শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠবে। আজ তার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন। সে তার জীবনের দীর্ঘদিনের আশা পূরণ করেছে। দুপুরে রঙ-গোলা পানিতে লখিয়াকে চান করালে তার কাজ শেষ।

এক সময় কোব্বাদ ডাক্তার ঘুমিয়ে পড়ল আরাম কেদারায়। দুপুর বারোটা নাগাদ ধড়ফড় করে উঠে বসল। তাড়াতাড়ি ডাক্তারি-বক্স হাতে নিয়ে বাজারের ওপর দিয়ে কোনোদিকে না তাকিয়ে ছুটল। সহজ-সরল আদিবাসী মেয়েটি কত কষ্ট পেয়েছে! হয়তো এখন সে স্বপ্ন দেখছে, বালিশের ওপর মুখ রেখে হয়তো এখনো ঘুমুচ্ছে! বাজার ফেলে নদীর ধার দিয়ে, বাগানের গাছ, গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় কুকুরকে সঙ্গী করে কোব্বাদ ডাক্তার ছুটল হনহন করে।

লখিয়ার মা ঘুমুচ্ছে, বাবা ঘুমুচ্ছে। কোব্বাদ ডাক্তার লখিয়াকে চান করতে পাঠিয়ে দিল। মাটির বড় জালায় রঙ গুলিয়ে চানের জল করে দিল কোব্বাদ ডাক্তার। চান শেষ করে নতুন পোষাক পরে যখন ঘরে আসবে সে-রূপটি দেখতে চায় কোব্বাদ ডাক্তার। তখন তরুণী লখিয়ার রূপ কেমন ঝলমল করে, তার মুখে কী লাবণ্য ফুটে ওঠে, কোন্ রূপে সে তার নতুন জীবন শুরু করবে—তার সূচনা দেখে তবেই কোব্বাদ ডাক্তারের ছুটি। কোব্বাদ ডাক্তারের কুকুটিরও তখন পাড়ার কুকুরদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ছোটাছুটি করছে।

মাটির বড় গামলায় রঙ-গোলা পানিতে লখিয়া যখন তার শরীর ডোবাল মনে হল তার পিঠ জ্বলছে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল সে। প্রতিটি ক্ষত জলের ছোঁয়ায় জ্বলতে লাগল। তবে সব যন্ত্রণার যেমন শেষ আছে লখিয়ার জ্বালাও এক সময় সহ্যের মধ্যে চলে এল। তারপর শরীর জুড়ে নেমে এল প্রশান্তি। পিঠ তো আর সে দেখতে পায় না, তাছাড়া হাত দিয়ে ঘষতেও নেই। বিন্দু বিন্দু রক্তের দাগগুলো কোব্বাদ ডাক্তার মুছে দিয়েছিল উল্কি আঁকার সময়। গুরু যেমন তার শিষ্যকে অনেক যত্নে পরিপূর্ণ শিক্ষা দেয় তেমনি মমতা ভরে উল্কি করে দিয়েছে কোব্বাদ ডাক্তার।

স্নান শেষে গভীর তৃপ্তি নিয়ে ঘরে এল লখিয়া। বসন্তোৎসবের জন্য কেনা নতুন হলুদ রঙের শাড়িখানা পরল। নতুন সাজে লখিয়াকে চেনাই যায় না। যন্ত্রণার অনুভূতি হয়তো তার মুখে লেগে আছে, আর সেই আনন্দ-বিষাদে লখিয়া হয়ে উঠেছে রাজরানী। ঘরে ঢুকেই সে দেখে কোব্বাদ ডাক্তার পায়চারি করছে। তার চোখে-মুখে বিস্ময়, এবং নিজের সৃষ্টি দেখে কোব্বাদ ডাক্তার মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠল। বলল, তোমার অনেক যন্ত্রণা সইতে হয়েছে, এখন ভালো তো?

কোব্বাদ ডাক্তারকে দেখে ঘুমভাঙা বাঘিনীর মতো আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠল লখিয়া। দৃঢ় অথচ ছন্দময় পা ফেলে লখিয়া এগিয়ে গেল ডাক্তারের দিকে, শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে চিতাবাঘ যেমন সবকিছু হিসাব করে নেয়, যেমন স্থির নিশ্চিত হয় যে শিকার আর পালাতে পারবে না, ঠিক তেমনি এগিয়ে গেল লখিয়া। সে আর ভীরু, লাজুক বা দ্বিধাগ্রস্ত নয়। রাজরানীর মতো গ্রীবা উঁচু করে কোব্বাদ ডাক্তারের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, তুমিই আমার প্রথম শিকার।

[গল্পগ্রন্থ ঃ উল্কি একটি প্রেমের গল্প}

খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার লোকজন নদী পাড়ি দিয়ে পালাতে শুরু করল। গ্রামের দক্ষিণে কর্ণফুলী, পশ্চিমে ও উত্তরেও খাল—কর্ণফুলী পার হতে পারলে বাঁচা যাবে, এরকম বিশ্বাস নিয়ে সবাই পালাতে শুরু করল। কিন্তু মিলিটারিরা নদী পেরিয়ে ওপারে গেলে তারপর কি হবে, তারপর তো পাহাড়ের রাজ্য শুরু, যুদ্ধ আর কতদিন চলতে পারে, বঙ্গবন্ধু কোথায়, শত্রুর বিরুদ্ধে অবরোধ টিকবে কিনা—সে সম্পর্কে কারো পরিষ্কার ধারণা নেই। সবাই একটা আপাত-ব্যবস্থা হিসেবে পাকিস্তানি বাহিনীর তোপের মুখ থেকে পালাতে শুরু করেছে।

অন্য সময় হলে এত লোকের আনাগোনায় হৈচৈ ও হল্লোড় পড়ে যেত, কিন্তু চিৎকার চেঁচামেচি নেই, ভয়ে শিশুরাও চুপচাপ, এমনকি একটা কুকুর বা দাঁড়কাকের শব্দ পর্যন্ত নেই, সবকিছু নীরবে সামাধা হচ্ছে। বেওয়ারিশ একটা কুকুর নৌকোর পেছন পেছন সাঁতরাতে শুরু করেছে। খেতের ওপর দিয়ে, বরজের ভেতর দিয়ে, ভিটে গোপাট ও বিলের খানাখন্দ পেরিয়ে মানুষ ছুটছে প্রাণভয়ে। কোলে শিশু, হাতে কোমরে বা মাথায় বোঁচকা ও পুঁটলি। সবার মুখে কে যেন ছিপি এঁটে দিয়েছে, শুধু নৌকার দাঁড়ের শব্দ, সাম্পানের বৈঠার ডাক আর মাঝির হম্বিতম্বি—ডুবে যাবে, আর নয়, আর একজনও উঠবে না—ইত্যাদি ইত্যাদি।

আধ ঘন্টার মধ্যে গ্রাম একেবারে ফাঁকা। সারা গ্রামে দশ-বিশ জন বুড়ো ছাড়া বোধ হয় কেউ নেই, কোনো কোনো বাড়ি ফাঁকা, গাছের একটি পাতাও নড়ছে না, আর সত্যি বলতে কি সেদিকে কেউ তাকিয়ে দেখেছে কিনা তাও বলা মুশকিল।

দুঃসংবাদটি নিয়ে এসেছে পল্টন। বাস-চলা রাস্তার ধারে বাজারে গিয়েছিল সে কোনো কাজ জোটাতে। চব্বিশে মার্চের পর থেকে কারখানা বন্ধ, দু' দিন অসুখে পড়েছিল বলে বেতনের টাকাও তুলতে পারে নি। সবাই বেতন তুলে নিয়েছে, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ—ছাব্বিশ তারিখের মধ্যে শ্রমিকের বেতন দিতে হবে। পল্টন কাজ খুঁজতে গিয়েছিল থানার বাজারে। গ্রামের লোকজন তাকে পাগলা পল্টন বলে ডাকে। ভারী ভারী মোট বইতে পারে সে, দুই-আড়াই মণের বস্তা কাঁধে তুলে নিলে শুয়োরের মতো মাথা নিচু করে ছুটতে পারে, আর প্রাণ খুলে গান গাইতে জানে। সে গান কখনো নিজের বাঁধা, কখনো রেডিওর গানের সঙ্গে নিজের ইচ্ছেমাফিক জুড়ে দেওয়া কলির, তবে কীর্তনের দোহার হিসেবে পল্টনের নাম আছে তার সুরেলা ভারি গলার জন্য। ভোরের সিফটে কাজে যাওয়ার সময় সে পাড়া মাতিয়ে যায়, কুয়াশার অন্ধকার ভোরে তার গলা শুনে অনেকে ঘুম থেকে জাগে, এজন্য তাকে কেউ কেউ পল্টন-ঘড়ি নামও দিয়েছে।

বাজার থেকে খবর নিয়ে যখন সে ছুটতে ছুটতে এল সবাই এক বাক্যে বিশ্বাস করে নিল। কেউ তার কথায় দ্বিতীয় প্রশ্ন তোলে নি, পাগল বলে কেউ তার কথা উড়িয়ে দেয় নি। সবাই জানে মিলিটারিরা শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে, আর দশ-বিশ মিনিট আগে কামানের শব্দ তো সবাই শুনেছেই। দু' দিন ধরে সবাই এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করছে। কামান ও মর্টারের শব্দ শুনেছে দূরে দূরে। আজ একেবারে পশ্চিমের মুড়ার কাছে গর্জে উঠেছে কামান। ঢাকা থেকে গাড়িতে ও পায়ে হেঁটে এবং নানা কাণ্ড করে বাড়িতে এসেছে উদয়ন, পুরো দু'টি দিন লেগেছে তার। তার বর্ণনা অনুযায়ী ঢাকার বস্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ের হল, পুলিশ লাইন ও পত্রিকা অফিস তছনছ হয়ে গেছে। তরুণদের পেলেই গুলি করছে তারা, হন্যে হয়ে খুঁজছে আওয়ামী লীগের লোকজন, বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করে নিয়ে গেছে করাচীতে।

গ্রাম ফাঁকা হওয়ার পর পল্টন লোকের বাড়ির আনাচ-কানাচ দিয়ে ঝাড়-জঙ্গল পেরিয়ে প্রত্যেকের বাড়িতে বাড়িতে বিহারি মেয়েটির খোঁজ নিল। তিনদিন ধরে মেয়েটি গ্রামে আছে। তার মা-বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাতের আঁধারে গ্রামে এসে আশ্রয় নিয়েছে। গ্রামের পথঘাট বা কাউকে চেনে না সে। সে জানে না তার মা-বাবা বেঁচে আছে কিনা, বেঁচে না থাকারই কথা। বঙ্গবন্ধুর পরিষ্কার নির্দেশ ছিল হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান সবাই বাঙালি, বিহারি ভাইদের গায়ে যেন কেউ হাত না তোলে। পল্টন মনে মনে সব ভেবে নিল, ভাবল, মুন্নির কিছু হয় নি তো? ওর মা-বাবাকে মেরে ফেলে নি তো কারখানার গুণ্ডারা?

তিনদিন আগে ভোর ফুটতে না ফুটতে গ্রামের বৌদ্ধ বিহারের[1] বারান্দায় গুটি মেরে বসেছিল সে। বিহারের ভান্তে[2] প্রতিদিনের অভ্যেস মতো ভোরে দিকচক্রমনের সময় মুন্নিকে প্রথম দেখতে পায়। ছোট একটি কাপড়ের পুঁটলি দু' হাতে জড়িয়ে ধরে গুটিসুটি মেরে বসেছিল। ওর পাশে বিহারের স্থায়ী বাসিন্দা কুকুরগুলো কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। বিপদের রাতে একটা কুকুরও যদি সঙ্গী থাকে মানুষ সাহস পায় লড়ে যাওয়ার। মুন্নি কী করে চার মাইল দূর থেকে এখানে এসে পৌঁছল সে নিজেও জানে না; রাস্তার লোকজনের চোখ এড়িয়ে রাতের পথ চলাও খুব মুশকিল। ভান্তের দরজা খোলার শব্দে সে চমকে আরো কুঁকড়ে যাচ্ছিল। অদৃশ্য হওয়ার কোনো মন্ত্র জানা থাকলে সে নিজেকে ঠিক তাই করত। কিন্তু চোখের সামনে কমলা রঙের কাষায় বস্ত্র পরিহিত ভিক্ষু[3] আনন্দকে দেখে সে দীর্ঘ নিংশ্বাস টেনে দাঁড়িয়ে দু' হাত জোড় করে বলল, আমাকে আশ্রয় দিন।

প্রথমে লাল মোহাম্মদের বাড়িতে আশ্রয় পেল সে। সেখান থেকে পল্টনদের পাশের বাড়িতে ছিল। পল্টন সারা গ্রাম তন্ন তন্ন করে খুঁজল। গ্রামের রাস্তায় না নেমে ভিটে থেকে ভিটে পেরিয়ে সবখানে খুঁজল। কেউ তাকে দেখে নি। কারো সঙ্গে পালিয়েও যায় নি। কে তাকে সঙ্গে নিয়ে ঝামেলা বাড়াবে! গ্রামের সবচেয়ে সাহসী তরুণরা আগে থেকেই ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কেউ গেছে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের সাথে, কেউ কেউ সীমান্তের দিকে চলে গেছে, বাকি দু'-চার জন যারা ছিল তারাও মিলিটারির খবর পেয়ে যে-যার মনে পালিয়ে গেছে।

খুঁজতে খুঁজতে পল্টন দেখল কারো ঘরের দরজা হাট করা অথবা রশি দিয়ে বেড়ার দরজাটা কোনো মতে বেঁধে দিয়েছে। বুড়ো-বুড়ি বা যারা আছে তারা ভয়ে কাঁপছে। তাদের একমাত্র ভরসা, বয়সের জন্য হানাদার পাকিস্তানিরা তাদের মাফ করে দেবে—তারা সবাই এক নিঃশ্বাসে পল্টনকে পালাতে বলল।

কারো কথা শুনল না পল্টন। পুব থেকে পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ কোনো পাড়া বাদ দেয় নি সে। শেষে হতাশ হয়ে গেল বিহারে। বুড়ো আনন্দ ভান্তে তখন দুপুরের প্রার্থনায় বসেছেন। সামনে গৌতম বুদ্ধের সৌম্য মূর্তি। পল্টন চুপচাপ ভান্তের পেছনে বসে পড়ল। প্রার্থনায় তার মন নেই। একবার ভাবল ডাকবে, কিন্তু পারল না। আবার উসখুস করে, আবার অস্থির চিত্তে প্রার্থনা জানায় বুদ্ধের কাছে, বঙ্গবন্ধু ও মুন্নি যেন ভালো থাকে। আবার উঠে দাঁড়ায়, বেরিয়ে উঠোনে গেল, উঠোন থেকে পুকুরের পাড় দিয়ে দূরে পুব দিকটা দেখল। সেদিক থেকেই হানাদার সৈন্যরা আসবে। বিলে ইরি ধান একটুও কাঁপছে না, কে জানে শত্রুর ভয়ে নাকি প্রাকৃতিক নিয়মে! ধানখেতের পরই টিলা—টিলার ঝোপ-ঝাড়ে শত্রুরা ওৎ পেতে বসে আছে কিনা দেখতে পেল না পল্টন। সে আবার ছুটল ভান্তের কাছে। ভান্তের কথা মতো মুন্নিকে লাল মোহাম্মদের বাড়িতে রেখেছিল প্রথমে। ভান্তে গ্রামের তরুণদের বলেছিলেন, সঙ্কটময় মুহূর্তে স্থির থেকে কর্তব্য পালন করবে। মানবসভ্যতার ধ্বংস নিয়ে আসে যুদ্ধ, যুদ্ধ কোনো সমস্যার স্থায়ী সমাধান দিতে পারে না, কিন্তু অনাদিকাল থেকে মানুষ যুদ্ধ এড়াতে পারে নি, মহামতি অশোকও পারে নি, বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনও শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হল। মানুষ কত কি ভাবে! ফেব্রুয়ারি-মার্চের উত্তাল দিনগুলোতেও মানুষ নিজের হাতে আইন তুলে নেয় নি, সবার এক কথা—জাতীয় সংসদের বৈঠক বসুক, সংসদই সব সমস্যার সমাধান করবে, রাজনীতির প্রক্রিয়ায় সবকিছুর সমাধান করবে রাজনীতিকরা।

প্রার্থনা শেষে উঠলেন আনন্দ ভান্তে। ঠিক তখনই পুব দিকে গুলির শব্দ শোনা গেল; পল্টনের বুক এক নিমেষে ফাঁকা, দুরু দুরু কাঁপতে শুরু করল। তার মা পালিয়ে গেছে, যাওয়ার আগে দেখাই হল না।

পল্টন ডাকল, ভান্তে!

ভিক্ষু আনন্দের সৌম্য চেহারায় কালো ছায়া দেখা দিল। কিছু বলার আগে তিনি ভেবে নিতে চান সবকিছু। চোখ তুলে তিনি বললেন, তুই পালিয়ে যাস নি? যা, তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়!

পল্টন বলল, মুন্নিকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। কেউ তাকে সঙ্গে নিয়ে যায় নি শুনেছি, তাছাড়া আপনাকে না জানিয়ে তো যাওয়ার কথা নয়।

অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর তিনি আবার বললেন, তুই তাড়াতাড়ি সরে পড়।

পল্টন বুঝতে পারে মিলিটারির মুখোমুখি হওয়া উচিত হবে না। কিন্তু মুন্নির জন্য মনটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, ঠিক তখনই আবার গোলাগুলির শব্দ আকাশ পাড়ি দিতে দিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মাহুতের টিলার দিক থেকে শব্দটা আসছে মনে হয়, কিন্তু একটু পরে

বৌদ্ধ বিহার[1] ঃ বৌদ্ধদের মন্দির
ভান্তে[2]. ভিক্ষু[3] ঃ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী

সবই পরিষ্কার হয়ে গেল—গ্রামে ঢুকে পড়েছে ওরা। পুব পাড়ায় আগুন জ্বলছে। গ্রামে ঢুকেই ওরা আগুন দিয়েছে, গাছপালার ওপর দিয়ে ধোঁয়া ও আগুন দেখা যাচ্ছে। তিন লাফে পল্টন বিহারের উঠোন পেরিয়ে গড়ে নামল। উত্তর-পশ্চিম দু'দিকেই গড়, গড়ে বেতের ঝাড়, তারপর সুপুরি ও ছনের বন, সে গড় পেরিয়ে ছন বনে ঢুকে পড়ল। দম নিয়ে শুনতে চেষ্টা করল লোকজনের বা ঘর পোড়ার শব্দ। তার বদলে শুনল খসখস আওয়াজ, সে আওয়াজ আসছে আশপাশ থেকেই। কান পেতে শুনল, মুন্নি তার নাম ধরে ডাকছে! পল্টনের বুক আবার দুরু দুরু বেজে উঠল। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল ছনের খোঁচা বাঁচিয়ে, তবুও হাত-পা ছড়ে গেছে, জ্বালা করছে।

মুন্নি মাথা নিচু করে বলল, পালিয়ে যাওয়ার সময় কেউ আমাকে সঙ্গে নিল না।

পল্টন বলল, তোমাকে খোঁজার জন্য... আমি সবার মতো পালিয়ে যাই নি।

রাখো তোমার বদান্যতা। এখন যদি আমি বের হই, তোমাদের শত্রুদের কাছে গিয়ে আমার মা-বাবাকে হত্যা ও লুটপাটের কথা বলি তাহলে কি হবে একবার ভেবে দেখেছ? পুরো গ্রামটাই পুড়িয়ে দেবে।

জানি, সব জানি। কিন্তু তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেও তো বিপদ থাকতে পারে! যারা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারত তারা গেছে যুদ্ধ করতে, ট্র্যানিং নিতে। এখন কে তোমার দায়িত্ব নেবে ঝুঁকি নিয়ে?

এখন যদি সব বলে দেই?

ওদের লালসার হাত থেকে তুমিও রেহাই পাবে না। তুমি ওদের চেন না।

কথাটা মুন্নি একবারও ভেবে দেখে নি। তার রূপ, যৌবন ও বয়সের কথা গণনায় ধরে নি। ভিক্ষু আনন্দের জন্য সে গ্রামের টাউট ও বদ লোকের হাত থেকে বেঁচে আছে তার হিসাব করে নি। পল্টনের কথায় সে আঁতকে উঠে বলল, তাহলে কি হবে?

ঘর পোড়ার শব্দ তখন হঠাৎ কমে এল। গোলাগুলির শব্দও নেই। নরপশুরা গুলি করবেই বা কাকে, সবাই তো পালিয়ে গেছে। পল্টন প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, বোধ'য় আর আগুন দিচ্ছে না।

আগুন কে নেভাচ্ছে!

কে জানে! হয়তো কেউ নয়।

ওরা কয় জন হবে বলতে পারো?

তা হবে বিশ-পঞ্চাশ জন। সঙ্গে কিছু রাজাকারও আছে।

তারপর আবার শোনা গেল গুলি ও ঘর পোড়ার শব্দ।

মুন্নি চুপ করে রইল। পল্টন একবার ডাকল, কিন্তু কোনো সাড়া পেল না। মাথা নিচু করে ছনের ডগা ছিঁড়তে ছিঁড়তে কাঁদো কাঁদো সে। ওর ভাব দেখে পল্টনের সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। কী বলে সান্ত্বনা দেবে, কী করবে ভেবে পেল না। মুন্নি মা-বাপকে হারিয়ে নিজের দেহ বাঁচানর জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছে, অন্ধকার রাতে এই গ্রামে চলে এসেছে। পথ-ঘাট কিছুই জানা ছিল না, কাউকে চেনে না। তবুও এরাতো কয়দিন আশ্রয় দিয়েছে, এখন না হয় সে-আশ্রয়ও খড়কুটোর মতো উড়ে গেল!

মুন্নি এবার মুখ তুলে বলল, তোমরা আমাকে মেরে ফেলতে পারো না? তাহলে আপদ চুকে যায়।

মুন্নি কথা শুনে কেঁপে উঠল পল্টন, কিন্তু সান্ত্বনা বা কোনো উত্তর মুখে এল না। যুদ্ধ শুরু হয়েছে এক মাস, শান্তির কোনো আভাস নেই। শান্তিরও বা কী দোষ, সে তো আর উড়ে এসে মেঘের মতো ছায়া মেলে দিতে পারে না, আর পারে না মেঘের মতো ঝরঝর বৃষ্টি হয়ে ঝরতে। মুন্নিকে সবাই দূরে সরিয়ে দিতে চায়, যুবতী বলে লালসার চোখে দেখে কেউ কেউ। কে আর এই বিপদের দিনে উট্‌কো ঝামেলা কাঁধে নিতে চায়! খান সেনাদের হাতে পড়ল কী হাল হবে শুনেছে, ওর মা-বাবা কারখানার গুণ্ডাদের শিকার হয়েছে, কর্ণফুলীতে ভেসে যাওয়া লাশের মধ্যে তারাও হয়তো ছিল—মুন্নিকে নিয়ে কী করবে ভেবে উঠতে পারল না পল্টনও।

মুন্নি কাঁদছে। সে আবার বলল, কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না, আপদ বিদেয় করো।

মুন্নির মুখে দ্বিতীয়বার মৃত্যুর কথা শুনে পল্টনের মনে সন্দেহ জাগল। সত্যিই তো, কেউ দেখবে না, কেউ জানতেও পারবে না, আর জানলেও সবাই চেপে যাবে না! শত্রুরা গ্রামে ঢুকে পড়েছে, আর লুকিয়ে রাখাও যাবে না।

পল্টনকে ভাবতে দেখে মুন্নি আবার বলল, ভয় পাচ্ছ কেন? একটি মানুষ হত্যা করতে পারো না তো কি পুরুষ হয়েছ? দেশ স্বাধীন করবে কি করে?

পল্টন আবার ধাঁধায় পড়ল। এভাবে কেউ কোনো দিন চোখে

আঙুল দিয়ে কথা বলে নি, এরকম সমস্যায়ও কোনো দিন পড়ে নি। হাসান মাস্টার যদি থাকত, অমর মাস্টার থেকে যদি জিজ্ঞেস করে নিতে পারত--কিন্তু তারাও তো মুন্নিকে লুকিয়ে রাখতে পারত না। মুন্নির জীবনের নিশ্চয়তা তারাও কি দিতে পারত? তারা কোথায় গেছে কে জানে!

কিছু বলতে না পেরে আমতা আমতা করে চুপ করে রইল পল্টন। রবীন্দ্রনাথের তিন্নি ও দালিয়ার কথা মনে পড়ল। মাত্র গতকাল গল্পটি পড়েছে সে, হাসান মাস্টার বইটি দিয়েছিল--এত গল্প থাকতে 'দালিয়া' গল্পের কথাই বা কেন মনে পড়ল বুঝতে পারল না সে।

চুপ করে আছ কেন, তাড়াতাড়ি করো।

এভাবে কেউ হত্যা করতে পারে? তুমি পারবে আমাকে মারতে?

তোমার মতো হলে পারতাম। একটি মেয়েকে আশ্রয় দিতে না পারলে বিষ তুলে দিতাম হাতে।

পল্টন আবার চুপ করে গেল, আবার বলল, তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসেছি।

খুঁজতে না নিজের জীবন বাঁচাতে!

দুই-ই সত্য।

আমাকে বাঁচাতে পারবে?

কী করে রক্ষা করতে পারি সে চেষ্টা করছি। ভান্তেও তোমার জন্য উদ্বিগ্ন।

গুলিগোলার শব্দ থেমে গেল। ঘর পোড়ার শব্দও শোনা যাচ্ছে না। চারদিক থমথমে শব্দহীন। পল্টন সাহস করে ছনের ওপর দিয়ে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই দেখার উপায় নেই। পুব দিকটায় ঘন মাদার গাছ, দক্ষিণে বেতের ঝাড়, উত্তর দিকেও ঝোপঝাড়ে ভরা ও খালের পাড়--কোনোদিকে কিছুই দেখা যায় না, মুন্নিও তেমনি বসে রইল।

পল্টন হতাশ হয়ে বসে পড়ল। শত্রুরা চলে যাচ্ছে হয়তো অথবা গ্রাম তছনছ করছে। ওরা কলেজে ঘাঁটি করবে। টিলার ওপর কলেজ, পাশে বড় রাস্তা—সামরিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারপর বলল, মুন্নি, তুমি একটু অপেক্ষা করো, দেখি ওরা চলে গেছে কিনা।

মুন্নি সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত ধরে বসিয়ে দিল। খবরদার এক পা-ও নড়বে না। ওরা এখনো যায় নি। ওদের চেনো না তুমি, এতক্ষণ পর তোমাকে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে, কতজন মরেছে এতক্ষণ কে জানে!

ওরা আবার চুপচাপ বসে রইল। পল্টনের বুকের মাঝে ঝড়। মুন্নির দিকে তাকাতে পারছে না। ওর ইচ্ছে করছে মুন্নিকে জড়িয়ে ধরে বুকের ভার লাঘব করে। মুন্নি হয়তো ভাবছে, এক গ্রাম লোকের মধ্যে তাকে রক্ষা করার কেউ নেই, কেউ সঙ্গে নিয়ে যেতে সাহস পেল না, মেয়ে বা বউয়ের মর্যাদা দিয়ে ঘরে তুলে নিতে পারল না কেউ! কী মানুষ এরা, এক ফোঁটা সাহস নেই, প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই! তারপর শুধু বলল, স্বাধীন হলে দেশ রক্ষা করতে পারবে তো!

পল্টন সে কথারও কোনো উত্তর দিতে পারল না। সে বসে বসে মুন্নির হাত ও পায়ের আঙুল গুনছে। মুন্নির সব নখের গোড়ায় এক ফালি সাদা চাঁদ, খুব ইচ্ছে করছে আঙুল ধরে নাড়াচাড়া করে, কিন্তু হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে চুপচাপ বসে রইল। মুন্নি হয়তো ওর মনের ভাব বুঝতে পেরেছে; অথবা খেলাচ্ছলে পল্টনের বাঁ হাতটা তুলে নিল। পল্টনের হাত শক্ত, রেখা খুব কম ও কর্কশ! মুন্নির নরম হাত যেন নুয়ে পড়বে ভারে। মুন্নি চোখ না তুলে বলল, আমার জন্য খুব ভাবছ জানি, তবুও তো কয়দিনের জন্য আশ্রয় পেয়েছি তোমাদের গ্রামে, ভান্তেও আমার জন্য খুব উদ্বিগ্ন। যে বিভীষিকা দেখে পালিয়ে এসেছি সে-কথা ভাবতেও হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে--তারাও তোমাদের মানুষ, লুটপাট করছে ঘরের জিনিসপত্র, খুন করেছে মা-বাবাকে--বলতে বলতে ঝরঝর কেঁদে দিল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, কেন তারা শেখ মুজিবের নির্দেশ মানল না বলোতো?

মুন্নির কথায় পল্টনের চেতনা হল। মুন্নির বাবাকে মেরে নদীতে ফেলে দিয়েছে? কে জানে কতদিন যুদ্ধ চলে, কতদিন পর আবার ঘরের দাওয়ায় নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারবে, সেসব দিন আবার কবে ফিরে আসবে, কবে আবার বঙ্গবন্ধু ডাক দেবে উদাত্ত কণ্ঠে, কবে আবার শুনব, ভায়েরা আমার...! মুন্নি হঠাৎ বলল, সত্যি করে বলো তো তোমরা কেন যুদ্ধ করছ?

পল্টন প্রায় চিৎকার করে বলল, আমরা স্বাধীনতা চাই।

কেন তোমরা কি পরাধীন ?

পাকিস্তানিরা আমাদের শত্রু, আমরা বাঙালি, ওরা আমাদের শোষণ করেছে এতদিন, আমাদের বঞ্চিত করেছে ন্যায্য পাওনা থেকে।

স্বাধীন হলে অন্য কোনো দেশ শোষণ করবে।

না, পারবে না।

তাহলে নিজের দেশের উঠতি ধনীরা করবে। তুমি যে-গরীব সে-গরীবই থাকবে। গরীবের কোনো বন্ধু নেই।

না, পারবে না। সমাজতন্ত্র আসবে, বঙ্গবন্ধু বলেছে এদেশে কেউ না খেয়ে থাকবে না, শোষিত হবে না। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হবে এই বাংলাদেশ।

মুন্নি আবার বলল, তুমি বৌদ্ধ, তুমি নাস্তিক।

ঐ যে পাকিস্তানি মিলিটারিরাও তো আল্লা বিশ্বাস করে, তারা কেন বিনা দোষে মানুষ মারছে? তোমার বাবাকে যারা খুন করেছে তারাও খোদা বিশ্বাসী।

বাপের কথায় মুন্নি চুপ করে গেল। তার মনে দ্বন্দ্ব লেগে গেল। পল্টনরা যদি নাস্তিক হয় তাকে তো আশ্রয় দিয়েছে, বাঁচাতে চেষ্টা করছে, সে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসেছে। ভিক্ষু আনন্দ তার জন্য অনেক করেছে। তিনিও তাহলে স্রষ্টাকে বিশ্বাস করেন না? মুন্নি আরেক সমস্যায় পড়ল। পল্টন তাকে নির্জনে একা পেয়েও কিছু করছে না। অথচ তার বাবাকে যারা হত্যা করেছে, মাকে যারা ধরে নিয়ে গেছে তারা? তাকেও নিয়ে যেত, শেয়াল-শকুনের মতো ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেত, সবাই তার দিকে লালসার চোখে তাকায় তাই সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কী অলৌকিক-ভাবেই না সে বেঁচে এসেছে। অমনি সে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ল।

আস্তে আস্তে তার হাত তুলে নিল পল্টন। এতক্ষণ মুন্নি তার হাত ধরেই ছিল, এবার পল্টন হাত বুলাতে লাগল, মুন্নি অধীর হয়ে পড়ল। পল্টন তার মাথায় হাত রাখল, হঠাৎ পল্টনও কেঁপে উঠল। মুন্নি এটুকুই চেয়েছিল হয়তো, পল্টনও যেন এই চেয়েছিল, অথবা কে জানে মানুষের মন ও দেহ কখন কী চায়। মানুষের মাঝে কেউ কেউ হাজারো সমস্যায় ডুবে কাজ করতে পারে, জটিলতা থেকে বেরিয়ে আসার পথও তারা ঠিক পেয়ে যায়। কেউ কেউ সুস্থ-স্বাভাবিক থেকেও কোনো কাজ সঠিকভাবে শেষ করতে পারে না, অথচ আরেকজন সমস্যার অতলে ডুবেও সমাধান বের করে নিতে পারে। মুন্নি হলেও-বা পল্টন অসচরাচর ধাঁচের মানুষ নয়। দুর্যোগের আগেই সবাই মুক্তির পথ খুঁজতে থাকে, আর যুদ্ধ-বিগ্রহের মতো দুর্যোগে ভালো-মন্দ-বুদ্ধিমান সব মানুষকে কোনো না কোনোভাবে মূল্য দিতে হয়। মুন্নিদের সমস্যাই ভিন্ন রকম, তারা বাঙালি নয়, মাথা নত করে সব মেনে নেয়া ছাড়া কোনো উপায়ই নেই।—তারপর মুন্নি আস্তে আস্তে নিজের হাতের রুপোর আঙটি খুলল, পল্টনকে বলল, আঙটিটা আমাকে পরিয়ে দাও তুমি।

পল্টন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মুন্নি বলল, চলো আমরা পালিয়ে যাই। শুনেছি, সবাই পালিয়ে যাচ্ছে সীমান্তের দিকে, আমরাও যাই। সেখানে আমরা জীবন শুরু করব। সেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে আমাদের দেশে চলে যেতে পারব।

পল্টন বলল, এটাই তো তোমার দেশ।

না, এ-দেশ আমার নয়। যদি আমার হত এ-অবস্থা হত না। আমাদের সবাই বিহারি বলে ঘৃণা করে।

তুমি এদেশী হয়ে যাও। বাঙালি হয়ে যাও।

কেন বাঙালি হব ?

পল্টন আর কথা বাড়াল না। শুধু বলল, আমার মা আছে।

তোমার মাকে সঙ্গে নাও।

মুন্নি যেন খড়কুটো ধরে হলেও আশ্রয় চায়। বাঁচতে চাইছে। জীবনের অর্থ খুঁজতে খুঁজতে নানা কথা বলছে। কিছুক্ষণ আগেও হত্যার কথা বলেছে, আবার নিজের দেশের কথা বলেছে, আবার পল্টনের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে বাঁচতে চায়। এ জঙ্গল যদি শত্রুর নাগালের বাইরে হত, কেউ তাদের খুঁজে না পেত—বেঁচে থাকার মধ্যে কী যে মাধুর্য তা মুন্নি অনুভব করতে শুরু করেছে। তারপর সে পল্টনের হাত তুলে নিল, বুকে জড়িয়ে ধরল, চুমোয় চুমোয় ভরে দিল, তার ইচ্ছে পল্টন তাকে আরো আদর করুক, সমস্ত শরীর দখল করে নিক, দলিত করুক। তার বুকে ঘণ্টার শব্দ, স্তনে রাইফেলের গর্জন, তারপর এক সময় পল্টনের শরীরে নিজের ভার তুলে দিল, নিজের বুকের মধ্যে পল্টনের মুখ চেপে ধরল।

মুন্নিকে ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল পল্টন। খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার, বিকেল হয়ে আসছে, চারদিক নিঃশব্দ, গাছপালা স্থির। মুন্নি আর বাধা দিল না। বিপৎপাত থেকে মানুষ নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। যদি পারত তাহলে নিজের দেশগ্রাম ছেড়ে এই পরবাসে আসতে হত না মুন্নিকে। এক সময় পরবাসকেও নিজ বাসভূমি ভাবতে শুরু করেছিল, স্কুলে পড়তে পড়তে বাংলা ভাষা শিখেছে, কলেজে উঠে ছাত্রি

রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে...এখন সে আবার উদ্বাস্তু। পল্টনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠতেই আরো বিপর্যয়ের চেহারা দেখতে শুরু করল। এর পরিণতি কি? পল্টনকে ছাড়তেও যন্ত্রণা—সারা শরীরে দুঃখ ও সুখের প্লাবন যুগপৎ আসা-যাওয়া করছে।

ছনের জঙ্গল, গড় ও বেতঝাড় পেরিয়ে ভিক্ষু আনন্দের কাছে গেল পল্টন। ভিক্ষু আনন্দও সবেমাত্র বিহারের উঠোনে পা দিয়েছেন। তাঁর সৌম্য চেহারায় ক্লান্তি ও বিষন্নতার ছায়া, অল্প সময়ের মধ্যেই বার্ধক্য তাঁকে চেপে ধরেছে। ধীর পায়ে তিনি এগিয়ে আসছেন, তাঁর হাতে গান্ধার রীতিতে আঁকা বুদ্ধের প্রতিকৃতি।

পল্টন হাত জোড় করে প্রশ্ন করল, ভান্তে, ওরা চলে গেছে?

বিষণ্ণ গলায় তিনি বললেন ঘর পোড়ার কথা, মানুষ হত্যার কাহিনী, অত্যাচারের কথা—তিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন। বললেন, আমরা চীনা বৌদ্ধ বলে ওদের থামিয়েছি, বোধ হয় বিশ্বাস করেছে। বুদ্ধের এই ছবি দেখে চিনেছে হয়তো।

শুনতে শুনতে পল্টন শরীরের সব শক্তি যেন হারিয়ে ফেলছে। তবুও কোনো মতে প্রশ্ন করল, কে কে মরল ভান্তে!

বাবুল, জামাল, রশিদ।

ওরা চলে গেছে এখন?

হ্যাঁ। তবে আবার যে কোনো সময় আসতে পারে। শান্তি কমিটি গঠন করতে বলে গেছে। মুক্তিফৌজের খবর দিতে হবে। গ্রামে নতুন কেউ এলে সঙ্গে সঙ্গে ওদের জানাতে হবে। কলেজে ওরা ঘাঁটি গেড়েছে। বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক খুঁজে বেড়াচ্ছে।

তাহলে এখন কি হবে?

কি আর হবে?—তারপর পল্টনকে প্রশ্ন করল, মুন্নি সম্পর্কে কি ভাবছ?

পল্টনের বুকের ভেতর তোলপাড়। মনে মনে বলল, তাহলে কি তিনি সব জানেন? তারপর বলল, ওকে নিয়ে পালিয়ে যাবার কথা ভাবছি।

কোথায় যাবে?

এখন সোজা রামগড় যাব।

কিন্তু পথে পথে মানুষকে কি জবাব দেবে?

সে তখন দেখা যাবে। তাছাড়া ওকে কোথায় লুকিয়ে রাখব? মিলিটারিরা জানতে পারলে পুরো গ্রাম পুড়ে ছাই করে দেবে।

তোমার মা কোথায়?

পালিয়ে গেছে সবার সঙ্গে।

নিজেকে কিছুতেই সংযত করতে পারছে না সে। হাঁটতে হাঁটতে বিহারের হলঘরে ঢুকে ভিক্ষু আনন্দকে হাত জোড় করে বলল, ভান্তে, আমি মুন্নিকে বিয়ে করব।

ভিক্ষু আনন্দ চোখ তুলে তাকালেন। পল্টন হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে অনুমতির জন্য। ভিক্ষু চুপচাপ, কী বলবেন, কী উপদেশ দেবেন ভাবছেন তিনি।

ভান্তে, অনুমতি করুন? ওকে নিয়ে আসি? বিয়ে করে আজই পালিয়ে যাব, অনুমতি দিন।

অনেকক্ষণ পর ভিক্ষু আনন্দ কথা বললেন, ওর মত আছে?

আছে।

এসময় কি বিয়ে করা ঠিক হবে?

আজই আমরা চলে যাব। কেউ জানবে না।

তুমি এমন সিদ্ধান্ত নেবার আগে ভালো করে ভেবে দ্যাখো।

ভেবে দেখেছি।

তুমি অনুমতি চাইলে দিতে হবে। তোমার স্বাধীন মতে আমি বাধা দেব না।

মুন্নির ইচ্ছা আছে। আমারও।

ভিক্ষু আনন্দ এবার বললেন, যাও। ওকে নিয়ে এসো।

সূর্য ডুবতে বসেছে। চারদিক শান্ত, শুধু গ্রামের একটি বাড়ি থেকে গরুর হামলানোর শব্দ শোনা গেল, বিহারের বড় বড় নাগকেশর গাছ থেকে শুকনো ফুল ঝরে পড়ছে, বাঁশ ঝাড় শরশর শব্দ তোলে, বাসায় ফেরা পাখিদের ডাক শোনা যায়, গ্রামখানি শান্ত নির্ভার হয়ে উঠতে চায় যেন, পল্টনের বুকের ভারি পাথরখানা সরতে শুরু করেছে—সে অনুমতি পেয়েছে, মুন্নির শরীরের সুখ-স্পর্শ এবার তাকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। আকাশ গাঢ় নীল।

পল্টনের বুকের ভার অনেক হাল্কা। সে দ্রুত পায়ে গড় ও ঝাড় পেরিয়ে, দু' হাতে ছন সরিয়ে মুন্নির কাছে ছুটল। মনে মনে ডাকল, মুন্নি মুন্নি!

ওরা দু' জন যেখানে বসেছিল সেখানে মুন্নি নেই। ওরা বসেছিল বলে জায়গাটা পরিপাটি হয়ে আছে। বুকের শব্দ শুনতে শুনতে পল্টন আস্তে আস্তে ডাকল, মুন্নি!

ভালোবাসায়, বেদনায়, ঐশ্বর্যে বুক উপচে পরছে তার। আবার আদর করে ডাকল, মুন্না, মু-ন্-না।

দু' হাতে ছন সরিয়ে খুঁজতে খুঁজতে মুন্নিকে পেল অবশেষে। মুন্নি শুয়ে আছে। কাছে গিয়ে উপুর হয়ে থুতনিতে হাত দিতেই মুখের অনেকখানি লালা তার হাতে লাগল এবং বুঝতে পারল মুন্নি আর বেঁচে নেই।

[গল্পগ্রঃ যুদ্ধ জয়ের গল্প]

পঞ্চগড়

পাখিটি পঞ্চগড়ে গিয়ে দেখি। পঞ্চগড় থেকে আর কিছুদূর গেলেই তেঁতুলিয়া। তারপর মহানন্দার সীমান্ত পেরিয়ে দার্জিলিং, কাঞ্চনজঙ্ঘা ও হিমালয়। শান্ত নিবিড় পরিবেশ। অনেকদিন পর মনটা হাল্কা হয়ে গেল। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম।

দেখতে একেবারে দোয়েল। শুধু আকারে একটু ছোটো আর পুরো লেজটি কালো। এমনকি পিঠ ঘেঁষে দু' দিকে দুটি সাদা টানা দাগও বোধহয় আছে।

ঝটপট ফাঁস পেতে ধরব সে-উপায়ও নেই। কারণ আমি পাখি বিক্রেতা নই তাই পাখি ধরার সাজসরঞ্জামও আমার নেই। কিন্তু ব্যবস্থা একটা করতেই হবে, ভারি মিষ্টি ডাক। সিপ সিপ সুই সুই ডাক মন কেড়ে নেয়। যেন দোয়েল পাখির ডাক। গাঢ় কালো রঙের ওপর দুটি শাদা ডোরাকাটা দাগ চোখ জুড়িয়ে দেয়।

দূরে চিনিকলের চিমনি থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। ওপাশে গরু জুতে আখ মাড়াই করে হচ্ছে গুড়। গন্ধে চারদিক মাতাল করে তুলেছে আর মোলাসেসের ঝাঁঝালো গ্যাঁজানো গন্ধ—একেবারে আদিম ও বন্য পরিবেশ।

আঠা ও কাঠি দিয়ে ফাঁদ পেতে বসে রইলাম। কিন্তু পাখি একটি। জোড়ের অন্যটি কোথাও খুঁজে পাচ্ছি নে, সময়ও কেটে গেছে আধ ঘন্টার মতো। ভাগ্যিস ইতিমধ্যে উড়ে যায় নি। কেন যায় নি তাও বলতে পারব না। মাঝে মাঝে এমনও ঘটে তাহলে! নইলে আধ ঘন্টা ধরে একটা পাখি এভাবে একা একা একটা ছোট্ট ঝোপে ঘুরে ঘুরে থেকে যাবে কেন? ঝোপের মধ্যে বাসা নেই তো? ঝোপটা ঘুরে ঘুরে দেখব সে-উপায়ও নেই। ওদিকে আখখেত। নতুন গজিয়ে ওঠা চারা কোথাও কোথাও দু'-আড়াই হাত বড় হয়েছে। মাঝে মাঝে তারও বেশি, আবার কোথাও বা একেবারে ফাঁকা, ছাড়া ছাড়া। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামছে দ্রুত, হাওয়া বইছে উত্তর-পুব থেকে, গরম নেই একটুও—মনোরম, খুব মনোরম বিকেল। পঞ্চগড়ে পৌঁছে অব্দি খাচ্ছি, ঘুরছি আর চারদিক তাকিয়ে দেখছি। লোকজন কম, ফাঁকা

ফাঁকা ঘরবাড়ি আর যেদিকে তাকাই সবুজ আর সবুজ—ঝোপ-ঝাড় আখখেত সবই সবুজ। এমন কি পুব দিকের আকাশটাও সবজে রঙের মনে হয়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই পাখি ধরা পড়ল। তারপর বাড়ল কাজ। একটা খাঁচা দরকার। লোকজন থেকে খোঁজখবর নিয়ে বুঝলাম খাঁচা কিনতে হলে ফরমায়েশ দিতে হবে। ঘুরতে ঘুরতে বাঁশ-বেতের কাজের এক কারিগরের বাড়িতে পৌঁছিলাম। কারিগর গেছে মাটি কাটতে। করতোয়ায় বাঁধ হচ্ছে। তাও বালির বাঁধ। কাজের বিনিময়ে খাদ্য নিয়ে কাজ। নদীর বুক থেকে বাঁধ উঠেছে। উঠতে উঠতে পুল ছুঁয়েছে। নদীর এপারে-ওপারে মহকুমা শহর পঞ্চগড়। বর্ষায় করতোয়া যখন ঢল নিয়ে ছুটবে তখন বালির বাঁধের কি হবে? থাকগে, তাতে আমার কি।

লিচু পাহারা দিতে দিতে বাঁশ থেকে শলা তুলছে খাঁচাওয়ালার বউ। শলাগুলো এতো মসৃণ যে মনে হয় সিরিশ কাগজ ঘষেছে। তারপর বাঁধল খাঁচার ফ্রেম। এভাবে পুরো দুটো দিন গেল বানাতে। লিচু গাছের ঘন ছায়ায় বসে লিচু পাহারা দেয় আর খাঁচা বানায়। তৈরি শেষে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভালো করে দেখে, যেন আপন সন্তানকে খাইতে দাইতে আদর করছে, ঘুমুতে নেবে বিছানায়⋯মনটা তেমনি ভরে ওঠে। নিজেই নিজেকে বলে, বাঃ কী সুন্দর!

তৈরী হওয়ার পর কারিগরের বউ নিজেও মুগ্ধ। এত সুন্দর খাঁচা সে কোনোদিন বানায় নি, এত বড় খাঁচার ফরমায়েশও কেউ কোনোদিন করে নি। খাঁচার তিনটি তাক। ওপরের তাকটা সবচেয়ে বড়। সেখানে পাখি দোল খাবে, ছোটাছুটি করবে। মাঝের তাক চান করার ও খাওয়া-দাওয়ার দাঁড় আছে একটা। একেবারে নিচের তাকে ঘুমোবে। বেত দিয়ে ঘন করে তৈরি সেটি—বাইরের লোকজন যেন ঘুমোবার সময় না দেখতে পায় এবং বিরক্ত না করে। তাছাড়া প্রত্যেকটি তাকের মাঝে দরজা আছে, ইচ্ছে মতো খোলা ও বাঁধা যাবে।

পাখিটি ধরার পর থেকেই বিপদের পর বিপদ। একটা যেমন-তেমন লোহার খাঁচায় পুরে রিক্সায় করে যাচ্ছি চিনিকলের ডাকবাংলোয়। পথে বাসের সঙ্গে প্রথম দুর্ঘটনা। রিক্সা থেকে ছিটকে পড়লাম রাস্তার পাশে উলুখাগড়ার ঝোপে, চোট লেগেছ হাতে, পায়ের পাতা গেছে কেটে। রিক্সাওয়ালা দূরে ছিটকে পড়লেও তার কিছুই হয় নি। খাঁচা সমেত পাখিটা দিব্যি উলুখাগড়ার ডালে ঝুলে আছে আর বসে বসে সে শিস দিচ্ছে—যেন ভোর। তখন চাঁদ উঠেছে আকাশে। পঞ্চগড়ের ঝকমকে

চাঁদের আলো, বাতাস বইছে পুব থেকে এলোমেলো, আর রাস্তার পাশে ফেলে দেওয়া মোলাসেস থেকে গ্যাঁজানো ঝাঁঝালো গন্ধ। পরদিন চুরি হল ঘড়ি ও কলম। দারোয়ানকে জেরা করেছি। সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। আর এরকম করে কেউ কেঁদে দিলে ভারি বিশ্রী ও অস্বস্তি লাগে। নিজেকেই নিজের কাছে অপরাধী মনে হয়। দারোয়ানকে শান্ত করতে করতে নানা কথা জিজ্ঞেস করছি, ঠিক তখনই পাশের কামরার মহিলা এসে বললে, পথে-প্রবাসে একটু সাবধানে থাকবেন তো! তখনই উঠল পাখির কথা। মহিলা উচ্ছ্বসিত হয়ে খাঁচা তুলে নিল।

বললে, কি পাখি?

আমিও জানি নে পাখিটির নাম।

আপনি কী নিয়ে গবেষণা করেন, পক্ষীতত্ত্ববিদ না?

না, না তেমন কিছু নয়, নেহাৎ সখ বলতে পারেন। ভালো লাগল তাই ধরলাম। ভালোবাসাও বলতে পারেন।

মহিলার স্বামী এসেছে সরকারী কাজে। বেরিয়েছে সেই সকালে। পাখি তখন আমাদের দিকে যেন কৌতুক করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, যেন আমাদের মনের কথা আঁচ করে ফেলেছে। ততক্ষণে মহিলার সঙ্গে হৃদ্যতা হয়ে গেছে। দারোয়ান বেরিয়েছে হাওয়া খেতে। আমরা নানা বিষয়ে আলাপ করতে করতে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে ডুবে গেলাম। কখন যে বুকের ভেতর ভালোবাসা জন্ম নিল, কখন যে আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে হাত ধরে বসেছি⋯আর ভালোবাসলে যা যা হয় আনুপূর্বিক ঘটতে লাগল। জানালা দিয়ে দেখা যায় আখখেত, সবুজের সমারোহ। কোথাও যেন দোয়েল পাখি ডাকছে, গরুর গাড়ির শব্দ ভেসে আসছে দূর থেকে আর মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে ছুটে যাওয়া বাসের গোঙানি। আমরা যখন আলিঙ্গনে সবকিছু ভুলে যেতে বসেছি ঠিক তখনই পাখিটি এক রকম কর্কশ হিস হিস শব্দ করে তার অস্তিত্ব জানিয়ে দিল। আমাদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট কিনা কে জানে!

সাপের হিস হিস শব্দের সঙ্গে সবাই পরিচিত। কিন্তু পাখিটি কি বলতে চায়? সে আরো জোরে শব্দ করে খাঁচা ঠুকতে লাগল। হঠাৎ দেখি মহিলা আমার কোলে মুখ লুকিয়ে কাঁদছে।

বাধ্য হয়ে আবার ওর খোলা পিঠে হাত রাখলাম। সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, বের করে দাও পাখিটাকে। ছেড়ে দাও খাঁচা থেকে। শত্তুর শত্তুর।

মহিলার আনুপূর্বিক ব্যবহারের কিছুই বুঝলাম না আমি। সে ছুটে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। নিজের কক্ষে গিয়ে দরজা বন্ধ করে

দিল। ওর দরজায় গিয়ে ডাকলাম অনেক করে, কিন্তু দরজা কিছুতেই খুলল না।

পরদিন মহিলার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় হল। আমরা তিনজন পাখির খাঁচা আনতে গেলাম। মহিলার ব্যবহারে একটুও প্রকাশ পেল না যে ইতিমধ্যে এত কাণ্ড ঘটে গেছে। ওরা খাঁচা দেখে প্রশংসা করল। আমিও এত সুন্দর খাঁচা কোনোদিন দেখি নি। বাঁশ ও বেত দিয়ে এত সুন্দর খাঁচা তৈরী হতে পারে আমার ধারণাও ছিল না। খাঁচার দাম নিয়ে দরাদরি না হলেও বেশ মোটা টাকা দিতে হল। তারপর আমরা বেশ বন্ধুর মতো লিচু কিনলাম, দুপুরে একসঙ্গে খেলাম। দুটো রিক্সায় ফিরতে ফিরতে বেশ হৈ চৈ হল। কখনো আমার রিক্সা এগিয়ে যায় কখনো ওদের। পাশ দিয়ে রিক্সা যেতে যেতে মহিলার উচ্ছ্বসিত হাসি আমাকে প্রফুল্ল করে দিল। তাহলে সেদিন সকালের ঘটনার সমাপ্তি হয়েছে। আমিও চাই সবকিছু সুন্দর ও স্বাভাবিক হয়ে যাক। পৃথিবী ভালোবাসায় ভরে উঠুক।

দুপুরের খাওয়ার পর শুরু হল আমার ভেদবমি। খেয়েদেয়ে ততক্ষণে ওরা বাইরে চলে গেছে। দারোয়ান গেল ডাক্তার আনতে আর পাখিটি মনের আনন্দে নতুন খাঁচায় গান গাইছে।

ডাক্তার এসেই বললে, কি পাখি ধরেছেন আপনি ?

নামটা ঠিক জানি নে।

অশুভ পাখি নয়তো ?

আর আশ্চর্য পাখিটি ঘরে থেকে বের করে বারান্দায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আমি অনেকখানি স্বস্তি বোধ করছি। শরীরে আক্ষেপ নেই, ঘুম নেমে এল চোখে। সেই বিকেলেই আমি অনেকখানি সুস্থ; সন্ধে পেরিয়ে রাত নামতেই প্রথমে দোতলায়, তারপর বারান্দা থেকে নেমে নিচের চত্বর এবং রাস্তায় হেঁটে এলাম। আকাশে চাঁদ, তেমনি মাতাল হাওয়া। মহিলা ও তার স্বামী ফিরে আসছে। আমাকে দেখে ওরা রিক্সা থেকে নেমে পড়ল।

আমাদের মধ্যে অনেক কথা হল। কিন্তু সারাক্ষণ পাখিটির চিন্তা আমাকে দখল করে রইল। পরদিন আমার বাকি কাজগুলো সারতে হবে, পত্রিকার রিপোর্ট লেখা তো আছেই। এক দিনের মধ্যেই সব কাজ শেষ করতে হবে। মাঝে একদিন কোনো কাজই হয় নি।

বারান্দায় এসে দেখি পাখিটি খাঁচার ওপরের তলায় বসে বসে হিস হিস করছে। আমার রাগ চেপে গেল। মহিলা বলল, ওকি

আপনি অমন করছেন কেন ? আমার তো বেশ মজাই লাগছে ওর ডাকাডাকিতে। মহিলা বোধ হয় গতকালের কথা বেমালুম ভুলে গেছে। সারাদিন তার সঙ্গে একবারও একান্তে দেখা হয় নি, তার জন্যও বোধহয় কোনো দুঃখ নেই। আমাদের মধ্যে যে নিবিড় অনুভূতি তাও ভুলে গেছে। তাই আমিও অসুস্থতার কথা বলে পাখিটি নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। দারোয়ান সব কথা বলে দিল ওদের। ওরা আবার আমার ঘরে এল, আমার কুশল এবং ওষুধপত্রের ব্যবস্থা ইত্যাদির খোঁজখবর নিল, রাতে দরকার হলে ডাকতে বলল। তারপর আমরা যে-যার বিছানায় চলে গেলাম। অসুখের কোনো রকম চিহ্নই আমার মধ্যে নেই। তবুও কিছু আর খেলাম না। ওরা বাইরে খেয়ে এসেছে। দারোয়ান আমার খাবার ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

মাঝরাতে ঘুম ভাঙতেই দেখি একটা ছায়া আমার ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জানালা খোলা, দরজাও ফাঁক একটু, বাইরে ঝকঝকে জ্যোৎস্না। ছায়ামূর্তি ঠিক কি খুঁজছে বুঝতে পারলাম না। ব্যাগের কাগজপত্র, টাকা-পয়সা? এছাড়া আর কিই বা আছে ? বুকের শব্দটা স্বাভাবিক হতেই আমি তৈরী করে নিলাম নিজেকে। মশারির ধারটা শুয়ে শুয়ে তুলে নিলাম। ছায়ামূর্তিটি ততক্ষণে জেনে গেছে আমি তৈরী হচ্ছি। ব্যাগ থেকে কাগজপত্রগুলো যেন নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে। আমি বারান্দা অব্দি গিয়ে দেখি মূর্তিটি কোথাও নেই। চাঁদের আলোয় বাংলোর বাগান ও চত্বর ঝলমল করছে। লোকটি কোথাও নেই।

ঘরে এসে আলো জ্বাললাম। ব্যাগের কাগজপত্র সব ঠিকঠাক আছে। খাঁচার কাছে গিয়ে দেখি দরজা বন্ধ। আকাশ-পাতাল ভেবে পেলাম না কেন চোর এল, কিসের লোভে ?

খুব ভোরে বেরিয়ে পড়লাম। গ্রামের পথে ঘুরে খাঁচাওয়ালার বাড়ি ফেলে ঘুরতে ঘুরতে করতোয়ার কূলে এসে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে অনাবশ্যক এদিক-সেদিক ঘুরে ঘুরে দুপুরের দিকে ফিরে এলাম বাংলোয়। বাংলোতে কেউ নেই। নিচে দারোয়ান বসে বসে ঝিমুচ্ছে। ওকে না জাগিয়ে দোতলায় উঠে দরজা খুললাম। পাশের ঘর ভেতর থেকে বন্ধ। খাঁচার কাছে গেলাম। পাখিটি শোয়ার ঘরে বসে আছে, ঠিক যেন বাচ্চা খোকার মতো লুকোচুরি খেলছে আমার সঙ্গে। ডাললাম, পিপি ?

পাখিটির নাম দিলাম পিপি। কেন ঐ নাম দিলাম জানি না। জলপিপি নামে পাখি আছে, সে-পাখির সঙ্গে এর কোনো মিল নেই, তবুও

নামটা হঠাৎ বেরিয়ে এল। আবার ডাক দিলাম, পিপি। অনেকক্ষণ ধরে ডাকলাম, পিপি, পিপি...ও পিপি, পি পি ই ই। ডাকতে ডাকতে একরকম নেশায় পেয়ে বসল আমাকে।

বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে ভেবে-চিন্তে পাখিটি শিস দিল। আবার ডাকলাম, পিপি...। শিস দিয়ে সাড়া দিল সে। কাছে গিয়ে আদর করে আবার, আবার ডাকলাম। বেরিয়ে এল শোয়ার ঘর থেকে উপরের তলায়। শিস দিতে ডাকল জোরে জোরে। খাঁচার মুখ খুলে হাতে তুলে নিলাম। একবার ভয় হল পাছে পালিয়ে যায়। তাই আলতো করে মুঠোতে ধরে রাখলাম। হাতের ওপর শিস দিয়ে ডেকে আমাকে মাতাল করে তুলল। মিষ্টি করে আবার শিস দিল, ঠোঁট কাত করে তাকাল আমার বুকের দিকে, ঠোঁট দিয়ে আঙুলে আদর করল। মুঠো থেকে বেরিয়ে এসে বসল আঙুলে।

কিরে, ডাক্তার বলল যে, তুই অপয়া পাখি ?

হিস হিস করে প্রতিবাদ জানাল সে।

থাক থাক হয়েছে। আর বলব না। তোকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব, ঢাকায় নিয়ে যাব। সেখানে আমার সঙ্গে থাকবি। ঢাকা মস্ত বড় শহর, অনেক বাড়িঘর, গাড়ি, কলকারখানা আর মানুষের ভিড়। হোক না মানুষের ভিড়। তুই আর আমি থাকব, তুই ভোরে শিস দিবি, আমি জেগে উঠব। তুই নাচবি, আমি দেখব। তুই আমার ঘর-মন-হৃদয় ভরে দিবি।

পিপি আবার ঠোঁট কাত করে আমার বুকের দিকে তাকাল, আঙুলে আদর করল ঠোঁট দিয়ে। উড়ে যাওয়ার কোনো লক্ষণ নেই। ঠিক তখনই পেছনে সেই মহিলা এসে দাঁড়াল। আমিও ভয় পেয়ে পিপিকে মুঠোবন্দী করে নিলাম।

সে বলল, তুমি আমাকে ডাকলে ?

পেছনে ফিরে দেখি মহিলার সাজগোজ একেবারে নেই। মুখের তিলও নেই, জমকালো শাড়িও নেই গায়ে। ঘন ভুরুর নিচে স্বাভাবিক চোখ দুটি, খোলা চুল আর তার মিষ্টি শ্যামল রঙ। পাখিকে ডাকলাম, পিপি।

সেই ডাকে মহিলা কাছে এগিয়ে এল আরো। পিপি তখন আমার হাতের মুঠোয় ডানা ঝাপটাতে লাগল। প্রবল শক্তিতে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছে সে।

পিপি, কি হল তোর ? কিরে, পালিয়ে যেতে চাস ? খাঁচায় থাকবি নে ? ঈর্ষা হচ্ছে ? আমাকে পছন্দ হয় না ? এত রাগ কেন ?

মহিলা এসে আমার হাত ধরল। জানলাম ওর নামও পিপি, সেও আমাকে ডাকছে হাতে হাত ধরে। বললে, পাখিটা ছেড়ে দাও।

পিপি হাতের মধ্যে ছটফট করছে, যেন দানবীয় শক্তিতে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। আমি আরো জোরে চেপে ধরলাম। মহিলা আমাকে পেছনে থেকে জড়িয়ে ধরে আবার বলল, ওকে ছেড়ে দাও। দোহাই তোমার, ওকে ছেড়ে দাও।

আমার মনে হল একটি অজগর আমাকে জড়িয়ে ধরেছে, তার শরীর ও স্বেদবিন্দু ধীরে ধীরে আমাকে লেপ্টে দিচ্ছে, এক রকম মাদকতা আমাকে অবশ করে ছিচ্ছে। আর সেই ফাঁকে পাখিটি কখন আমার হাতের চাপে স্তব্ধ হয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না।

চৈতন্য ফিরে আসতে দেখি জানালার পাশে টাঙানো খাঁচার চারদিকে অনেক পাখি, মৃত পিপি বিছানায় পড়ে আছে। পাখিরা জানালায় বসে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ওদের ডাক এক সময় সাপের হিস হিস শব্দে পরিণত হল। জানালা ও বিছানায় বসা অসংখ্য পাখির হিস হিস ডাকে ঘর ভরে গেল। আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। অসংখ্য পাখি আমাকে ঘিরে চিৎকার করছে, শাসাচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে। আস্তে আস্তে ওরা হিংস্র হয়ে উঠছে। চড়ুই পাখিগুলো যেন আমাকে ঠুকরে খাবে, শালিকরা বুঝি চোখ উপড়ে নেবে, ফিঙেরা বোধ হয় রক্ত পান করবে—ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে আমাকে ঘিরে ধরল। প্রথমে কী করব ভেবে উঠতে পারলাম না। দরজা-জানালা বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকব তারও উপায় নেই। ওরা যে ঢুকে পড়েছে! তাহলে পালাই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে পড়ি। হ্যাঁ, ঠিক তাই।

মৃত পাখিটি ফেলে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। অন্য সব পাখি সঙ্গে সঙ্গে আমার পিছু নিল। মাথার ওপর ঘুরতে ঘুরতে ছুটল ওরা। রিক্সায় উঠলাম আমি। রিক্সার হুডে বসল কিছু। ওয়া ওয়া করে তাড়ালাম কিছু। দু-তিনটাকে হাত দিয়ে ঠেলে দিলাম। চিৎকার করে পিছু নিল অন্য পাখিরা। বাসে ওঠা পর্যন্ত ওরা পিছু ছাড়ল না। ঝাঁকে ঝাঁকে মাথার ওপর ঘুরতে লাগল। আমাকে ভয় দেখাতে লাগল। শাসন করল, শেষ পর্যন্ত হুমকিও দিল।

আমি ঢাকায় চলে এলাম।

আর সেই মহিলা ? ওর ঠিকানা খুঁজছি।

[গল্পগ্রন্থ ঃ নদীর নাম গণতন্ত্র]

সুন্দর মানুষ

মানুষের এক জীবনেও জন্মান্তর হয়। আবার কল্পান্তরেও হতে পারে। সুন্দরও দীর্ঘ দশ বছর ভিক্ষু[1]-জীবন যাপন করে একদিন গেরুয়া পোশাক ছেড়ে বেরিয়ে এল। তার দীর্ঘ সাধনাপূর্ণ ভিক্ষু-জীবনে এমন কিছু অসঙ্গতি কারও নজরে পড়ে নি যে, সে হঠাৎ এমন কাণ্ড করে বসবে!

সবাই জানল যে, সুন্দরের বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। মস্তিষ্কের কোথায়ও গোলযোগ দেখা দিয়েছে। আবার কেউ কেউ ভাবল, অল্প বয়সে কঠোর সাধনার জীবন শুরুই বুঝি এই গুরুতর বিপর্যয়ের কারণ।

ধর্মসাধনায় সে প্রতিটি ব্রত নিয়ম-কানুন নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলত। শুদ্ধ জীবনযাপন করত। অবিরাম ধর্ম-সাধনা, কঠোর নিয়ম, সংযম ও ভিক্ষুদের আচরণীয় পথ অনুসরণ করে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিল। তার এই পরিণতিতে সবাই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন বৈকি!

বসন্তের এক সকালে সুন্দরকে বিহারের[2] ঘাসভরা উঠোনে পায়চারী করতে দেখা গেল। সেখান থেকে অস্থির হয়ে এক সময় গেরুয়া পোশাক ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। সবাই তার এই পরিণতি দেখে নানা কথা বলাবলি শুরু করে। গ্রামের বৃদ্ধরা তার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে কুশলাদি জানতে চায়। কিন্তু চুপচাপ সে। কাউকে কিছু বলে না। কারো প্রতি কোনো অনুযোগ নেই; রাগ-দ্বেষহীন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে পাশ কেটে চলে যায় সে। কোথাও এক জায়গায় স্থির বসে থাকে না, লোকজন দেখলে আস্তে আস্তে একদিকে চলে যায়। কখনো কখনো নির্জন নদী তীরে কখনো বা মাঠের পাশে, বরোজোর পথের ওপর বসে এক দৃষ্ট তাকিয়ে থাকে। ঋজু শির-দাঁড়া হয়ে পদ্মাসনে বসে দূরের পাহাড় কিংবা নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে। খিদে পেলে তিন-চার দিন পর কারো বাড়িতে গিয়ে আসন নিয়ে বসে থাকে। তখন গৃহস্থ বুঝতে পারে তাকে খেতে দেওয়া দরকার।

এভাবে তিন-চার দিন পর পর খাওয়া তার অভ্যেসে পরিণত হয়। বিবাহে, নিমন্ত্রণে, মৃত ব্যক্তির সৎকারে সে রবাহুত চলে যায়। চুপচাপ খেয়ে বেরিয়ে আসে। রাতে বিহারের গোল বারান্দায় ঘুমিয়ে কাটায়। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে নদীর ধারে বা মাঠের নির্জনতায় মিশে যায়।

গ্রামের লোকজন করুণাবশত ডেকে ভাত খেতে দিত প্রথম প্রথম। কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে চুরি করে খাওয়া কিংবা কারণে-অকারণে কাউকে আক্রমণ করার স্বভাবও দেখা যায় না। মানুষের সমাজে সবসময় বাস করেও সে অসহায় একা রয়ে গেল। বিহারের গোল-বারান্দা, নদীর ধার, বরোজের পাশটা তার কাছে অভয়কেন্দ্র। মানুষের জীবনপ্রবাহ দেখে সে নিজের হতভাগ্য জীবনের কথাও ভাবে। মাঝে মাঝে ব্যাকুল হয়ে ওঠে পূর্বজন্মের কোনো স্মৃতি...কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এভাবে বছরের পর বছর কেটে যায়। সুন্দর একদিন কথা বলতে শুরু করে। ধর্মের নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিজের মতো করে দিতে শুরু করে। তার সেই মতামত এত একান্ত এবং কখনো কখনো এত যুক্তিপূর্ণ যে, কেউ তার যুক্তি খণ্ডাবার ভাষা খুঁজে পেত না। তাছাড়া ধর্মের কিছু কিছু বিষয়ে, যেখানে কোনো যুক্তি চলে না, কিংবা স্পর্শকাতর এমন বিষয়ের অবতারণা সে করে বলে কেউ তার বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস পায় না। সুন্দর ভিক্ষু জীবনে বার্মা, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি নানা দেশে ও নানা জায়গায় ঘুরে নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিল, এজন্য সাধারণের পক্ষে তার বিরুদ্ধতা করার যুক্তি ও উপায় ছিল না।

এভাবে কথা বলতে শুরু করার পর গ্রামের লোকজন সুন্দরকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে। বয়স্করা তাকে এড়িয়ে চলে, তরুণরা তাকে ঘিরে ধরে। ফলে এক ধরনের অহংবোধ তার মধ্যে জন্ম নিতে শুরু করে। ঠিক অহংবোধ কিনা বলা মুশকিল। তবে সে এক রকম হঠকারী হয়ে ওঠে আর লোকজনও তাই তাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে।

মাঝে মাঝে সে তরুণদের কাছে তার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করে প্রভাবিত করে তোলে, আবার এক সময় চুপচাপ ধ্যানমগ্ন হয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তখন সবাই তাকে নদীর ধারে, মাঠের পারে ছেড়ে ফিরে যায়।

এরই মধ্যে তার স্বভাবে আর এক পরিবর্তন এল। সে নিজের

ভিক্ষু[1] ঃ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী
বিহার ঃ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের থাকার ঘর ও বৌদ্ধদের ধর্মস্থান।

মনে বিড়বিড় কথা বলতে শুরু করে সারাক্ষণ। খাওয়া-দাওয়া ভুলে যায়। ছয়-সাত দিনের আগে সে বলতে গেলে কিছুই খায় না।

দিনের পর দিন কেটে যায়। বেরিয়ে পড়ে গ্রামান্তরে, মানুষের সঙ্গে কথা বলে। নিজের মতো করে বলে যায় মনুষ্য-জন্ম ও কল্প-কল্পান্তরের কথা। কোনো নিমন্ত্রণে গিয়ে পৌঁছলে সপের মাথায় বসে উদাস হয়ে যায়। কেউ কুশল প্রশ্ন করলে অমলিন হাসিতে উত্তর দেয়। সেই হাসি দেখে অনেকেই ভাবে সুন্দর এ-পৃথিবীর বাসিন্দা নয়। কবে সে এখানে এসেছে, কবে থেকে বসবাস শুরু করেছে, কেউ জানে না—সুন্দর নিজেও জানে না।

মাঝে মাঝে সে সকাল-সন্ধে বিলের পর বিল পাড়ি দিয়ে হাঁটতে থাকে। লোকজন নেই, জনবসতি সেই। শুধু চাষীদের হাল-বলদ, তরমুজ আর ফুটির খেত, মরিচ অড়হড় কলাই খেত পেরিয়ে চলছে তো চলছেই। আস্তে আস্তে বিল পেরিয়ে, খেত পেরিয়ে, নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে থাকে। মাঝে মাঝে কারু কাছ থেকে একটা বিড়ি নিয়ে পর পর কয়েকটি টানে সাবাড় করে মুহূর্তের জন্য নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তবে হুঁকোটা নিয়ে টানতেই বেশি পছন্দ করে আর এক সময় বিলের মাঝে ছায়াদার কোনো গাছের তলায় চিৎপাত শুয়ে চোখ বুজে থাকে। হয়তো ঘুমোয়, হয়তো দিবাস্বপ্নে ভূতগ্রস্ত হয়। কখনো কখনো দোকানের তক্তাপোষে বা বেঞ্চিতেও ঘুমোয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন ভোর থেকে তাকে আর দেখা গেল না। কোথায় উধাও হল, কী হল কেউ জানে না। খোঁজ নেওয়ারও প্রয়োজন কেউ অনুভব করল না। তবে সবাই জানে সে আসবে, দু-চারদিন পর ঠিক ফিরে আসবে। এতে কারু কোনো কাজ আটকে থাকবে না।

তৃতীয় দিন সুন্দর ফিরে এল একটি বাচ্চা কুকুর সঙ্গে নিয়ে। বাচ্চাটি সারাক্ষণ তার পিছু লেগেই আছে। কখনো কোলে নিয়ে বাচ্চা ছেলেদের পিছু নেওয়া হৈ-হল্লোড়ের মধ্যে সে মাথা উঁচু করে গ্রামের পথে হেঁটে চলে। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ায়, ঘুরে দাঁড়াতেই ছেলের দলও দাঁড়িয়ে যায়। মুখে কিছু না বলে, গালাগাল না করে নীরবে প্রতিবাদ করে দাঁড়ায়, অথবা কুকুরছানার মতো তাদের প্রতিও মমত্ব-বোধে অন্ধ হয়ে যায়।

কুকুরছানা সঙ্গী হওয়ার পর থেকে তাকে দুপুরে একবার বিহারে উপস্থিত থাকতে হয়। দুপুর বারোটার মধ্যে ভিক্ষুদের খাওয়া শেষ। তাঁদের এঁটোকাঁটা সংগ্রহ করে বাচ্চাটিকে খাওয়ায় সে। সেই ফাঁকে নিজেরও খাবার জুটে যায়। কিছু না জুটলে পুকুরে নেমে জল খেয়ে নেয়। কারু কাছ থেকে এক গ্লাস জলও ভিক্ষে না চেয়ে হাঁটতে হাঁটতে বরোজের পাশে বড় আমগাছের তলায় গিয়ে সটান শুয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে সারা রাত ঘুমুতে পারে না। যন্ত্রণাদায়ক ঘায়ের মতো অতীতের স্মৃতি মনে পড়ে, নিজের অসহায়ত্বের যাতনা অনুভব করে। তখন খিদেও বেড়ে যায়, তাড়িয়ে নিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে—কতদিন আর জীবন!

সুন্দর নিজের মতো দিনে এক বেলা থেকে সপ্তাহে তিন-চার দিন, তারপর সপ্তাহান্তে এক বার খাওয়ায় অভ্যস্ত করে তোলে বাচ্চাটিকেও। মাত্র অল্পদিনের মধ্যেই কুকুরছানাটি এ-ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ আর কাউকে দোষ দেয় না, ছাড়াছাড়ি হওয়ার চিন্তাও করে না।

আরেক বসন্তের মাদার ফুল ফোটা শেষ হলে বাচ্চাটি জোয়ান কুকুর হয়ে ওঠে। সপ্তাহে এক একদিন আর ভালো লাগে না। একা একা লাফ দিতে পছন্দ করে বলে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য চিৎকার জুড়ে দেয়। সুন্দরেরও আর ভালো লাগে না। কুকুরও এক ছুটে বাজারে গিয়ে তার কুকুর সঙ্গীদের সঙ্গে মারামারি হৈ চৈ করে আসে। তার কুকুর জীবনও তো ফেলনা কিছু নয়। বাজারে গেলে কিছু না কিছু খাবার জোটে। চাইকি কুকুর সমাজ নিয়ে ছোটোখাটো একটা দলও গড়ে তুলতে পারে। কাজেই সে-ও অবুঝ হয়ে ওঠে। তবুও রাতে সুন্দরের পাশাপাশি শোয়, শীতের রাতে একই বিছানায় কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে। বর্ষার দাপট কমে আসতে না আসতেই দেহটা চনমন করে ওঠে। কিন্তু এপর্যন্ত, সুন্দরও যেমন নারী সংসর্গ বর্জিত কুকুরও তাই। হয়তো ছয়দিন ধরে ভাতের মুখ দেখতে না পেয়ে এক ধরনের গোঁয়ার্তুমিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে সুন্দর ও কুকুর। বসন্তের ফুরফুরে হাওয়ায় ওরা আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে।

এসময় সুন্দরকে লোকে কাজে ডাকে। তরমুজ-ফুটি পাকবার সময় তো, রাতে পাহারা দরকার। শেয়াল ও খাটাস নেমে তছনছ করে দেয় খেত।

খাওয়া-দাওয়ার বিনিময়ে সুন্দর পাহারাদার হয়। রাতে শেয়ালগুলো প্রথমে দূর থেকে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি শুরু করে। তারপর নিঃশব্দে

তরমুজ খেতে নেমে আসে। মাঝে মাঝে দূরে নদীর বাঁক থেকে ওরা যেন ডাক দেয়—সুন্দর চলে এসো। তখন সে হঠাৎ আনমনা হয়ে পড়ে। ভয় জাগে মনে। কুকুরটাকে তাড়াতাড়ি কাছে টেনে নেয়। সারা মাঠ তখন নিবিড় এক শূন্যতায়, এক রকম প্রশান্তিতে ঝমঝম ঝমঝম বাজতে থাকে। ঠিক বাজনার শব্দ নয়, তবুও সুন্দরের মধ্যে সবকিছু কেন জানি এলোমেলো হয়ে যায়। তারপর কুকুরটাকে পাঠায় শেয়াল ও খাটাস তাড়াতে। কুকুরও এক দুই চক্কর দিয়ে প্রভুর কাছে এসে শুকনো খড়ের বিছানায় শুয়ে পড়ে। ভোর রাতের দিকে একেবারে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে ফুটি খায় পেট পুরে, তখন নদীর হাওয়া তেতে ওঠে, জুম পোড়া ছাই উড়তে থাকে আকাশ ভরে।

বিকেল হতেই হাওয়া বঙ্গোপসাগরের গন্ধ নিয়ে চারদিক জুড়িয়ে দেয়। বসন্তের সেই ঠাণ্ডা হাওয়া আবার হাসি দিয়ে ডাক দেয় —আমাকে মনে পড়ে? আরেক জন্মে আমি তোমার কি ছিলাম—ভেবে দ্যাখো তো!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেই রাতে গরমে তিষ্ঠানো দায় হয়ে পড়ল। সুন্দর গরমে ঘামে নেয়ে উঠেছে। নদীর দিক থেকে ঝুপ করে হাওয়া দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। কুকুরটাও নেতিয়ে পড়েছে। সারাক্ষণ জিব বের করে ফ্যা ফ্যা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সারারাত শেয়ালের উৎপাত, মাঝে মাঝে শেয়ালগুলো মানুষের মতো কথা বলে ওঠে. অথচ সুন্দর কিছুই বুঝতে পারে না। কুকুরের তাড়া খেয়ে তারা কী যেন বলাবলি করে চলে গেল! আহা সে যদি ঠিক সময়ে বুঝতে পারত তাহলে রমিজের দুধের ছেলেটি এভাবে মারা যেত না। দু-চারটা হাড়গোড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নি। শেয়ালগুলো খুব উৎসব করে খেয়েছিল।

শেষে সে চুপচাপ বিছানায় ফিরে এল। খেয়ে যাক শেয়ালে। সে পদ্মাসন হয়ে বসে মুহূর্তের মধ্যে চলে যায় অচেনা এক দেশে। কোনো এক জন্মে সে শেয়াল হয়ে জন্মেছিল। তখন অন্যান্য শেয়ালদের সঙ্গে শ্মশান, আখখেত, গৃহস্থ বাড়ির আঙিনা থেকে চুরি করে খেত। শেয়াল-জন্মে সে বুঝতে পারত কোথায় ভালো ফসল হয়েছে।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে সুন্দর জেগে ওঠে। ছুটে যায় খেতের দিকে। ইতিমধ্যে শেয়ালেরা অনেক তরমুজ ও ফুটিতে দাঁত বসিয়ে পয়মাল করেছে। শেয়ালরা পানসে তরমুজ ও ফুটি খায় না। দু-এক কামড় দিয়ে ফেলে রাখে। এভাবে রাত প্রায় শেষ হয়ে আসে। ঠিক তখনই জেলেপাড়া থেকে নেমে আসে চোর। চারদিক তখন শান্ত। টিন পিটিয়ে পাহারা দেওয়ার কাজ থেমে গেছে, সব পাহারাদার চোখ বুজে স্বপ্নে ও ঘুমে আচ্ছন্ন। একটি মেয়ে জেলেপাড়া থেকে নেমে এল।

সুন্দরের ঘাসের বিছানার পাশে নুয়ে পড়েছে মেয়েটি। কুকুরটাও ঘুমিয়েছে কি কোথায় গেছে কে জানে? মেয়েটি তার কাছে মিনতি করে চাইল ফুটি ও তরমুজ।

দু দিন ধরে কিছু খেতে পায় নি। সুন্দর এই উপকারটুকু না করলে সে আর প্রাণে বাঁচবে না।

সুন্দরের মায়া হল। কিন্তু পরের জিনিস সে দেবে কি করে? গৃহস্থকে না বলে কিছু দেওয়াতো অন্যায়। মেয়েটি আবার অনুনয় করল, শেয়ালে খাওয়া হলেও চলবে। দাও গো!

ফুটি দিয়েই সুন্দরের মধ্যে অপরাধবোধ ক্রিয়াশীল হল। পরের রাতেও একই ঘটনায় পুনরাবৃত্তি হল। তার শরীর ও মন খিঁচিয়ে উঠল। কেন মেয়েটি তার কাছে আসে! শুধু তরমুজ নাকি আরো কিছু চায়! দেওয়ার মতো কিছুই তো নেই। মাত্র গত রাতেই মেয়েটির সঙ্গে এভাবে পরিচয়। তার মনুষ্যজন্ম থেকে শেয়ালজন্ম ভালো ছিল কিনা সেই তর্কে সে এখনো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে নি। তার ওপর অভিমোহন জেলের বউ এসে তার কাছে সাহায্য চাইছে। মেছুনির শ্যামল যৌবনশ্রীও তাকে তেমন সন্তুষ্ট করতে পারে না। এভাবে পর পর কয়েক রাত তার কাছে এসে পেট পুরে খাওয়া ভিক্ষে চাইছে। এক জন্মের মধ্যে আরেক জন্ম এসে ভীড় করেছে। কুকুরটি নেতিয়ে পড়েছে। অসুখ-বিসুখ করেছে হয়তো। প্রতিদিন খাওয়া কি সহ্য হয়? এতদিন সপ্তাহান্তে খাবার জুটত, এখন দিনে দু-তিন বেলা খাওয়া সহ্য হয় না। সুন্দর ও কুকুর উভয়েই এ নিয়ে আলাপ করে। মাঝে মাঝে শুয়ে শুয়ে ডাক দেয়, আবার ঝিমিয়ে পড়ে, টং[৩]-এর বাইরে কথা বলতে বলতে ঝিমোয়, আগুনও জ্বলতে থাকে। দূরে পাহারা দেয় কামাল, পুষ্প, কাশেম ও পুতু। আরও দূরে কে কে আছে কে জানে! সীমান্ত পাহারা দেয় সৈন্যরা, তবু চোরাকারবার হয়, আবার ধরা পড়ে জেল হয়। ওরা নিজেরাই পাহারা দেয়, নিজেরাই চুরি করে, আবার চোরও ধরে—ওদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে।

টং৩ : পাহারা দেওয়া ইত্যাদি নানা কাজের জন্য তৈরী অস্থায়ী খড়ের ছাউনির চালাঘর।

সুন্দর তিন বেলা খেতে পারে না। পেটের নাড়ীভুঁড়িরা সহ্য করতে পারে না। কুকুরটা তো পারে না বলে নেতিয়ে পড়েই আছে। শেষে সুন্দর ঠিক করল, আর নয়—পালিয়ে যাই।

রাত শেষ হওয়ার আগেই সে খড়ের বিছানা থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে, কিন্তু শরীর চলতে চায় না। বাতাসে নুয়ে পড়া তরমুজ লতার মতো এলিয়ে পড়ে। সেই মেয়েটি আবার এল। গোটা দুই তরমুজ দাও না গো? সুন্দর প্রথমে চিৎকার করে প্রতিবাদ করবে ভাবে। চিৎকার করে বলবে বুঝি, ভাগ ভাগ। যেন শেয়াল তাড়াচ্ছে আরকি!

জেলে মেয়ে হরসুন্দরী নাছোড়বান্দা। দে না দুটো, বাঁচিয়ে রাখ আমারে। আমিও তোকে বাঁচাব।

হরসুন্দরী ফুটি চাইতে চাইতে ওর গায়ের ওপর ঢলে পরে। তার গায়ে মাছ মাছ গন্ধ। নদীতে মাছ নেই। জাল নেই জেলের, পানিও নেই নদীতে। হাওয়ায় হাওয়ায় যেন বাষ্প হয়ে গেছে খালবিলের জল। পুঁজি নেই যে শুঁটকির ব্যবসা করবে। দে না দু-চারটি ফুটি, তোর কথা জীবন জীবন মনে থাকবে। আরেক জীবনে হলেও তোর ঋণ শোধ করব।

সুন্দর চুপচাপ বসে বসে শোনে। হরসুন্দরী তার কানের কাছে গিয়ে আবার বলে আর সে বধিরের মতো কিছুই শুনতে পায় না। বসন্তের হাওয়ার মতো তো সে গন্ধ বয়ে বেড়াতে পারে না। সূর্যের তেজ নিয়ে চাঁদের মতো মিষ্টি আলো বিকিরণও করতে পারে না। সে যেন শুধু দুর্গন্ধের পাঁকে পাঁকে জড়িয়ে পড়ে। তার অতীত জীবন একবার উঠে আসে, আবার নানা স্মৃতি ভেসে বেড়ায়।

পরদিন থেকে সুন্দর ভালো মতোই অসুখে পড়ল। কুকুরটাও পড়েছে নেতিয়ে। সুন্দর শুয়ে থাকে তরমুজ খেতের টঙের মাচায়। কুকুরটাও। খেতের মালিকের লোক ভাত নিয়ে আসে। সে চুপচাপ পড়ে থাকে। খেতের মালিক পাকা ফুটি তুলে বাজারে নিয়ে যায়, যাওয়ার সময় বলে যায় সব দেখে-শুনে ঠিকঠাক রাখতে। সে আচ্ছন্নের মতো ফুটির লতাগুল্মের গলা জড়িয়ে ধরে আশ্রয় খোঁজে।

পরদিন আর শক্তি থাকে না পাহারা দেওয়ার। বসন্তের হাওয়া ভেসে যায় খেতের ওপর দিয়ে। জুমপোড়া ছাই উড়ে যায়। দাঁড় বেয়ে নৌকো চলে উজান দিকে, জোয়ার আসে হাওয়া নিয়ে। সুন্দর পড়ে থাকে। কুকুরটাও শুয়ে শুয়ে বসন্তের দিন গোনে। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে সুন্দর, কষ্ট করে উঠে ভাত খেতে বসে, কিন্তু এক গ্রাসও

মুখে তুলতে পারে না। পেটটা যেন দম মেরে আছে। কুকুরও খায় না। সেই রাতে পাহারা দেওয়া আর হয়ে ওঠে না। কুকুরটা লেংচাতে লেংচাতে শেয়াল তাড়িয়ে আসে।

সুন্দর খোলা আকাশের নিচে শুকনো খড়ের শয্যায় পড়ে থাকে। কোনো এক জন্মে সে হয়তো মানুষরূপে জন্মেছিল, মানুষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছিল, প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়েছিল--আজ তারই প্রায়শ্চিত্ত করছে। হয়তো কুড়োল হাতে পান্থপাদপ কেটেছিল, উপকারী গাছের ডালপালা কেটে ন্যাড়া ও উলঙ্গ করেছিল। বিকেলের আকাশ ডাক দেয়, সে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে। সুন্দর অনড় পড়ে থাকে তবুও।

রাত বাড়তে থাকে। শেয়াল এসে খেতের ফসল খেয়ে যায়। কুকুরটার ডাকও শোনা যায় না। সুন্দর খড়ের বিছানায় পড়ে থাকে। তবুও তার একরকম ভালো লাগে। শরীরে চটচটে উষ্ণতা অনুভব করে, জ্বর আসে। শেয়াল এসে তার গা চেটেপুটে দেয়? অথবা তার কুকুর বন্ধু, অথবা হরসুন্দরী কিনা কে জানে। হয়তো জ্বরের ঘোরে হরসুন্দরী এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে, ডেকে নিয়ে যেতে চেয়েছে নিজের ঘরে। হয়তো কুকুরটা খেঁকিয়ে উঠেছে হরসুন্দরীর প্রতি, অথবা কী কী ঘটেছে মনে করতে পারে না কিছুই। তেষ্টায় জল দিয়েছে যেন কে? আর কিছুই মনে পড়ে না। বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কয়েকদিন পর সুন্দর পাড়ার দোকানের গুদাম ঘরে আশ্রয় নেয়। দু-একজন এসে তাকে দেখে। হরসুন্দরী মাছ বেচতে এসে খবর নিয়ে যায়। বৃষ্টি হয়ে গেছে কয়েকদিন। মাছেরা ডিম ছাড়তে নদীর উজানে ছোটে। হাতজাল নিয়ে লোকজন নদী ও খালে ছোটাছুটি করে। সে প্রলাপ বকতে থাকে বিড়বিড় করে। প্রলাপের একটি কথাই শুধু বোঝা যায়, মানুষ মানুষ। আর কেউ দেখে না সুন্দরকে। সে অসুস্থ হয়েও কাউকে কিছু বলে না, সাহায্যও চায় না। মাঝে মাঝে কুকুরটাকে ডাকে, কোনো মতে উঠে পানি খাওয়ায়, নিজেও খায়। হরসুন্দরী এলে তার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নেয় সে। জীবনে তার একটি পাপ খেতের মালিককে না বলে হরসুন্দরীকে ফুটি দেওয়া, তবুও তার সান্ত্বনা শেয়ালের উচ্ছিষ্ট দিয়ে সে হরসুন্দরীকে বাঁচিয়েছে। নইলে হয়তো হরসুন্দরী চুরি করত, অথবা খেতে না পেয়ে মরতে বসত।

কিন্তু দোকানের গুদামে তো এভাবে থাকা যায় না। দোকানদার মঝু একজন রুগ্‌ণ লোককে ওখানে রাখতে চায় না। এক সময় সে দোকান পাহারা দিত মঝুর সঙ্গে। সেই সুবাদে আর কদিন সহ্য করবে মঝু। সুন্দর দিনের পর দিন তার পুরোনো দিনের স্মৃতি ফিরে পায়। সবকিছু মনে পড়ে যায়। মা-বাবাকে হারিয়ে খুব ছোটোকাল থেকে অসহায় অকূলে পড়েছিল। মামার বাড়ি, আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকেও একদিন বেরিয়ে পড়ল। এক সময় শুরু হল শ্রমণ[৩] জীবন। সে একাগ্র হয়ে সাধকের জীবন খুঁজল। কিন্তু নিষ্ঠুরভাবে সে-জীবন থেকেও সে প্রতাড়িত হয়। তার মস্তিষ্কে গোলযোগ শুরু হল। এখন সে পড়ে আছে একটি গুদাম ঘরে, তাকে দেখার কেউ নেই, মঝু বিরক্ত হচ্ছে, হরসুন্দরী তাকে করুণা করছে।

আস্তে আস্তে ক্ষুধা তাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে গেল। খুব ইচ্ছে করছে থালাভর্তি ভাত নিয়ে বসে। পিঁড়ি পেতে শাক-সবজী ও ডাল-মাছ দিয়ে খায়! ডালে একটু ফোড়ন, গরমভাতে একটু ঘি, পুদিনা পাতার চাটনি, শুঁটকির ঝাল—কতদিন সে পেট ভরে খেতে পায় না, কেউ মমতা ভরে খেতে ডাকে না, এটা নাও ওটা খাও বলে কৃত্রিম রাগে শাসন করে না কেউ। খিদেয় ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে, গা গুলিয়ে বমি আসে।

আস্তে আস্তে সন্ধে হয়ে আসে। মঝু দূর থেকে দেখে যায়, গজগজ করে। কুকুরটা নেতিয়ে আছে। আপদটাকে প্রথমে ঘরে ঢুকতে দেয় নি মঝু। পরে করুণাবশত হোক কিংবা পাহারাদারের সঙ্গী ভেবে হোক রেহাই দিয়েছে। পিট পিট তাকিয়েও দেখে না আর, অনেকক্ষণ আগে বাইরে নিয়ে পানি খাইয়ে এনেছিল সুন্দর, সেই থেকে পড়ে থেকে এ-কাত ও-কাত হয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে। সুন্দর ভাবে এক জায়গায় ঠায় পড়ে বেদম ঘুমাচ্ছে নাকি তার মতো মটকা মেরে পড়ে আছে কে জানে! আরেক জীবনে কুকুরটি তার বন্ধু ছিল হয়তো, হয়তো মনে পড়ে যায় কুকুর জন্মের মতো এক জীবনের কথা।

অনেক কষ্টে উঠল সে। শরীর চলে না, দুলছে। কুকুরটাকে ডেকে তুলল, বেরিয়ে গেল মঝুর সামনে দিয়ে। মঝু একবার আড়চোখে তাকাল শুধু, কিছু বলল না। ভাবল আবার তো আসবে, যাবে আর কোথায়! বিহারে গিয়ে লাভ নেই, রাতে সেখানে খাবার মিলবে না। কার বাড়িতে যাবে? সত্যিই যাবেই বা কোথায়? যখন সে শ্রমণ ছিল

---

[৩] শ্রমণ : ভিক্ষু জীবনের পূর্ব ধাপ। অল্পবয়সী গৃহত্যাগী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

গ্রামের সবাই তাকে শ্রদ্ধা করত। পাত্র ভরে অন্ন দিত, বড়-ছোট সবাই সষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করত, উৎকৃষ্ট খাবার দিত সকাল ও দুপুরে। রাতে তো কিছু খাওয়ার নিয়ম ছিল না—সাধনা করলে তার দরকারও পড়ে না।

আজ কতদিন ধরে ভাত খায় না সে। কতদিন তাও মনে পড়ে না। শরীর গুলিয়ে পিত্তি বেরিয়ে আসে। পেট আর পিঠের চামড়া এক হয়ে গেছে, পেটের ভেতরে কিছু চালান করতে না পারলে সেই চামড়া খুলবে না। খাওয়ার জন্য সে হন্যে হয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরতে শুরু করল। মুখ ফুটে বলতেও পারে না। এখন তার মস্তিষ্ক ক্রিয়াশীল, তার গত এবং উদভ্রান্ত জীবনের সবকিছু ভাসছে চোখের সামনে। তার শ্রমণ জীবনের শুদ্ধাচার, মস্তিষ্ক-বিকৃতির জন্য শ্রমণ জীবন ত্যাগ—সবই মনে পড়ে। জীবনকুমারের বাড়িতে গেল সুন্দর। বাড়ির সবাই খেয়ে নিয়েছে। কাজেই তার সঙ্গে দু-চারটা কথা বলে তাকে বিদায় করে দিল। সোনাদের বাড়িতে গেলে প্রথমে তারা হুঁকোটা বাড়িয়ে দেয় তার হাতে। খালি পেটে তামাক খেলে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড ঘটে যাবে সে জানে। কিন্তু লোভ সামলানো মুশকিল। বসন্তের বাড়িতে সোজা না করেছিল। এভাবে আরও কয়েক বাড়িতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল।

চরে তরমুজ-ফুটিও নেই যে গিয়ে হাত পাতবে। বোশেখ শেষ, জষ্টির ঝড়-বাদলা শুরু হয়েছে বর্ষার মতো। যাদের বাড়িতে সে কাজ করেছিল তারাও তার দিকে তাকায় না, ভাবে আপদটা গেলে বাঁচি। তাছাড়া এখন তো সে সম্পূর্ণ সুস্থ, সবকিছু মনে করতে পারে। কুকুরটাও তাকে বুঝতে শিখেছে, লেংচাতে লেংচাতেও পিছু পিছু হাঁটছে, পাড়ার লোকজন যে তার দিকে নজর দিচ্ছে না তা বুঝে নিতে তার কষ্ট হয় না।

অনেক ভাবল সে। হরসুন্দরী একদিন না খেয়ে মরার কথা বলে সাহায্য চেয়েছিল বলে সহ্য করতে পারে নি। আর একদিন এসে জীবনের কথা শুনিয়েছিল, অন্যদিন যৌবন-ধর্মের শিক্ষা দিতে চেয়েছিল। অনেক ভাবল সে। অনেক ভেবে বিহারে পৌঁছল গভীর রাতে। খিদেয় তখন তার বোধ-বুদ্ধি ও সংজ্ঞা নেই। কুকুরটাও আগেভাগে গিয়ে উঠেছে বারান্দায়।

সিঁড়ির গোড়া বেয়ে মালতীলতার ঝাড় উঠেছে। কামিনী ও অশোক গাছের সারি দাঁড়িয়ে আছে বারান্দা ধরে। বিহারের দেয়ালের গায়ে গৌতমের জন্ম ও জীবন-কাহিনী ফ্রেসকো করা। বুদ্ধের পাঁজর-সর্বস্ব

গান্ধারার মূর্তিটির দিকে নিজের অজান্তে মনে মনে সে এগিয়ে গেল। সেই আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধের একান্ত প্রিয় সহচর ছিলেন ভিক্ষু আনন্দ। আর এই জন্মে তার নাম কেন সুন্দর হল? কুকুরটা কেন তার কাছছাড়া হয় না?

আস্তে আস্তে সে বিহারের গোলবারান্দায় উঠে তাকাল। গোলবারান্দার পেছনে চলে গেল। দেয়ালের গায়ের ফ্রেসকোর গল্প তাকে পেয়ে বসল। চণ্ডালিকা জলদান করছে তৃষ্ণার্ত ভিক্ষু আনন্দকে। গণ্ডুস ভরে পান করলেন তিনি। সেই চণ্ডালিকা ভুল বুঝল, মোহ এসে গ্রাস করল চণ্ডালিকাকে, ভাবল সেই বুঝি ভালোবাসা!

সুন্দর শুয়ে পড়ল সেখানে। কুকুরটা কোথায় কে জানে! জ্বরে-তৃষ্ণায় বুক ফেটে যায়। ওঠার শক্তি নেই—হরসুন্দরীর কথা মনে পড়ে। এপাশ ওপাশ করে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, দেয়ালের গায়ের কাহিনীর ভগ্নাংশ—কুকুরজাতক, জন্ম-জন্মান্তরের কাহিনী—কল্পান্ত শুরু হয়ে যায়। হরসুন্দরী ছুটে আসে বুঝি তাকে দেখতে!

রাত কেটে যায়। সকাল হতেই ঘুম আসে চোখে। সারাদিন আর হুঁশ নেই। লোকজন বিহারে এসে তাকে দেখে যায়। সে বেঁহুশ পড়ে থাকে। দিনের পর দিন কেটে যায়, আবার রাত নামে। সে স্বপ্নে দেখে--কে যেন তাকে গণ্ডুস ভরে জলদান করছে। তার সমস্ত শরীর শীতল স্পর্শে জুড়িয়ে যায়। কে যেন আদর করে ডাল-ভাত তুলে ধরে মুখের কাছে। তৃপ্তি ভরে সে খায়। দু মুঠো গরম ভাত, ডাল শাক মাছ—জীবনে এত তৃপ্তি ভরে সে কোনোদিন খায় নি। ঘোমটা মাথায় হরসুন্দরী তাকে খেতে দিয়েছে। এত মমতা কেউ তাকে কখনো দেখায় নি, এত ক্ষুধা কোনোদিন অনুভব করে নি, তৃপ্তিও পায় নি কোনোদিন। হরসুন্দরী ডাকল, আর কি খেতে ইচ্ছা করে বলো। পেট ভরেছে তো!

এই অবস্থায় এক রাতে ওষুধ-পথ্য কিছু না পেয়ে পাঁচ দিন থাকার পর সুন্দরের মৃত্যু হল। একই সময়ে কুকুরটিও গেল। ভোরে বিহারে আগত সবাই সে-দৃশ্য দেখল--কুকুরকে জড়িয়ে ধরে সুন্দরের মৃতদেহ পড়ে আছে।

[গল্পগ্রন্থ ঃ নদীর নাম গণতন্ত্র]

অভয়ারণ্যের খোঁজে

প্রথম পরিচ্ছেদ

চৈত্রের জুম-পোড়া দুপুরের গরমে ঘুম থেকে জেগে উঠল মহামায়া। চারদিকে খা খা পোড়া গরম। ধোঁয়ায় তামাটে আকাশ, তাতানো মাটি--খাল বিল এমন কি হাওয়াও গরমে পুড়ছে। তখন মহামায়া কাঁচা ঘুম থেকে জেগে তাকাতেই দেখে তিনটি মরা পাখি পড়ে আছে ঘরের মেঝেয়, মহামায়া আঁৎকে বিছানায় উঠে বসল। এমন অনাসৃষ্টি আগে সে কখনো দেখে নি।

মরা পাখি এল কোত্থেকে!

মুহূর্তেই মহামায়ার কাঁচা ঘুমের আলসেমি ও গরমের ক্লান্তি কেটে গেল। বিছানায় পা গুটিয়ে কপোল ও গালের ঘাম মুছে ডাকল, চিনি চিনি!

চিনি তখনো কলেজ থেকে ফেরে নি। কলেজের টানা বারান্দার পাশের বড় বড় সেগুনের নিচে, দুটি ছাতিম গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সকলের সঙ্গে চিনিও চুপচাপ ঘামছে। কলেজে দুপুর-ছুটি তখন—হাওয়া নেই, জুম-পোড়া ধোঁয়ার বিরাম নেই, রোদেরও কিছু ঘাটতি নেই। সেই অসচরাচর গরমে সকলের মতো চিনিও ঘামছে। মুক্তি যুদ্ধের পরের বছর। জুম চাষীরা মন দিয়েছে চাষবাসে—চৈত্র-সংক্রান্তির আগেই জুম-পোড়া শেষ করা চাই। চারদিক আগুন ও রোদের তাপে একাকার। অস্বস্তিতে ও ঘেন্নায় মহামায়া বিছানায় উঠে বসল। পিঠের শাড়ি ভিজেছে, পাটি ভিজে কালচে হয়ে গেছে--সারা গায়ে ঘামের গন্ধ। শোয়ার সময় দক্ষিণের জানালাটা খুলে রেখেছিল মহামায়া, বিছানা থেকে নেমে কাছে গিয়ে দেখে জানালার লোহার পাতলা জাল ছেঁড়া--মনে হয় বাইরের থেকে ঘাই মেরে ছিঁড়েছে। মহামায়া অস্থির পায়চারী করতে করতে আবার জানালার কাছে ছুটে গেল, কিন্তু কী করবে বুঝে উঠতে পারল না।

জানালায় দাঁড়িয়ে গাছপালার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে মাহাগায়া দেখল বিল। বিল শেষ হয়েছে পুবের পাহাড়ের গায়ে, তারপর পাহাড়-পর্বতে ঘেরা ঘন বন, বনের সবুজ ঢেউ মিশেছে দিগন্তের একচ্ছত্র নীল আকাশে। বিলের মাঝে মাঝে বড় বড় দিঘি আছে, মাঝে আছে জলাভূমি, হোগলার

বন, নল-খাগড়া ও দামড়া ঘাসের জঙ্গল। সেখানে শীতকালে আসে যাযাবর পাখি, শীতের শেষে তারা আবার ফিরে যায়, তারপর সারা বছর দাপিয়ে বেড়ায় ডাহুক, কাঁচিচোর, জলপিপি, খোড়ল হাঁস, বক ও সারস। জলাভূমি বাদে আবাদি জমিতে ধান হয়, ধানজমিতে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে সোনালি ডানার চিল উড়ে উড়ে মাছ খোঁজে, বর্ষায় সেই বিল থাকে থৈ থৈ টালমাটাল।

মহামায়া মরা পাখিদের নিয়ে পড়ল মুশকিলে। লাঠি দিয়ে ঝেঁটিয়ে উঠোনের কোণে ফেলে দিয়ে আসবে? তখনও মরে শক্ত কাঠ হয়ে ওঠে নি। ঘটনাটা কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে জানিয়ে বিচার চাইবে কিনা ভাবল সে, নাকি ছেলের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, অথবা চিনি কলেজ থেকে আসুক।

দেয়ালের সঙ্গে গা-হেলান দিয়ে দাঁড়াল মহামায়া, ঘরের প্রতিটি জিনিষপত্র ঠিকঠাক আছে, পোষা বেড়ালটা বারান্দার ছায়ায় কুণ্ডলি মেরে ঘুমুচ্ছে, কোদালটা তেমনি কাৎ হয়ে পড়ে আছে রান্নাঘরের পাশে উঠোনের কোণে এবং ছাই ফেলার ভাঙা কুলো—মহামায়া সেখান থেকে চোখ সরিয়ে আনল। আস্তে আস্তে দেয়ালের পাশ থেকে সরে এসে মরা পাখির ওপর ঝুঁকে দেখল, ডানা ধরে তুলল একটা পাখি, এক হাতে নাকে আঁচল চাপা দিল। তবুও গা গুলিয়ে বমির ঢেউ এল, শরীর কেঁপে উঠল ঘেন্নায়। মহামায়া হাঁটতে হাঁটতে পাখি ধরা বাঁ হাতখানা নিরাপদে বাড়িয়ে ধরল—যেন ওতে স্পর্শ এড়ানো যায়, এবং ডান হাতে শাড়ির কোচা ধরে ধরে ঘর পেরিয়ে চলল উঠোনের দিকে।

ঠিক তখনই কলেজ থেকে ফিরে ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢুকল চিনি। বইপত্র রেখে মায়ের মুখোমুখি দাঁড়াতেই দেখে কি মরা পাখি! চিনির সারা শরীর ঘামে জবজব, ব্লাউজ ভিজে গেছে জায়গায় জায়গায়, কোমরের শাড়ি আর পেটিকোটের কাছাও ভিজে একশা।

চিনি বললে, মা, মরা পাখি কেন? কোত্থেকে এল?

মহামায়া আঁচল-চাপা দেওয়া মুখে বললে, জানালার জাল ছিঁড়ছে, নীলকণ্ঠ পাখি ঘরটা নরক গুলজার করল।

চিনি জানালায় ছুটে গেল, ছেঁড়া জালের ফোঁকর দেখল—কী সাংঘাতিক! কেউ জাল ছিঁড়ে ঢুকিয়ে দেয় নি তো!

জানালা থেকে ফিরে এসে চিনি মায়ের হাত থেকে রাখা মরা পাখির কাছে হাঁটু গেঁড়ে বসল—ডানার কী সুন্দর নীলকালো রঙ! ছলছল চোখে মনে মনে বিড় বিড় করে বলল, কেন এল। কী করে এল; মাগো, আমি মরে যাবো!

মহামায়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়ের কাণ্ড দেখে ধমক দেবে কী, নিজেই কেমন আনমনা হয়ে বলল, নিয়ে আয় মা, ফেলে দেই।

চিনি আস্তে আস্তে শোক সংবরণ করল, বাঁ হাত তুলে ব্লাউজের হাতায় চোখ পুছে পাখিগুলো হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে চলল। উঠোন পেরিয়ে চাঁপা গাছের তলায় কোদাল দিয়ে খুঁড়ল মাটি। মাটি খুঁড়তে চিনির হাত কাঁপছে, এলিয়ে পড়েছে চুল, চৈত্রের শুকনো বাতাস মাটির রস শুষে উষর করে রেখেছে, কোদালের প্রতি কোপে ওঠা নিরস মাটির ধুলো আর ভ্যাপসা গরমে চিনি ক্লান্ত, দরদর ঘাম ঝরছে, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ। শুকনো গলা ভেজাতে ঢোক গিলল সে। একবারে ভিজল না।

চিনি বিশ্রাম নিতে বসল, তারপর যত্ন করে প্রিয়জনের কবরে মাটি দেওয়ার মতো মমতা ভরে পাখিদের সমাহিত করল, বিড়বিড় করে প্রার্থনা জানাল—সব পাখি গভীর সুখে সুখী হোক, জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক...।

মহামায়া তখন পুকুরে চান করতে গেছে। চিনি আরও কিছুক্ষণ উঠোনের কোণের জাম গাছের নিচে বসে রইল...সারা শরীরে ঘাম, অবসাদ ও বিষণ্ণতা, কপালের শিরা দপদপ করছে যন্ত্রণায়, বুকের ভেতর যেন পাথর চেপে বসে আছে। আরও কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে মাথা তুলল চিনি, অবসাদ তাড়াতে মন শক্ত করে পুকুর ঘাটে চলল চান করতে! অন্ততঃ চান করে যদি সুখ মেলে!

চান করতে করতে চিনি ভাবল, ঘরের ভেতর মরা নীলকণ্ঠ পাখি কি করে এল, জানলার জাল ছিঁড়ল কি করে? মা একবার পাড়ার বখাটে ছেলেদের দোষ দিয়ে বকবক করল—আবার ভাবল, পাখির রাজ্যে মড়ক লাগে নি তো! চিনি প্রতিদিন কলেজে যেতে যেতে দু'একটা নীলকণ্ঠ বুলবুলি ফিঙে দেখে। একদিন নীলকণ্ঠের শূন্যে ওড়ার কসরৎ দেখেছে, সূর্যালোকে ঝলসে উঠেছে নীল পালকের বাহার... চিনির বুকের ভেতর তোলপাড় করে ওঠে অদৃশ্য অনাগত ভালোবাসার আবেশ...কতদিন সে নীলকণ্ঠের সঙ্গে নিজের সৌভাগ্যকে মিলিয়ে দেখেছে, বর প্রার্থনা করেছে ছেলেমানুষী ভালোবাসার পূর্ণতার জন্য...। সে জানে নীলকণ্ঠ পাখি সৌভাগ্যের প্রতীক।

চান করতে করতে জলের ওপর তালগাছের ছায়ার নিচে সরে যায় চিনি, পোড়া রোদ থেকে বাঁচতে চায় সে। জুম-পোড়া ছাই উড়ে আসে, চোখে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। চোখের মনি ঠাণ্ডা করার জন্য সে ডুব দিয়ে চোখ খুলে তাকায়, চোখের সামনে আঙুল মেলে দেখে, নিজের রূপে নিজে মুগ্ধ হয়, বুকের দিকে তাকায়...নিঃশ্বাস যখন আর রাখতে পারে না তখন ভেসে ওঠে। গলা-জলে ডুবে উরু, কোমর ও বুক থেকে ঘাম ও ময়লা সাফ করে। নিজেকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে বুকটা একসময় ভারী হয়ে যায়...ভালোবাসা খোঁজে চিনি, তখন নিজের স্তন দু'টি পাথরের মতো ভারবহ মনে হয়, করুণ ও অসহায় মনে করে নিজেকে...গলা-জলে ডুবে শরীর সাফ করতে করতে ভাবনায় ডুবে যায়।

ঘরে এসে শব্দ করে চুল ঝাড়ে চিনি, ঘুমুতে চেষ্টা করে, আবার মায়ের সঙ্গে কথা বলে শরীর-মন হাল্কা করতে সচেষ্ট হয়, অনাগত ভালোবাসার ভারে কষ্ট পায় ··মেয়েমানুষী যন্ত্রণায় ভোগে চিনি।

মা বলে, কী মনে হয় তোর।

বালিশে মুখ গুঁজে উত্তর দেয় চিনি। মা বুঝতে পারে না।

মা আবার বলে, পাড়ার ছেলেদের কাণ্ড মনে হয়?

না বোধ'য়—এবার পরিষ্কার জবাব দেয়।

কলেজে যেতে কেউ ত্যক্ত করে তোকে?

না তো।

লায়লার সঙ্গে যাস তো?

হ্যাঁ।

কলেজে যেতে বড় রাস্তার টেলিগ্রাফের তার, বিলের তালপুকুর, রাস্তার ধারের বটপাকুড়···চিনি সবখানে নতুন নতুন পাখি খুঁজে বেড়ায়। দেখে আলের ওপর দু'পা তুলে তাকিয়ে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে বেজি। কী নিষ্পাপ চোখ-মুখ। তাড়াহুড়া নেই, ভয়ডর নেই—মানুষই যেন তার করুণার পাত্র। মাঝে মাঝে ধানখেতে ফরফর সরসর ডাকে মাছেরা, মাছরাঙা বসে বসে ঝিমোয়, গর্তের মুখে নতুন মাটি তুলে কাঁকড়া রোদ পোহায়—চিনি ও লায়লা দেখে দেখে জল্পনা-কল্পনা করে। মাঝে মাঝে শঙ্খচিলের ডাক শুনে চিনি নিজের অস্তিত্ব ভুলে যায়, তখন লায়লা কাঁধে হাত রেখে স্বপ্নলোক থেকে ফিরিয়ে আনে তাকে। কখনো কখনো শাদা বকের ঝাঁক উড়ে যায় বিলের ওপর দিয়ে, কাস্তের মতো সারি করে পাখিগুলো একসময় পাহাড়ের দিকে বহু দূরে মিশে যায়। চিনি ও লায়লার ইচ্ছে করে বিলটা ঘুরে আসে। হেমন্তের শুকনো মরসুমে বিলের গোপাট ধরে হাঁটতে হাঁটতে কোনোদিন সে হারিয়ে যায় নি। হেমন্তের শুরুতেই দলে দলে শিকারীরা বিলে নামবে, সারা শীতকাল ধরে চলবে বন্দুকের গুলি, অতিথি পাখির ওপর অত্যাচার····তখন পাখিদের সে কী চিৎকার!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন শনিবার। চিনির ঘুম ভাঙল আরো ভোরে। ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে দেখে উঠোনে নীলপুচ্ছ মরা বাঁশপতি। চিনি ডুকরে কেঁদে ডাকল, ওমা দেখে যা-ও····।

থমথমে সকাল। এক ফোঁটা হাওয়া নেই, এক চিলতে মেঘ নেই, কিন্তু জুম-পোড়া ধোঁয়ায় দজ্জাল হয়ে আছে আকাশ। চিনি কষ্ট করে নিঃশ্বাস নিয়ে চারদিকে তাকাল····ধোঁয়ায় তামাটে পাহাড়, বিলের ওপর ফালি ফালি ধোঁয়ার পর্দা, এবং সমস্ত গ্রামখানি যেন কেমন অস্বস্তিতে ভুগছে। চিনিদের গ্রাম তো টিলার ওপর, পাড়ার রাস্তা তো গড়ের মতো নিচু···মরা পাখি দেখে চিনি ডুকরে কেঁদে ওঠে এবং মনে মনে জপ করে সে আর বাঁচবে না।

তবুও সব ভাবনা ছেড়ে একসময় সে কলেজে যেতে তৈরি হল। সপ্তাহে এই একটি দিনে সকালে ক্লাশ বসে····কী রোমাঞ্চকর এই একটি শনিবার। কলেজে যাওয়ার সময় লায়লা বলল, ওদের ভিটেয় দু'টো মরা বাঁশপাতি পাখি পাওয়া গেছে। এবার চিনি সত্যি সত্যি ভয় পেল। জানলা ছিঁড়ে টাকা পাখি, উঠোনে পড়ে থাকা মরা বাঁশপাতি··· সবই বুঝি এক সূত্রে গাঁথা!

হাঁটতে হাঁটতে ওরা বিলের মাঝে বড় রাস্তায় পেঁছিল····দেখা যায় টিলার ওপর কলেজ, ধপধপে দেওয়াল, রোদ-চকচক টিনের চাল, বটগাছের আড়ালে উঁচু পাড় দিঘি····সবুজের ফাঁকে, তরুণ সূর্যের তেজে ধোঁয়াশা পাহাড়ের পটভূমিতে কলেজের টিলা দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন টেলিগ্রাফের তারে একটা নীলকন্ঠ পাখিও ওরা দেখতে পেল না। মানুষের ঐ এক স্বভাব, সব ঘটনায় সব চিন্তায় ঘুরে-ঘুরে জড়িয়ে পড়ে নিজে, একই ভাবনায় ঘুরে-ফিরে আবর্তিত হয়। তখন সকাল, প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে, কলেজের আঙিনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দু'-তিন জন মেয়ে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দু'দল ছেলে····চিনিদের দেখে দারোয়ান ছাত্রীদের মিলনায়তন খুলে দিল।

প্রথমে চিনি এগিয়ে গেল, দরজার সেই পুরোনো পর্দাটা সরিয়ে ঢুকতেই সামনে মরা পাখি। এক পা পিছিয়ে বোবার মতো দাঁড়িয়ে পড়ল সে। পেছন থেকে লায়লা কিছুই বুঝতে পারে নি প্রথমে, শুধু চিনির হাত থেকে পড়ে যাওয়া পর্দার কাঁপন দেখল তারপর ভয়ে ভয়ে পর্দা সরিয়ে দেখে কিছু নেই। লায়লা অবাক হয়ে বলল, কিরে কি হল তোর?

বলল, বাঁশপাতি, মরা পাখি।

কোথায়?

চিনি আস্তে আস্তে দরকার চৌকাঠ পেরিয়ে আবার মেঝের দিকে তাকাল···তখন তার নিজের বলতে কিছু নেই, তখন হৃতসর্বস্ব একজন চিনি শূন্য মাঠে একাকী···বলল, দেখেছি, এইমাত্র···চিনি আস্তে আস্তে দরজার ভেতরে তাকিয়ে দেখল।

লায়লা জানতে চাইল, আচ্ছা, বলতো তোর কি হয়েছে?

চিনি বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই তেমন করে বলতে পারল না। মানুষ কি তার বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে সবসময় সবকিছু বিচার করতে পেরেছে? ঠিক তখনই একটা নীলকন্ঠ পাখি উড়ে এসে বসল জানালার কপাটে···ওরা দু'জনেই চুপচাপ তাকিয়ে আছে, হাত ধরাধরি করে গায়ে গায়ে মিশে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ—যেন নিজেরাই উড়ে যাবে পাখি হয়ে।

পাখিটি ওদের দিকে একবার সন্দেহের চোখে তাকাল, হয়তো ভাবলে, মানুষ মূলত অসহায় জীব, হানাহানি করে, আন্দোলন করে, এবং মানুষের মধ্যে এই স্বভাব এতই রপ্ত হয়ে গেছে যে তারা প্রতিপক্ষ খুঁজে না পেলে নিজেকেই নিজে হুমকি দিয়ে বসে···মানুষ মূলত অসহায় প্রাণী।

জানালায় পাখি দেখে চিনি সঙ্গে সঙ্গে বর প্রার্থনা করল, পাখিটিও যেন তার প্রতি করুণাবশতঃ ঘাড় কাৎ করে তাকাল। লায়লা বলল, তোকে দেখছে, তোকে বর দিতে এসেছে, তোদের বাড়িতে কবর দেওয়া পাখির খবর পেয়ে তোকে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছে।

ঠিক তখন ঢং ঢং করে কলেজের ঘন্টা পেটার শব্দ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে সব ভাবনা-চিন্তা ফেলে ওরা ক্লাসের দিকে ছুটল। কিন্তু ক্লাসের দিকে যেতেই ছাত্রদের হৈ চৈ শুনে চিনি প্রমাদ গুনল···আবার মরা পাখি নয়তো, আস্ত একটা শকুন যদি হয়? কেউ বিপদে পড়ে নি তো, কিংবা হরতাল!

ক্লাসের ভেতর একটা মরা বাঁশপাতি পাখিকে ঘিরে হৈ চৈ শুরু হয়েছে। ফয়েজ বারবার বলছে ফেলে দিতে, কিন্তু তবারক দু' হাতে মরা পাখির পাখা মেলে দেখাচ্ছে কী করে ওড়ে···কী সুন্দর পাখার কারু কাজ, লম্বা পালক দু'টির প্রান্ত থেকে দু'টি দীর্ঘ কাঁটা বেরিয়েছে, ডাকে ট্রি ট্রি ট্রি মিষ্টি সুরে—বলতে বলতে তবারক একবার হেসে উঠল। চিনির বুকের ভেতর তখন তোলপাড় চলছে।

ফয়েজ ও রঞ্জন এসে তবারকের হাত থেকে পাখিটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিল, কিন্তু কেউই মরা পাখিটা জানালা দিয়ে ফেলতে পারল না। মেয়েরা তখন একে একে ক্লাশে ঢুকছে, প্রতিদিনের মতো আজ ওরা মাথা নিচু করে থাকতে পারল না, মরা পাখির দিকে তাকাতে তাকাতে ওরা যার যার জায়গায় বসল এবং ঘামতে শুরু করল।

ক্লাশ শুরু হল মৃত পাখির প্রসঙ্গ দিয়ে। সবাই চুপচাপ, সমস্ত ক্লাশ থমথম করছে ছোট্ট একটা পাখির ঘটনাকে কেন্দ্র করে। বাইরে রোদ, উড়ে আসছে জুম-পোড়া ছাই, ভর সকালেও গনগনে চুল্লির মতো তেতে উঠেছে কলেজের পাকা দালান।

একে একে প্রায় প্রত্যেক গ্রামের ছাত্র মরা পাখির খতিয়ান দিল। চিনিও বলতে চেষ্টা করল গতকালের ঘটনা, কিন্তু বেদনা ও হতাশায় চুপ করে গেল। সবাই আস্তে আস্তে কেমন বিমর্ষ হয়ে চুপসে যেতে লাগল, এবং একসময় সমস্ত ক্লাস নীরবতায় ডুবে গেল, কারও মুখে আর কথা নেই, কেউ যেন বড় করে নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে গেছে, যেসব ছেলে ক্লাশের পেছনে বসে সবসময় ফিসফিস কথা বলে তারাও চুপচাপ···নিঃশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নেই, সমস্ত ক্লাশ যেন একই তালে ধুকপুক করছে, কামারের হাফরের মতো একটানা একঘেঁয়ে শব্দ করে ধুঁকছে সবাই···সবার বুঝি মনে পড়ল কোলরিজের সেই এ্যালবাট্রসের কথা, নিষ্ঠুর নাবিকের কথা, ভারী হয়ে এল ইংরেজি স্যারের গলা···মেয়েদের বেঞ্চে কে যেন ফোঁসফোঁস কাঁদছে, চিনি জানে না সে কাঁদছে কিনা···চৈত্রের গরমে তেতে উঠেছে সমস্ত ক্লাশ, জুম-পোড়া আগুনের আঁচে সবার বুক ছ্যাঁচড়া করে দিয়েছে···সমস্ত আকাশও তখন আগুনের ঝলসানো ধোঁয়ায় একাকার হয়ে গেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদ মাথায় চিনি ও লায়লা কলেজ থেকে ফিরল। ফেরার পথে পড়ে টিলার ওপর পুরোনো আমলের বৌদ্ধ বিহার, রাস্তা থেকে খাড়া সিঁড়ি বেয়ে ওরা উঠতে থাকে। বিহার উঠতে উঠতে পা ধরে যায়। চিনির ধারণা স্বর্গে যাওয়ার সময়ও অমন সিঁড়ি মাইলের ঋর মাইল অতিক্রম করতে হবে। খুব ছোটকালে সে সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে উঠেছিল...কী উঁচু। উঠতে উঠতে পেছনে তাকালে চোখে পড়ে বঙ্গোপসাগর, ধূসর নীল জলের বুকে সন্দ্বীপের চর...কী আনন্দ, আবার কষ্টও। সেই থেকে দীর্ঘ সিঁড়ি উঠতে গেলে চিনির মনে স্বর্গের কাল্পনিক একটা ছবি ভেসে ওঠে। স্বপ্নেও একবার স্বর্গের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল চিনি, তখন ভুল করে পেছনে না তাকালেই পারত সে। সামনে আশ্চর্য সব পাখিরা ডাকাডাকি করছিল, হাতছানি দিয়ে ডাকছিল তাকে...নীলকন্ঠ বাঁশপাতি কত রকম পাখি, কী সুন্দর বাহারে তাদের পাখা, কী উত্তেজনাগয় সেই অনুভূতি, আর রোমান্সে ভরা স্বর্গের সেই সিঁড়ি। চন্দ্রনাথ পাহাড়ে ওঠার সময় সবার মতো চিনিও একটা বাঁশের লাঠি নিয়েছিল, ষাট বছরের বুড়ি থেকে তরুণ যুবক সবাই লাঠি নিয়ে ঠুকঠুক আওয়াজ করে পাহাড় বেয়ে উঠছিল। পেছনে বিশাল বঙ্গোপসাগর...দেখে চিনি তো দিশেহারা, বুকের বর্মের ভেতর তার কিশোরী হৃদপিণ্ড, ধুকপুক করা ছোট্ট করুণ বুক বুঝি ফেটে পড়ে! সংগে ছিল ভাই তিমুর, হাত ধরে বলেছিল, কিরে কষ্ট হচ্ছে বুঝি? চিনি সেদিন কোনো উত্তর দিতে পারে নি, শুধু মনে হয়েছিল ভাই তিমুরই বুঝি তার আকাঙ্ক্ষিত ভাবী প্রেমিক!

সেই কিশোরবেলার স্মৃতি নিয়ে চিনি আজও উঠছে বিহারের সিঁড়ি বেয়ে, সংগে লায়লা। সিঁড়ির শেষ ধাপের দু' পাশে দু'টি বড় বড় পাম গাছ যেন স্বর্গের নীরব প্রহরী। তারপর সারি সারি নাগকেশর ও অশোক গাছ। অশোকের থোকা থোকা নারেঙ্গীলাল ফুল, নাগকেশরের বড় বড় সাদা ফুলের মাঝখানে গুচ্ছ করা পীতরঙের পুংকেশর...বিহারের পরিচ্ছন্ন চত্বর, বোধিবৃক্ষ ও উঁচু মিনার দেখে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল চিনি।

চিনি, তুই যেন কেমন হয়ে গেছিস—লায়লা বলল।

চিনি নিজেও বুঝতে পারছে না তার কী হয়েছে। শুধু ভাবল, মানুষ আসলে খুব অসহায় প্রাণী।

চিনি মাঝে মাঝে সামান্য বিষয়েরও সঠিক সমাধান খুঁজে পায় না। সে রঞ্জনকে ভালোবাসতে পারল না, সূর্যকেও নয়; এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে জয়কেও নয়।

লায়লা আবার বললে, চিনি, তোর শরীর খারাপ?

কই, নাতো!

তাহলে অমন করছিস কেন?

চিনি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললে, কই কি করছি? আমার কিছুই হয় নি। বলেই সঙ্গে সঙ্গে চিনি অনুতপ্ত হল, এবং নিজেকে সংযত করে তাড়াতাড়ি বলল, মত্যি আমার ভালো লাগছে না। চল, ফিরে যাই।

সেই সন্ধেয় তিমুর তার বন্ধু মৌলালকে নিয়ে এল শহর থেকে……এসেই সব কথা শুনল।

চিনি সমস্ত ঘটনা একে একে খুলে বলল। জানালা ছিঁড়ে ঢোকা পাখি, কলেজের কথা. চারদিকে পাখির মৃত্যু……বলতে বলতে একসময় চিনির গলা কেঁপে উঠল। মৌলালের দিকে তাকিয়ে ভালোবাসার আচ্ছন্নতায় ডুবে হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। মানুষ এক এক সময় খুব ভাবুক হয়ে যায়, এক এক সময় তার অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দিহান হয়ে পড়ে, আর কোনো কোনো মানুষের স্বভাব হচ্ছে ছোটখাটো বিষয় নিয়েও গভীর ভাবনায় ডুবে যাওয়া। তিমুর ও মৌলাল দু' জনেই বুঝল, চিনি তার নিজের মধ্যে নেই, চিনি অপ্রকৃতিস্থ।

সেই নিস্তব্ধ অস্বাভাবিক চিনিকে সচেতন করতে মৌলাল বলল, তুমি কি মনে করো পাখিদের মৃত্যুর মধ্যে রহস্যময় কিছু আছে? পাখিদের কথাই বা এত ভাবছ কেন?

অনেক কিছু ভাবার আছে বৈকি!

কিন্তু সেই রহস্য কি কোনোদিন জানা সম্ভব? থানুষ কি ক্যোনোদিন পাখি হতে পারবে যে রহসোর কিনারা করবে?—মৌলাল বলল।

চিনি মনে মনে বলল, তুমি একটা আস্ত গবেট ছাড়া কিছু নও। কিন্তু মনে মনে এও স্বীকার করল যে মৌলাল রক্তমাংসের মানুষ, পৌরুষের কান্তি ও দৃঢ়তা আছে, মৌলাল পুরুষ। চিনি এক বার উঠল। মৌলাল মাটির দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল, ছাড়িয়ে দিল পা। তিমুর ডাকল মাকে। মা রান্নাঘরে। রাত তখন নয়টা বেজে গেছে। হ্যারিকেনের আলোয় ঘরের ভেতরটা আরও তেতে উঠতেই ওরা উঠোনের কোণে ঘাসের চত্বরে বসল।

চিনি অনুভব করল মৌলাল একটু একটু ভালোবাসছে, কিন্তু কিছুই বলছে না চিনিকে...লায়লার কথা মনে পড়ল চিনির।

স্থাপিত-১৮৯৭

সবই চিনির অনুমান। শুধু চিনি নয়, মৌলালের মতো সব পুরুষই সামনে বসা মহিলাকে নিয়ে নানারকম ভাবে। চিনিও নিজের কথা ভাবছে...মৌলালকে নিজের মতো গড়েপিটে, নিজের চিন্তাভাবনাকে যোগ্য-অযোগ্য নানারকম ভাগাভাগি করে নিচ্ছে। বুঝতে পারে মৌলালের মধ্যে একজন সৎপুরুষ আছে, সংবেদনশীল পুরুষ সে। তবুও চিনি ভেতরে ভেতরে ঠিক কষ্ট পায়। তার বাইরের গড়ন দীর্ঘ ঋজু শ্যামল, কিন্তু ভেতরে ঠিক ততখানি শক্ত-সমর্থ নয়। দিনের পর দিন সে অন্য জগতে চলে যাচ্ছে, লায়লার বন্ধুত্বেও আর আগের মতো উষ্ণতা পায় না, তবুও লায়লাই তার একমাত্র বন্ধু, লায়লাকেই সে সব কথা খুলে বলতে পারে। তবুও সে লায়লার বন্ধুত্বকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দিতে পারে না কেন? বড় হওয়ার পর এই প্রথম চিনি বুঝল, আসলে সে একা এবং মানুষ জন্মগতভাবে নিঃসঙ্গ। এই নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে কত পরিকল্পনা করে মানুষ, উৎফুল্ল হতে চায়, কাজে ডুবে থাকতে চেষ্টা করে.....পারে না, একাকীত্বকে ঘোচতে গিয়ে আরও বেশি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। পাখিরাও দল বেঁধে দেশান্তরী হয়, আবার ঝাঁক বেঁধে ফিরে আসে, ঘর বাঁধে..... কিন্তু ডিম দেওয়ার জন্য যখন বাসা বানায় তখন তাদের এলাকা হয় পৃথক, একের এলাকায় অন্যে প্রবেশ করলে যুদ্ধ শুরু হয়। চিনিও নিজের ঘর বাঁধার কথা ভাবে, ভালোবাসা ও সন্তানের স্বপ্নে ভাসতে থাকে।

আকাশে তখন তারা ও অন্ধকার, চারদিকে গাছপালা ও জুম-পোড়া পাহাড়, টিলার ওপর নাগকেশরের ও কাঠচাঁপার ঘন ছায়ায় ঘুমন্ত বৌদ্ধ বিহার...আর সামনে বসে বসে কথা বলছে তিমুর ও মৌলাল...গরমে পোড়া চৈত্র ক্রমশ রাতের অন্ধকারে ঠাণ্ডা হচ্ছে, হাওয়া বইছে দক্ষিণ থেকে--নাগকেশর ও কাঠচাঁপার সৌরভে আচ্ছন্ন হচ্ছে রাত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেই রাতে চিনি ঘুমুতে পারল না, ভেতরের ঘরে একা একা বিছানায় পাশ ফিরে পড়ে রইল, নিঃশ্বাস নিতে নিতে ভাবল মায়ের কথা। সে জানে মা ঘুমুচ্ছে। মৌলাল কি ঘুমে অচেতন? শুধু সে-ই একা একা গরমে পুড়ছে? রাতের ঝিমঝিম শব্দ চাবকাতে চাবকাতে আরো উত্তেজিত করে তুলছে তার স্নায়ু, শক্ত করে তুলছে হাতের মুঠো। কিন্তু কোনো কারণ খুঁজে পায় না।

মৌলাল ও তিমুর ওঘরে। পাড়াগাঁর অন্ধকার রাত ওদের মতো অনেক কিছু বহুদূরে তাড়িয়ে নিস্তব্ধতা নিয়ে এসেছে। চিনি এক আধবার আড়ি পেতে শুনতে চেষ্টা করেছে—এত কি বলার কথা আছে, মানুষ এত বক বক করে কি করে? কিছুই শুনতে পারে নি সে, বরং এই আড়ি পাতার জন্য ভেতরে ভেতরে তার যন্ত্রণা বেড়েছে। তারপর একসময় যখন ওদের কথা থেমে যায়, রাত আরো গভীর হয়, বাইরের শব্দ যখন আরো গাঢ় হয়--চিনি তখন কান পেতে নিজের ভেতরের নির্জনতা শুনতে পায়। চিনি তখন বিছানা ছেড়ে ওঠে, পা টিপে খাট থেকে নামে, সম্মোহিতের মতো দরজার খিলে হাত দেয়। বারান্দায় দাঁড়ায়।

দরজা খুলতেই বাইরের শব্দ ও আচ্ছন্নতা তাকে জাপটে ধরে—যেন হাজার হাজার ছোটো পাখি ভিটের আম জাম জারুলের গাছপালা মাতিয়ে ডাকছে। টুইটুই ডাকে ভরে গেছে চারদিক।

ডাক প্রবল হচ্ছে আস্তে আস্তে, শব্দ ওঠে চি-চিপ চি-চিপ। কে জানে কি পাখি, কে জানে কোথায় যাবে? তবুও সে অনুমান করে নেয় ওরা নিজেদের দেশে ফিরে যাওয়ার পথে এখানে নেমেছে--আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতে চিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। উত্তর দিকে তাকাতেই গাছপালার মাথা ঘেঁষে দেখা যায় চিরচেনা ধ্রুবতারা আর সপ্তর্ষিমণ্ডল, ঘরের চালের পাশ দিয়ে দেখে মাঝ আকাশের অগুনতি তারা---শূনী মণ্ডলের দু'টি কুকুর শ্বা ও প্রশ্বা। এরাই যমের দুয়ারে পাহারা দেয়। চিনির মন অশুভ ভাবনায় কেঁপে ওঠে, ভয়ে ভয়ে সে তারা দু'টির দিকে আবার তাকায়---এবার সে মনে করতে পারে শ্বা ও প্রশ্বার আরেক নাম হচ্ছে প্রত্যুষ ও প্রভাস। ততক্ষণে সে উঠোনে নেমে পড়েছে এবং পাশে দেখে মৌলাল দাঁড়িয়ে---তিনি তখন নিজেকে নিজের মধ্যে হারিয়ে ফেলে, শুনতে পায় মৌলালের ডাক---যমের দুয়ারের কুকুরের মতো সেই ডাক অশুভ!

চিনি, তোমার ঘুম পাচ্ছে না বুঝি!

চিনি অন্ধকারে মৌলালের দিকে তাকিয়ে বলে, তোমার?

মৌলাল আর উত্তর দিল না, পাখিদের লক্ষ্য করে বলল, ওরা দেশে ফেরার পথে তোমাদের এখানে বিশ্রাম নিচ্ছে, হয়তো এখুনি আবার উড়তে শুরু করবে।

এবার চিনি নিজেও প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, প্রায় প্রতি রাতে একটি স্বপ্ন ঘুরে ফিরে দেখি আমি।

তুমি বুঝি খুব স্বপ্ন দ্যাখো?

হ্যাঁ।

কি স্বপ্ন ?

আকাশ।

আর ?

চিনি বলল, আকাশ। সমস্ত আকাশের তারাগুলো একে একে সারি বেঁধে এসে একজন অপরিচিত মানুষ হয়ে যায়। আকাশ জুড়ে সেই সৌম্য চেহারার মানুষটি আমাকে দেখে হাসে। এক সময় সে রঙবেরঙের ফুল হয়ে যায়, ফুল হয়ে ওঠে জাহাজ, জাহাজ হয় মস্ত বড় এক বোমারু বিমান, আর সেই বিমান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ নামে। কখনো কখনো অনেকগুলো বিমান উড়তে উড়তে শূন্যে অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার ঝাঁকে ঝাঁকে আসে, একেকটা বিমান গুলি খেয়ে দাউ দাউ পুড়ে যায়---ভয়ে আমার বুক কেঁপে ওঠে। তখন আমি আর ছুটতে পারি না, একজন আহত বৈমানিককে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তুলতে চেষ্টা করব মনে করেও তার কাছে পৌঁছুতে পারি না। কিছুই করতে না পেরে আমি হতাশ হয়ে পড়ি। তখন ইচ্ছে করে ওই দিগন্তে মিশে যাওয়া বিমানে করে কোথাও হারিয়ে যাই--।

পাড়াগাঁয়ের নির্জনতায় তুমি বুঝি ভয় পাও---মৌলাল চিনিকে বুঝতে না পেরে বলে।

চিনিও হতাশ হয়ে বলল, ঠিক মন বসে না বা ভয় করে তা নয়। আমি চাই এই গ্রামে থাকতে, এই পাড়াগাঁ মাঠ বিল পাহাড়ের ঘেরাটোপে জীবন কাটিয়ে দিতে---কিন্তু আমি হাঁফিয়ে উঠেছি---হয়তো পাখিদের দেখে দেখে---ঘাতক মানুষ দেখে হয়তো বা।

তোমার আর এত অভাব কিসে ?

অভাব নয়, এর কারণও ঠিক জানি না। পাখিও নয় বোধহয়।

মৌলাল ওর হাত ধরে উঠোনে হাঁটতে লাগল। সমস্ত আকাশ তখন তাদের মাথার ওপর বুক বাড়িয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, গাছে গাছে পাখিরা শান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে, ঝিঁঝিঁদের একটানা শব্দও নীরব হয়ে গেছে, জুম-পোড়া পাহাড়ও তখন অনেক শান্ত, বদ্ধ গুমোট ভাবও আর নেই, চিনি তখন নিজেকে ভারহীন পূর্ণ ভেবে স্বস্তি অনুভব করে। মৌলালকে মুহূর্তের জন্য মনে হয় পরিত্রাতা প্রেম। পরক্ষণেই মনে পড়ল তাদের ক্লাসের সেই মেয়েটির কথা, গতকাল ও পরশুর মৃত পাখিদের কথা, চিনির চোখের সামনে হঠাৎ ভেসে উঠল নিজের ছিন্নভিন্ন লাশের ছবি।

মৌলাল ডাকল, চিনি!

চিনি যেন তখুনি জেগে উঠে শুনল সেই একই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, সেই একই ভালোবাসার কথা শোনাচ্ছে মৌলাল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে পায় চিনি, তার হাতে মৌলালের হাত।

চিনি কিছু একটা বলবে ভাবতেই চুপচাপ শান্ত পাখিরা চারদিক কাঁপিয়ে অন্ধকার রাত বিদীর্ণ করে উড়াল দিল। মুহূর্তের মধ্যে চিনির স্নায়ুতে ঝড় বয়ে গেল—পাখিদের ডানার শব্দে দিশেহারা হয়ে, নিজেকে ভারমুক্ত মনে করে, ক্লান্তি ও স্থবিরতা মুছে চিনির স্নায়ুতে ঝড় বয়ে যেতে লাগল। গাছপালা ও অন্ধকার ছিন্নভিন্ন করে পাখিরা উড়ে যাচ্ছে, আর মৌলালের জন্য জমা ভালোবাসাও সেই সংগে গলে যাচ্ছে। চিনি তখন আর একা নয়, বিষণ্ণ নয়, হতাশগ্রস্ত কুমারীও নয়—মধুর সেই পরিতৃপ্তি, চিনি আর একা নয়।

সেই অনুভূতি নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাসতে থাকা চিনি তাদের উঠোনের কোণে লুটিয়ে পড়ল।

উপসংহার

রাতের অস্বাভাবিক গরমের পর পরদিন সকালে দেখা গেল চারদিক পাখি শূন্য। চৈত্রের মাঝামাঝি এত গরমও কেউ কোনোদিন দেখে নি। আকাশ জুড়ে জুম-পোড়া ধোঁয়া, ছাই পড়ছে উড়ে। হাওয়া নেই বললেই চলে। ছোট ছেলের দল জুম-পোড়া ছাই ধরে খাচ্ছে, এক সময় তারাও গরমে হাঁপিয়ে ওঠে, খাওয়া ভুলে যায়। ভোরের সুর্য ওঠে ধুসর রোদ নিয়ে, পুরো আকাশ ঢেকে আছে ধোঁয়ায়। ভোরে ঘুম ভাঙার সময় কেউই প্রথমে ঘটনাটি ভালো করে লক্ষ করেছে বলে মনে হয় না। ভোরের আজানে প্রথমে যাদের ঘুম ভাঙে তারাও ব্যাপারটি লক্ষ করে নি। ভিক্ষু দেবানন্দ রুগ্ন শরীর নিয়ে খুব ভোরে উঠে প্রথম শুনল একটি দোয়েলও ডাকছে না।

গ্রামে যাদের পোষা পাখি ছিল তাদেরও নজরে পড়ল দেরিতে। খাঁচার পাখিরা ছটফট করছে দেখে তাড়াতাড়ি সবাই খাবার তুলে ধরে তাদের মুখে, পানি দিল বাটিতে। তাতেও কোনো ফল হল না দেখে কেউ কেউ পোকা-মাকড় ধরতে ছুটল, কিন্তু পোকাও মুখে তুলল না পাখিরা। তারপর তারা ভাবল, দোয়েল বা চড়ুই বা শালিক কোনো পাখি ডাকছে না কেন? একটি পাখিও ভিটের গাছপালায় নেই, উঠোনে খাবার খেতে নামল না একটিও শালিক।

মহামায়ার বাড়িতে তখন চাপা কান্নার রোল। চিনির দেহ চৈতন্যহীন। তিমুর ডাক্তার নিয়ে এল।

নিশি ডাক্তার বলল, শেষ চেষ্টা করে দেখি।

তিমুর বলল, শহরে নিয়ে যাব ডাক্তার সাহেব?

নিশি ডাক্তার বলল, এই অবস্থায় ধকল সইবে না।

মহামায়া কান্না চেপে এঘর ওঘর করে অতি জরুরী কাজগুলো করছে। মৌলাল ভাবল, চিনির কি হল! তাদের এক রাত্রির ভালোবাসার পরিণাম এভাবে আসবে কে ভেবেছিল!

খবর পেয়ে লায়লা ছুটে এল। পথে পথে সেই ভালো করে লক্ষ করল একটি পাখিও কোথাও নেই। তোতার বাবার নির্জন পুকুর পাড়ে এসে দেখল অনেকগুলো আবাবিল, গেছো চড়ুই আর চখাচখি মরে পড়ে আছে। কৌতূহলী হয়ে লায়লা ছুটে গেল পুকুর পাড়ের চত্বরে। আবাবিলের দীর্ঘ ল্যাজ ধরে একটা পালক তুলে নিতে কী যে ইচ্ছে তার—কিন্তু পাখিগুলো কেন মরল, নাকি আত্মঘাতী হয়েছে? আত্মঘাতীই বা হবে কেমন করে? লায়লা পুকুর পাড় ঘুরে চিনিদের বাড়িতে পেঁাছল। মৌলালকে দেখে লায়লা একবার ভালো করে তাকাল, তিমুরের সঙ্গে কথা বলল, জানাল গত কয়েকদিনের ঘটনাবলী। স্কুলের অদূরে জলাভূমি হঠাৎ করে শুকিয়ে গেছে। সেখানে এসেছিল লেনজি, পিয়ং, সিরিয়া, ভুতি, পাতরি হাঁস ও চখাচখি। তারা চলে গেছে জলাভূমি শুকানোর সঙ্গে সঙ্গে। এক রাতে ফিঙে, দোয়েল, চড়ুই, শালিক বা শঙ্খচিল জাতের পাখিরাও উধাও। কোথাও একটি পাখি নেই। ভোরে ঘুম ভাঙাতে আর কোনো পাখি ডাকবে না আগামীকাল থেকে। খাঁচার পোষা পাখিরাও আর ডাকবে না হয়তো কোনোদিন। পুরো এলাকা পাখিশূন্য হয়ে থাকবে—কতদিন কে জানে! চিনিও আর জাগবে কিনা কেউ জানে না। নিশি ডাক্তার তো মনে মনে আশাই ছেড়ে দিয়েছে।

মহামায়ার তো মায়ের মন, সে একবার মৌলালকে আবার তিমুরকে ডেকে বলল, কাল রাতে চিনি কি বলেছে বাছা! ডাক্তার কি বলেছে? ওর কি হয়েছে?

[গল্পগুচ্ছ : উল্কি একটি প্রেমের গল্প]

দুই মৃত্যু

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূর্যের জেদ চেপে গেল, ভেতরে ভতরে টগবগ ফুটতে লাগল। এক জোড়া তাগড়া গরু কিনল, মই জোয়াল লাঙলও। বাঁধল চাষীদের জন্য আলাদা একটা বাঁশের ঘর। চাষের নানা সারঞ্জাম কিনল—নতুন জিনিসপত্র কিনতে বেশ ফুর্তি লাগে। মা-বাবা তো প্রথমে রাজিই হয় নি। অনেক যুক্তি দিয়ে তক্কো করে তাদের মত করা গেল। বোনটি গ্রামে থাকতেই চায় না, শহরের স্কুলে পড়তে চায়। ভাই ছোট বলেই বুঝি গ্রামের জন্য তার একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। জিনিসপত্র কেনা ও ছোটাছুটি করতে করতে সূর্য অস্থির হয়ে রইল—তবু এক জীবন যে আরো কত দেরি, জীবন ফুরোবার আগে অনেক কিছু করতে হবে।

সব কিছু যোগার করতে জমানো টাকার বেশ কিছু দাগে দাগে হড়হড় বেরিয়ে গেল। এভাবে টাকা খরচ হয়ে যায়। গ্রামের লোকেরা নতুন চাষী সূর্যকে বেশ দেখছে, বলছে মজাটা টের পাবে বছর ঘুরতেই। চাষ কী অত সহজ! অফিসের কলম পেষা নয় বাবা, রঙিন চশমা এঁটে সিগারেট ফুঁকে বসন্তের ফুরফুরে হাওয়াও খাওয়া নয়। চাষ করতে হলে কাদা-রোদ-জলে গরু-মোষের পেছনে ছুটতে হয়, ঝড়-ঝাপ্টায় সাহস বেঁধে দাঁড়াতে হয় আর চাই চোদ্দ-পুরুষের আশীর্বাদ বাপ দাদা চোদ্দগোষ্ঠীর দোয়া।

সূর্যের বাবা বলল, আমাদের বংশে কালো গরু সয় নারে, তাই বলে ফুটকি ওঠা গরুও কিনিস নে যেন, জুতো পায়ে খেতের আল দিয়ে কখনো যাবি নে।

সব কিছু ঠিকঠাক। পাড়ার লোকে সূর্যকে সমীহ করে। হাজার হোক লেখাপড়া জানা তো, ভালো একটা চাকরীও করত। একটু মেজাজী এই যা! সে এখন বাড়ির পাশে বিলিতি শিরীষ গাছের আধছায়ায় বীজতলার কথা ভাবছে। কাজীদের মেয়ে বনির ভাবনা নয়, তামাকের মরসুম শুরুই হচ্ছে আসল ব্যাপার। বৃষ্টি এবার বেশি হল বলে শ্রাবণ মাসে বীজতলা তৈরি করা গেল না। ভাদ্রের মাঝা-

মাঝি অব্দি অপেক্ষা করতে হল। সারা শ্রাবণ মাস ঝমঝম বৃষ্টিতে গেল, ভাদ্রের পনেরো কাটল বৃষ্টিতে। জমিতে চাষ তো দূরের কথা বীজতলা তৈরি করাই কঠিন। কাজেই চারদিকে নালা কাটল, পাতা পচিয়ে সার তৈরি হল। বিলিতি শিরীষ গাছের পাতারা বৃষ্টি দেখলে দিনের বেলায়ও চোখ মুদে থাকে। লোকে বলে কুম্ভকর্ণ। এমনিতেও ঘুম ভাঙে দেরিতে, আবার বিকেল না নামতে ঘুমের পাত্তাড়ি কষে। তবে ফুল হচ্ছে বাহারে, বর্মী ছাতার মতো। এই শিরীষের কাছেই বীজতলা। ভার্জিনিয়া তামাক...নিকোটিনে, সৌরভে, আমেজে বড্ড দেমাগী তামাক ভার্জিনিয়া ; রূপসী নারীর মতো দেমাগ।

এদিকে সত্যিই দেমাগ দেখিয়ে আকাশে উঠল সূর্য। চাষীরা লাঙল চালাল। বেগুনের চারার জন্য বীজতলা দরকার। কিন্তু পরদিন যেই-কে সেই। আবার জমি বাতাবে (বৃষ্টির জল শুকোলে জমি চাষের উপযোগী হয়। তাকে জমি বাতানো বলে।), আবার চিরচির ঘাস ছিঁড়বে লাঙল—অমন বেলে জমিও মটকা মেরে পড়ে আছে, সহজে বাতাচ্ছে না। ওদিকে চাতক বৃষ্টি ডেকেই চলেছে...মর মর, চাতকগুলো মারে না কেন! চাঁদের চারদিকেও বৃষ্টির পুকুর...সূর্য রাগে ফুসছে, মেঘের আড়ালে সূর্যকে তাকিয়ে মাটির পৃথিবীর সূর্য ফুসছে।

ভাদ্রের শেষ সপ্তাহে এক প্রস্ত রোদ পাওয়া গেল—যাকে বলে চাম-পোড়া রোদ। পরিপাটি করা বীজতলা ঝাঁঝালো গন্ধ ছাড়ল, পচা পাতা থেকে ভ্যাপসা গন্ধ ছুটল। এখন কোনো মতে বীজ ছড়াতে পারলে হয়। দরকার হলে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে বীজতলার ওপর ছাউনি দিতে হবে। সূর্য আকাশের সূর্যের মতো গনগনে আড়মোড়া ভেঙে দাঁড়াল—একটা দুর্ভাবনা কাটল যা হোক।

তামাকের চারাগুলো খুব ঘন হয়ে উঠেছে, কিছু চারা তুলে ফেলা দরকার। তুলতে তুলতে সবুজের কাঁড়ি হল। ঠিক তখনই হুটপাট করে দুটো মেয়ে ছুটে এল। ব্যাপার আর কিছুই নয়, সূর্যের বোনটি চিরকালই অমন, চোটপাট করে বেড়ায়—সূর্যও ভালোবাসে। বেণী দুলিয়ে যখন সহেলি ছুটে আসে তখন কাজ ছেড়ে সূর্যকে কথা বলতে হয়, অবহেলা করল কি কান্নাকাটি পড়ে যায়। সেই সহেলি এখন বড় হয়েছে তবু ভালোবাসা ঠিকই কেড়ে নেয়। বনিও সহেলির বয়েসী, স্কুলে পড়ে, তার কাছে আসে, কুল কুল হাসে। ওরা দু' জন এল। দৌড়-ঝাঁপ দিয়ে পুকুর পাড়ের শটিবন, শণখেত, হলুদফুলের সবুজ ঝুঁটি, গাছ-গাছালি ও আদা ফুল মাতিয়ে তুলল। সঙ্গে জুটল শিস দেওয়া দোয়েল, বেনেবউ, ডাহুক—পাখিরাও সবার সঙ্গে ফুর্তির অংশভাগী হয়। পাখিদেরও হৃদয় আছে. জানজানি হয় তাদের মধ্যে, মানুষের স্বভাব-চরিত্র ঘাড় কাত করে দেখে। পাখিদের চোখ ঠোঁটের দু' পাশে ঝুঁটিও মাথার ওপর। নেচে নেচে গান তোলে...পাখিদেরও প্রজ্ঞা আছে। বনিরা যখন শটিবনে বসে, সূর্য যখন বীজতলায় দাঁড়ায়—আর তখনই দুর্গা টুনটুনি 'উইচ উইচ' ডেকে উঠল। বনি ও সহেলি কান খাড়া করে শুনল—গলায় কী জোর! আবার গলা ছেড়ে ডাকল চি-ই-ই উইট। বনিরাও এগিয়ে চলল। কোথায় পাখিটা! ছোট্ট পাখি, সহজে চোখে পড়তে চায় না। পেয়ারা গাছের পাতার আড়াল থেকে শব্দটা আসছে বোধ হয়। বউ পাখিটা কোথায় লুকিয়ে আছে—পাখিরাও এভাবে ভালোবাসা লুট করে বুঝি!

হাঁটতে হাঁটতে ভাসতে ভাসতে ওরা তিন জন এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল। তিনজনই চুপচাপ মুগ্ধ, ওপর দিকে তাকিয়ে আছে। কথা নেই। সূর্য দেখল সহেলির আধ-খোলা বেণী দু'টো সামনে লুটিয়ে আছে, বড় হয়ে উঠেছে সে। বনি আরও সুন্দরী হয়েছে, বুকের ওঠানামা বেশ জোরালো ও নমনীয় হয়েছে, তারুণ্য ঝলমল বাজছে, ঠোঁট কাঁপছে। পাখিটা উইচ উইচ ডাকল আবার। বনি দেখছে। সূর্য পাশে গিয়ে দাঁড়াল, তারুণ্যের মিষ্টি সৌরভ তাকে কুলুকুলু স্রোতে ভাসিয়ে ছুটল।

এই যাঃ! পাখি দু'টো পাপড়ির মতো ভেসে ভেসে উড়ে গেল। সহেলি তো রেগে উঠল—তুমি, তুমি কেন এলে, তোমার জন্যই তো উড়ে গেল। সূর্য চোখ তুলে বলল, আমার জন্য শুধু! তোমাদের দেখেও উড়ে যেতে পারে তো। পাখিদের মন বোঝা শিখলে কবে থেকে?

বনিও বলল, আমাদের দোষেও উড়ে যেতে পারে তো!

সহেলি কিছুতেই মানবে না, তুই আবার দরদী হয়ে উঠলি যে, কী হয়েছে তোর!

বাঃ, দরদী হওয়ার কী আছে! হতেও তো পারে। ওরা নিজেদের থেকেও উড়ে যেতে পারে না বুঝি?

সহেলি বলল, কী সুন্দর পাখি! তোমাদের দু' জনেরই দোষ তাহলে।

সূর্য আর একবার অসহায় হল। হঠাৎ সে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ল, হঠাৎ বুকের ভালোবাসা বান ডাকল। শটিবন শণখেত পেয়ারা গাছ—সবুজ রঙের ওপর সিঁদুরে মেঘের বান ডাকল, বুঝি ভার্জিনিয়া তামাকের

চারাগুলো চোখের নাগালে মুচুকুন্দ ফুল হয়ে ফুটল. মুচুকুন্দ নয় নীল ঝুমকো ফুল, ঝুমকো তো নয় কৃষ্ণচূড়ার লাল—গাঢ় লাল-নীল রঙ সূর্যের চোখ-মুখ ভাসিয়ে কর্ণফুলী পেরিয়ে যায়, বঙ্গোপসাগরে ভাসতে ভাসতে নিঝুম দ্বীপ ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, নিকোবর থেকে প্রবাল দ্বীপে পাড়ি দিল। বনি কী মিষ্টি করে তাকে আশ্রয় দিয়ে নিজের বোনের মুখ থেকে আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চাইল! বনির নম্র বুক ওঠানামা করছে ভালোবাসায়। ভালোবাসা নাইবা হল, মমতায় এলিয়ে দেওয়া খোলা চুলও তো হতে পারে, হতেও তো পারে পরাজিত পক্ষের প্রতি তার স্বভাব-কারুণ্য, এমনও তো হতে পারে মেয়েটি সূর্যকে পরীক্ষা করছে। ভালোবাসায় বা কেন হতে পারে না! শটিবন, শণখেত, জারুল ফুলের খয়েরী-নীল রঙ—সূর্য তার আগামী ভার্জিনিয়া তামাক খেতের মাথা উঁচানো গাছের ঘেরাটোপে স্বপ্নে স্বপ্নে ভাসতে লাগল, পাক ধরা তামাকের ঝাঁঝালো গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে উঠল। বীজতলার চারা বড় হয়ে উঠল। সহেলি কখন যে অভিযোগ তুলে নিয়ে হাহা তৈতৈ হাসতে হাসতে বলল—কি, তুমি বুঝি স্বপ্ন দেখছ, কি?

সূর্য নিজের কাছে নিজে ফিরে এল—একসময় এভাবে সবাই যার যার হৃদয়ের অলিন্দ-নিলয়ে ফিরে খুব একচোট হাসল। দুর্গা টুনটুনির ঝড়ের বেগে ওড়াওড়ি আর তাদের দুঃখের মাঝে ডুবিয়ে রাখতে পারল না। পুকুর পাড়ের শটিবনে তারা তিনজন কী যে আনন্দ উৎসব পালন করল, কী যে অনুরাগে থৈ থৈ ভাসল, ভাইবোন মিলে কী যে সুন্দর হয়ে উঠল—কী অনিন্দ্য উৎসবই না কেউ কেউ দলবল নিয়ে, কখনও একা একা স্বপ্নে স্বপ্নে পালন করে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তামাকের জমিতে অনেকে কাজ করে। তুন্টু, কইতুরী, ফুল্লরা, বিনোদিনী, রুখিয়া, মেহেরজান—পুরুষরাও করছে। তামাককে চোখে চোখে রাখতে হয়, অনুরূপ ভালোবাসা দেখাতে হয়। সূর্য জমির আল কমিয়ে দিয়েছে। নিজের জমি ছাড়া আরও ছয় কানি (চট্টগ্রামে জমির আঞ্চলিক মাপ। আড়াই কানিতে এক একর) জমির খাজনা আগাম দিয়ে চাষ করতে নিয়েছে—মোট দশ কানির চাষ। তিনটি হাল জুতেছে। নিজের এক জোড়া গরু ছাড়া আরও দু'টি হাল জুড়েছে। ট্রিপল সুপার ফসফেট, সালফেট আর পটাশ পরিমাণ মতো দিয়েছে চাষের সময়।

তামাক কোম্পানীর ইন্সপেক্টর এসেও দেখাশোনা করেছে। কত সার দেবে, এক একটা সারি কতদূর অন্তর দেওয়া দরকার, চারা বড় হলে ইউরিয়া কী পরিমাণ দিতে হয়—কত রকমের যে ঝক্কি!

সেদিন সহেলি সূর্যকে বলল, বনি তোমার প্রেমে পড়েছে বুঝি, বলো না ভাইয়া!

ফের দুষ্টুমি! আমি এখন তামাকের প্রেমে পড়েছি। ভার্জিনিয়া তামাকের প্রেমে পড়েছি। ভার্জিনিয়া তামাকে আমার একমাত্র প্রেয়সী! কাজেই ওসব বাজে কথা বলিস নে। চাষে ফেল করলে উপুস করে মরতে হবে, বুঝলি!

তাই নাকি! তাহলে তো তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়।

তাই করিস! তবে তামাক ছাড়া আরেকজনকে ভালোবাসি।

কে? কে?

তুই!

আমাকে ভালোবাসবে এতে আবার নতুন কি আছে? এদিকে মা যে তোমার জন্য মনে মনে বউ খুঁজছে।

মনে মনে খুঁজছে তো তুই জানলি কি করে?

তাইতো তুমি জানো না। আমি সব জানি।

কাকে ঠিক করছে রে।

বলব না।

বনিকে বুঝি!

ধরা পড়লে। চোরের মন তামাক খেতে বুঝলে?

বল না। তোকে সুন্দর একখানা শাড়ি দেব। পয়লা বোশেখে।

সে তো অনেক দেরি!

দেরি কোথায়। অঘ্রাণ গেলে পোষ, মাঘ—

ফাল্গুন চৈত্র বোশেখ কত দেরি!

ঠিক আছে। শাড়ি দেব না, বউও চাই নে। আমি আবার চাকরি করতে যাব। তোরা গ্রামে থাকবি।

তোমার ভার্জিনিয়া তামাকের চাষ···আমি জানি, তুমি শহর থেকে বিয়ে করবে। চিঠিতে ঠিকানা দেখেছি। তানিয়া নাম।

খুব বুদ্ধি বাড়ছে তাই না? চুরি করে আমার চিঠি পড়িস, দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি। বলেই সহেলির বেণী ধরে টানতে টানতে হড়কাতে হড়কাতে—কি, আর···আর চিঠি দেখবি? মাকে বলে দেব তাড়াতাড়ি তোর বিয়ে দিতে। বোশেখ আসুক।

ভালো হবে না বলছি। বাবাকে বলে দেব, বনিকে বলব তানিয়ার কথা, সেদিনের দুর্গা টুনটুনি ধরার কথা বলব, বনিকে টুনটুনি ধরে দিতে ফাঁদ পেতেছিলে। টেবিলের কাগজে তার নাম লিখেছিলে—দেখেছি দেখেছি—একশো বার বলব, লক্ষ বার—বনি, বনি, বনি, তানিয়া—

সূর্য এক সময় মনে মনে নরম হয়ে গেল। সহেলি তখনও বনি-তানি করছে।

পুকুর পাড়ের শটিবন, শণখেত, জারুল, মাদার—হৈ চৈ করে নাচছে। ঠিক তখনই বনি এসে ঘাটের কাছে দাঁড়িয়েছে। শুনতে শুনতে সে ফিরে যাবে কিনা ভাবছে, তার উঠতি পা থমকে আছে।—পা ফেলবে কোথায় ? তার কিশোরী মন এক লাফে যৌবনের দরজায় ঘা দিল, এক ঝটকায় বনি তার ধুলোখেলার বালিকা বয়স পেরিয়ে লজ্জায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে পড়ল। পা সরছে না, স্তনের ভারে ঈষৎ নুয়ে পড়ছে, বুকের ভালোবাসার অলিন্দ-নিলয়ের গন্ধে সে চোখ বুজে নিঃশ্বাসের দৈর্ঘ্য মাপছে, ভালোবাসছে নিজেকে, ভালোবাসায় পৃথিবীকে জড়িয়ে নিচ্ছে বুকের মধ্যে, আঁচল পুরে নিচ্ছে চুরি করা ভালোবাসার জিনিসপত্রে, কোঁচর ভরে শৈশবের পুঁতির মালা নিয়ে লাফিয়ে ছুটল পাড়াময়, মুখের ভেতর দু' হাতের তর্জনী পুরে ভেঙচি কাটছে, পাড়ায় সই-সাঙাতকে বলে দিচ্ছে গোপন কথা, লাফিয়ে লাফিয়ে এক্কা-দোক্কা খেলছে তার কুমারী হৃদয়—বুকটা এক ঝাপটায় আর্দ্র হয়ে উঠল বুঝি !

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কখন যে ভাই-বোনের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে গেল। ইতিমধ্যে সূর্যের রোয়া তামাক দেড় হাত মাথা তুলেছে। কিন্তু পুকুরপাড়ে আজ বনি নেই, পুকুরের জল তাতা থৈও খেলছে না, পারিজাতের বাহারে ফুলও নেই, মহুয়া ফুলও নেই, নেই গাছে গাছে ডাসা পেয়ারা—ভাজিনিয়া তামাকের আগল ভাঙার (তামাকের পাতা পুরু হওয়ার জন্য গাছের আগা ভাঙাকে বলে আগল ভাঙা) তো দরকার পড়ে না, গাছের তিন-চারটে পাকা পাতা ভাঙার কাজও শুরু হয় নি—সূর্যের বুকের ভেতর কোনো নারীর জন্য ভালোবাসাও বুঝি নেই।

দিনরাত সূর্য নদীর চিকচিক ঢেউয়ের পাশ দিয়ে তামাক দেখতে যায়। ভাজিনিয়া তামাক তার নিজস্ব রূপ নিয়ে দেমাগ দেখিয়ে বাতাসে দুলছে। মাঘ মাসে একবার বৃষ্টিও হয়ে গেল। আর সেচ দিতে হবে না, আর নিড়ানি চালানোর দরকার নেই, আর সার দেওয়ার প্রশ্নও ওঠে না—এখন হঠাৎ করে আগাম কালবোশেখী না হলেই হয়, কালবোশেখী উঠলেও ঝমঝম ঝনঝন বৃষ্টি যেন না নামে, আর যেন পোকা না ওঠে। এখন সব অশুভগুলো যেন ভাগ্যের বিল, গুমাই বিল, কাজীর দিঘি ও সীতা পাহাড় উৎরে বহুদূর হটে যায়।

কোনো রকম বড় বিপৎপাত হয় নি বলে সূর্যের মন মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। না-জানি তামাকে পাক ধরলে বৃষ্টি আসে বুঝি! ভালোয় ভালোয় চোত মাসটা কাটলে হয়। তামাক শুকানোর ঘর তৈরি হয়ে গেছে। চিমনি বসানোর কাজও শেষ। উঠোনের এক পাশে লাকড়ির বড় কাঁড়ি মারা হয়েছে। মজুমদারদের আমগাছটা কিনে ঠকেছে। আমের লাকড়ি ভালো, কাঁচা গাছের তেল চটচট করে বেরিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাখে। গাছের গুঁড়িগুলো বড় বড় চেলা করে রেখেছে চাষীরা। দিনরাত কাজ চলছে কাজ; দিনরাত। তামাক এক প্রস্ত শুকানো হয়ে গেছে।

ভর কাজের দিনে সূর্য এক দিন বড় নেতিয়ে পড়ল নিজের বুকের ভারে। পাঁচ গণ্ডা জমিতে সিগার তামাকের চাষ করেছে। ওখানে রজ্জু মিয়া সেদিন কুঁশি ভাঙছিল। আগল ভাঙার কয়েকদিন পর প্রতিটি তামাকের পাতার গোড়া থেকে এই কুঁশি বা কুঁড়ি বের হয়। ওপাশে তুন্টু আর অন্য পাশে কইতুরী কাজ করছিল। সূর্য কখন সেখানে পৌঁছেছে তুন্টু টেরও পায় নি। মাথা উঁচিয়ে ভাজিনিয়া তামাক দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশেই সিগার তামাকের খেত। হুট করে কেউ ভাজিনিয়ার খেতে ঢুকে পড়লে খুঁজেই পাবে না—হুট করে বেরিয়ে আসতে দেখলে ভয়ও পেতে পারে কেউ কেউ। অন্ধকারে যখন তামাক দাঁড়িয়ে থাকে, জ্যোৎস্নার ছক-কাটা চাদরটা যখন খেত জুড়ে এলিয়ে পড়ে, রাত যখন পাশ ফিরে শোয়—তখন এক রকম দৃশ্যপট তৈরি হয়। কিন্তু ঠিক জ্যোৎস্নায় নয়—চোতের আগুন ঝরা বিকেলে যখন জুম-পোড়া ধোঁয়ায় আকাশটা ঘষা-মাজা তামাটে করে তুলেছে তেমনি একটি সময়ে সূর্য সিগার তামাক খেতে নামছে—মাথা ছড়ান উঁচু ভাজিনিয়া তামাকের খেত থেকে হুট করে বেরিয়ে সিগার তামাক খেতে যখন পা রাখবে ঠিক তখনই—ভাজিনিয়ার ফুল ফুটেছে থোকা থোকা, কলিও রয়ে গেছে কিছু, তখনও সিগারে তামাকের রঙ হয় নি। তামাক-পাতা ভাঙার উপযুক্ত পাতাকে পুরুট পাতা বলে। সূর্য সিগারের

তামাকের খেতে নামতেই পারে নি। ওখানে তুণ্টু গরমে ঘামে ভিজে পা ছড়িয়ে বসে আঁচল খুলে বাতাস করছে নিজেকে। বুকের দিকে তাকিয়ে আঁটসাঁট ব্লাউজটার বোতাম খুলেছে মাত্র, বোতাম খোলার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিপূর্ণ স্তন বেরিয়ে এল। সে তাকিয়ে আছে আঁচল ধরে। তুণ্টু বিধবা হয়েছে গত বছর। ফর্সা শরীর পোড়া পোড়া হয়ে গেছে, ছেলে-সন্তানহীন বয়সটা শরীরে থমকে আছে। কী সুন্দর শরীরটা এক সময় ছিল, কী স্তনই না খুলে দিয়েছে! স্তনের বোঁটা ঠাসা এবং এগিয়ে আছে সামনে, চারদিকের লালচে বন্ধনীও খুব বড় নয়, অনেকটা কুমারী নারীর মতো—সূর্য ফিরে যাবে ভেবেও দাঁড়িয়ে থাকে। সে তার নিজস্ব যৌবরাজ্যে কাকে ভালোবাসে ভুলে গেল। বনি ও তানিয়ার কথা মনে পড়ল, সহেলির তারুণ্যের কথা মনে পড়ল, তবুও সে চৈতী খরায় পুড়ে পুড়ে তামাকের ঝাঁঝালো ভালোবাসায় দাঁড়িয়ে রইল। সিগারের তামাকের চাষ একটু দেরিতে করেছে বলে, বা জমিটা নিরস বলেই বুঝি তামাক ভালো হয় নি! তা মন্দই বা কি? পাতা পাতলাই আছে, দু-এক দিনেই পুরুষ্ট হবে ধরা যায়। সিগারের র‍্যাপারের (সিগারের ওপরের আবরণের পাতলা পাতাকে র‍্যাপারের তামাক বলে) পাতার রঙ দেখলে চেনা যায়, হাত ধরে অনুভব করা যায়, হাতে ধরে তৃপ্তিতে শির শির কাঁপা যায়। তামাক কোম্পানির ইন্সপেকটররা সূর্যকে সেরা চাষী বলে ঘোষণা করতে পারে বৈকি! সূর্য থমকে দাঁড়িয়ে আছে, তার সকল ভালোবাসা নিমেষে কামনায় জ্বলে উঠল বুঝি! তিরিশ বছরের যৌবন হঠাৎ হল্লা করে ছুটি খুঁজে বসল বুঝি! তুণ্টু বুঝি নিজের দেহের প্রেমে মশগুল! হঠাৎ সে কি বাসনার চাপে জ্বলছে? বিকেলের সামুদ্রিক হাওয়াও লুটোপুটি শুরু করে নি, নদীর ঢেউ ছলোচ্ছল শব্দে মাতামাতি ডাকাডাকি শুরু করে নি, অশোক বা নাগকেশরের বাহারে ঝলক এদিকে কোথাও দল মেলে মন কেড়ে নিতে ছুটে আসে নি। শুধু তামাকের সাদা ফুল দল মেলে আছে—তুণ্টু কি তবে কামবশায়িতা?

সূর্য ফিরে চলল। মাথার ওপর ভার্জিনিয়া তামাকের ফুল, ফুলে-ফুলে ছেয়ে আছে আকাশ, তামাকের ঝাঁঝালো গন্ধে চারদিক আচ্ছন্ন, গায়ে লাগছে তামাক পাতা। ফিরতে ফিরতে শুনল শব্দ করে হাওয়া আসছে, পাতায় হলুদ রঙও দেখা যাচ্ছে—আবার পাতা ভাঙার সময় হল বুঝি!

দুটো বার্ণ। তামাক পাতা শুকানোর জন্য বিশেষ ঘরকে বার্ণ বলে। দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা ১৬ ফুট, ইট দিয়ে তৈরি, ছনের ছাউনি, ভেতরে ঘোরান চোঙ থাকে। চোঙের ভেতর একটা তাপমান যন্ত্র থাকে। দুই বার্ণ কুলিয়ে উঠতে পারছে না। পাতা ভেঙে তো আর কাঁড়ি মেরে রাখা যায় না, সঙ্গে সঙ্গে হালি করে বার্ণ ঘরে শুকাতে হয়। রোদে শুকালে সিগারেটের তামাক হবে না, ঘরের ছায়ায় শুকালেও না। সূর্য ভাবনায় ডুবে গেল। মাথার ওপর সবুজ-সাদা রঙের ফুল ও পাতা তা তা করছে, বুকের ভেতর ভালোবাসা হু হু হা হা কাঁপছে, হৃৎপিণ্ড করতলে মুঠোবন্দী হয়ে আছে বুঝি! তানিয়ার চিঠি আসছে না বহু দিন--তানিয়া অভিমান করেছে, তানিয়া বুঝি তুলারাশি, অন্য কাউকে ভালোবাসছে? কতদিন তানিয়ার সঙ্গে দেখা নেই--কতদিন তার শুচি-শুভ্র করতল দেখতে পায় না--বুকের ভেতর চিন চিন করে ওঠে। অজান্তেই সে তার ডান হাতখানা বুকের বাঁ দিকে চেপে ধরে--ওখানে চিনচিন ব্যথা কেন, ওখানে রক্ত চলাচলে ঘাটতি হয়েছে বুঝি, হৃৎ-পিণ্ডটা গ্যাসের চাপে মুচড়ে গেছে, অলিন্দ-নিলয়ে কিসের আন্দোলন? বনি অথবা তুণ্টু তাকে তাড়িয়ে নিচ্ছে, তানিয়া বুঝি অবহেলা করছে? দু' পাশে তামাকের গাছ সারি সারি, মাঝখান দিয়ে সে হাঁটছে, গায়ে লাগছে পাতা, উত্তর-দক্ষিণ বরাবর সারির ভেতর দিয়ে হাওয়া ঢুকছে হু হু, হাওয়া ঠাণ্ডা স্নিগ্ধতা। সমুদ্র থেকে তেড়ে আসা ঠাণ্ডা হাওয়া জুম-পোড়া ধোঁয়া হটিয়ে দিচ্ছে—তামাটে রোদ পুনপুন্ করছে। সূর্য তার রোদের সেনাদের আস্তে আস্তে সামলে নিচ্ছে, বিকেল গড়িয়ে পড়ছে দ্রুত।

কাজ শেষ করে সবাই বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে, কাঁধে তামাকের ভার---তুণ্টু বাড়ি ফিরছে। বাড়ি ফিরে কি করে সে? রজু, আওয়াল, কাজী সবাই তার সঙ্গে মস্করা করে---সূর্য মাঝে মাঝে দূর থেকে ঠাট্টার টুকরো-টাকরা শুনতে পায়। তা একসঙ্গে কাজ করলে অমন করে; ওতে কাজের ক্ষতি হয় বলা যায় না। তবে ফাঁকিবাজ আছে, কইতুরী ফাঁকি দেয়, সবাই তার পেছনে লাগে। পেছনেও যখন লাগে কাজের ক্ষতি হয় বৈকি, হ্যাঁ, তখনও ক্ষতি হয়। আর তামাক টানতে বসলে রাজ্যের কথা বেরিয়ে আসে। কুঞ্জু বিড়ি খায়। শুকনো তামাক পাতা দিয়ে চুরুট পাকিয়ে খাচ্ছে ইদানীং---তামাকের গন্ধটা ভালো জমেছে বলতে হবে। কিন্তু খেতে তামাক টানতে নেই, বিড়ি ফুঁকতে নেই, বিশেষ করে বড় হওয়া পর্যন্ত একেবারে না।

খেত থেকে বেরিয়ে সামনে পড়ল তুণ্টু। বিকেলের শেষ আলোতে

তাকে ম্লান দেখাচ্ছে, কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে। ব্লাউজের ওপর শাড়ি ঠিকঠাক করে সে পথ করে দিল সূর্যকে---সামনে জল থৈ থৈ নদী। সূর্যের মহাধমনী আজ রক্ত চলাচল ঠিক মতো করছে না বোধ হয়, বোধ করি অনিন্দ-নিলয়ের মধ্যবর্তী পর্দায় একটা ফুটো হয়েছে, নইলে শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে কেন! তাও মুহূর্তের জন্য মাত্র। নদীর কূলে হাঁটাহাঁটি করল কিছুক্ষণ। আজ সারাদিনে সে একটা সিগারেট খেয়েছে। আবার বুক ফুলিয়ে গলগল নিঃশ্বাস টানল, নদীটা চলতে চলতে দীর্ঘ হতে হতে অন্ধকার বাঁকা তলোয়ার হয়ে গেল, টিটি পাখি ডাকতে ডাকতে আকাশ উজাড় করে ঘরে ফিরছে, বউ কথা কও আর নিঃসঙ্গ চক্রবাক পাখি আকাশ ছ্যাঁচড়া করে উত্তর দিকে কোথায় হারিয়ে গেল, দূরে চা বাগানে অস্ফুট ঘন্টা বাজছে, টিম টিম করে বিজলী বাতি জ্বলছে ওখানে, নদীর ওপারের বাড়ি-ঘর থেকে কুপিবাতির লালচে আলো কেঁপে কেঁপে ছিঁড়ে আবার তরুণ হয়ে উঠছে---ঝাঁপিয়ে নামছে অন্ধকার, মামা-ভাগ্নে পাহাড়ে জুম পোড়ার উৎসব চলছে, একা একা ঘরে ফিরছে সূর্য, একা একা অন্ধকারে নদী বয়ে যাচ্ছে নদী, আকাশের সূর্য পূর্ব গোলার্ধ ছেড়ে পশ্চিম গোলার্ধে হানা দিচ্ছে…।

ওদিকে আবছা অন্ধকারে বনি ও সহেলিই তো যাচ্ছে! নদীর পাড় দিয়ে ঘরে ফিরছে। ওরা কখন এল কখন এসে ফিরে যাচ্ছে---যেতে যেতে ওরা তারুণ্যের কুলু কুলু কথা বলছে, হৃদয়ের গল্প ফেঁদে হাঁটছে, নদীর হৃদয়ও লুটে নিচ্ছে তাদের কথা। মাথার ওপর সুরাইয়া। কালপুরুষ প্রহরা দিচ্ছে পৃথিবীর যাবতীয় সুষমাকে, কর্কট রাশিটা বড় বেশি জ্বল জ্বল করছে, সেন্টরাস মণ্ডলের তারাগুলো কোথায় ধরতে পারছে না সূর্য, আকাশ-জোড়া ছায়াপথও ওঠে নি---সমস্ত প্রকৃতি জুম-পোড়া আঁচে ফ্যাকাশে হয়ে ধুকপুক করছে। বুকের ভেতর থেকে তামাকের কাঁচা গন্ধ বেরিয়ে আসছে নাকি! নাকি বনির হৃদয়ের গল্প তার হৃৎপিণ্ড জখম করে তুলছে। কর্কট রাশিটা আকাশ ফুঁড়ে কি ওর বুকে ঢুকে পড়েছে?

ওরা কথা বলছে সেদিনের প্রসঙ্গে। সেই যে সূর্য বলছিল সহেলিকে, বিয়ের কথা বলেছিল বলে সহেলির বেণী ধরে টানা! এখন বনি ও সহেলি খোলামেলা আলাপ করছে, কখনও চুপচাপ দু' জন, কখনও এত ছোট করে বলছে যে বোঝা যাচ্ছে না। সূর্য একবার ভাবল এখনই সে তাদের মধ্যে গিয়ে পেঁৗছবে, হৈ চৈ করবে। কিন্তু লুকিয়ে কথাশোনার মধ্যে একটা আলাদা তৃপ্তি আছে আর তা যদি হয় নিজের সম্পর্কে।

হঠাৎ সামনে পড়ল বুড়ো শরীফ আলী। ঘর থেকে উঠোন পেরিয়ে রাস্তার ওপর সূর্যের গায়ে হুড়মুড়ি খেয়ে পড়ল। প্রথমে কথা বলল সূর্য। ওদিকে বনি ও সহেলি দাঁড়িয়ে পড়ল। শরীফ চাচা সূর্যকে ধরে কথা বলছে, লেগে গেছে তামাকের কথায়, দোয়া করল, সূর্যের বুড়ো বাপের কথা বলল, বিয়ে করতে বলল---স্পষ্ট বোঝা যায় ওদিকে সহেলিরা অপেক্ষা করছে তার জন্য। পাড়াগাঁর অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে, গাঢ় হয়ে উঠেছে বার্ণের আগুনের আঁচ--আজ পাতা শুকানোর পঞ্চম দিন চলছে। বার্ণের তাপমাত্রা আজ ১২০ ডিগ্রি ফারেনহাইট থেকে ১৬০ ডিগ্রিতে তুলতে হবে। ওখানে সাধন ও মনীন্দ্র কাজ করছে। চোঙের মুখে তারা এতক্ষণ বড় বড় চেলা কাঠ দিয়ে আঁচ বাড়াচ্ছে। তাপযন্ত্রে তাপ উঠছে, হারিকেন জ্বেলে আরেক দল হালি বাঁধছে।

শরীফ চাচা থেকে বিদায় নিয়ে সূর্য বনিদের কাছে পেঁৗছল। অন্ধকারেও অনুমান করা যায় বনি সঙ্কুচিত, সহেলি হাসছে। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় সহেলি ও বনির মাঝখানে দাঁড়াল সূর্য। কথা বলছে সূর্য। পাড়াগাঁর বাড়িঘরের বেড়ার ফাঁক দিকে উপচে পড়ছে কথা। ধান জমিতে ইরি চাষ চলছে, পাম্প মেশিন দিয়ে জল দিচ্ছে জমিতে--পেছনে অনেক দূরে ফেলে এসেছে চর-সিকস্তি জমি, তামাক খেত, নদী, চা বাগান। বঙ্গোপসাগর তো অনেক দূরে; তবুও প্রত্যেকের হৃদয়ে নদী ও সমুদ্রের কল্লোল বাজছে হয়তো, হয়তো সহেলি তার ব্যক্তিগত ভালোবাসার কথা ভাবছে, হয়তো বনিও ভাবছে সূর্যের কথা--ওরা কথা বলছে তামাক নদী সমুদ্র ও সিকস্তি জমির পরোয়ানা অগ্রাহ্য করে।

ভার্জিনিয়া তামাকের আদত গন্ধটা সিগারেটে পাওয়া যায় না। বার্ণে তামাক শুকান হয়ে গেলে যখন একমাত্র দরোজাটি খোলা হয় ঠিক তখন মিষ্টি গন্ধটা পাওয়া যায়। কিংবা ১৬০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপে যখন তামাক শুকোয় তখন যদি দরোজাটা খোলা যায়—কী মিষ্টি আদুরে সুবাস! যে বনি ও সহেলি সিগারেটের গন্ধ একদম সহ্য করতে পারে না তারাও লম্বা নিঃশ্বাস টেনে বুক ভরিয়ে নেয়, উপচে পড়ে প্রশংসায়। পাঁউরুটির তন্দুর ঘর থেকে যেমন ফুরফুরে মিষ্টি গন্ধ চারদিক ভাসিয়ে দেয় ঠিক তেমন একটা সুবাস বুকের ভেতর জমা করবে বলে বনি নিঃশ্বাস টানতে টানতে পালের মতো বুক ফুলিয়ে নেয়। হয়তো এভাবে ভালোবাসার নিঃশ্বাস টানতে টানতে নারীর স্তন ভরাট হয়, মানানসই হয়ে ওঠে, ভালোবাসে বলেই সুন্দর হয়ে ওঠে নারীর চোখের লাবণ্য এবং ওষ্ঠ। ঠিক তেমনি স্বাভাবিক একটা

ইচ্ছে থেকে সূর্য তার অজান্তে বনির গায়ে টোকা দেয়, সহেলি থেকে জিজ্ঞেস করে মা-বাবার কথা।

সহেলিদের এত কথা বলার কী আছে! কেন সে তানিয়ার কথা ভাবছে না, কেন এভাবে শরীর দুলিয়ে বনির সঙ্গে কথা বলছে, তুণ্টুর কথা কেন মনে পড়ছে—তানিয়া কেন নয়! তানিয়া চিঠি দিচ্ছে না বলে? তানিয়া বুঝি ভালোবাসার যোগ্য নয়? পাড়াগাঁয়ের পথ-ঘাট পেরিয়ে ঘরের কাছে আসতে আসতে তানিয়ার ভাবনা বড় হয়ে উঠছে না কেন? এতক্ষণ সহেলির সঙ্গে কথা বলতে বলতে বনিকে তাড়িয়ে ছুটেছে কেন? যে ভালোবাসার ভারে বনি কথা বলতে পারছে না সূর্য কেন তাকে আরও স্বপ্ন দেখার সাহসী করে তুলেছে—সূর্যের উচিত হচ্ছে কি? এখনই তো ঘরে গেলে বার্ণের তাপযন্ত্র দেখবে। হয়তো তাপ ১৫০ ডিগ্রিই উঠেছে। হৃৎপিণ্ডের চনমনে ব্যথাটা আবার মাথা চাড়া দিয়েও উঠতে পারে, নিজের খেতের তামাক কখন সবাই খাবে সেই ভাবনায় ও স্বপ্নে ঢুলতে ঢুলতে হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে, মা-বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হয়তো নিজের বিরুদ্ধে নিজে লড়তে থাকবে। তানিয়াকে কেন চিঠি দেয় না সে? সূর্যতো জানে তানিয়া অভিমানী, সে তো জানেই তানিয়া তাকে ভালোবাসে। একমাত্র তানিয়াই তাকে সিগারেট খেতে বারণ করে না। পাঁড় সিগারেট খোর সে কখনও ছিল না, বড় জোড় সৌখিন ধূমপায়ী বলা চলে। দিনে দু'টো কি তিনটে—এই তিনটের জন্যও বনি একদিন অভিযোগ করেছিল। মেয়েরা বরাবর পুরুষদের এসব অভ্যাসকে ভালো চোখে দেখে না। তার মানে পুরুষরা শুধু নারীর প্রতিই মনোযোগী হোক---সিগারেট, মদ, তাস কিংবা অন্য কিছুতেই তারা আসক্ত হতে পারবে না। সব মেয়েরা এ রকম উপদেশ দেয়, স্বাস্থ্য সম্পর্কে বাড়াবাড়ি উদ্বেগ প্রকাশ করে। মেয়েরা শরীরের ভেতর শরীর লালন করে জন্ম দেয় বলে? কার স্বাচ্ছন্দ্য সে মেনে নেবে---তানিয়া নাকি বনি! বনি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, ভীরু। মেপে মেপে পা তোলে---হৃদয়কে সবাই তো আর সমান ভালোবাসায় মেলে ধরে না। তানিয়ার প্রিয় ভঙ্গী হচ্ছে তার নিজস্ব গনগনে হৃদয়ের সকল অর্গল খুলে ধীরে ধীরে বন্ধ করা, আবার উন্মোচিত করা, হৃদয় দিয়ে হৃদয় উৎপাটিত করা। তানিয়া তার সকল আকাঙ্ক্ষাকে সুস্থ উপাচারে সাজাতে জানে, শহরের সরলতায় ভাসে, হৃদয় উচ্ছ্রিত ভালোবাসার তেজে জ্বলে—সূর্য তাহলে তানিকেই ভালোবাসে, তহেলে আজই চিঠি লিখবে! বুকের ডাকাত আবেগকে পুষিয়ে রেখে বেশি দিন থাকা যায় না।

হাঁটিতে হাঁটিতে ঘরের মানুষ ঘরে ফিরে আসে। উঠোনের জলপাই গাছের ছায়া মেরে হারিকেনের আলোতে সূর্য বার্ণের কাচের জানালায় চলে যায়। জানালার সূক্ষ্ম ছিদ্রে বাঁধা সুতোর একপ্রান্ত ধরে টেনে আনে তাপযন্ত্র। কাচের ভেতর দিয়ে টেনে আনা যন্ত্রটায় টর্চ জ্বেলে দেখে, লাল দাগটা ১৪৫ ডিগ্রিতে আছে। ওদিকে তুণ্টু হারিকেনের আলোতে চারটে করে পাতা নিয়ে মুঠো বাঁধছে। বাঁশের কাঠিটা খুঁটি বাঁধা তাকের ওপর পাতা আছে, বেশ ক্লান্ত সে। পাশে রজু মিয়া, ওপাশে কইতুরী এবং আরো অনেকে কাজ করেছে। হারিকেনের মৃদু আলো পড়ে বনির মুখ জ্বলজ্বল করছে, সহেলির নাকফুল ঝলসে উঠছে---টর্চ নেভাতেই বনির ছায়া দেখে কাচের জানালায়। ছায়া দেখতে দেখতে সুতো টেনে তাপযন্ত্রটা জানালা থেকে চালান করে দিচ্ছে ভেতরে, তার বুক জ্বলজ্বল জ্বলছে, নিজের মুখ দেখছে কাচের জানলায়, পাশে বনি। তানিয়ার ভালোবাসা কাচের জানলা থেকে দূরে থমকে আছে।

সহেলি বলল, যাই বনিকে দিয়ে আসি। সূর্য তক্ষুণি ১৪৫ ডিগ্রি তাপ থেকে মুখ ফেরাল না, তখনও দেখছে বনিকে কাচের জানালায়। বুকের ভেতর ব্যথাটা খুব সূক্ষ্মভাবে খোঁচা দিচ্ছে---বোঝা যায় কি যায় না, অথচ অস্বস্তি লেগেই আছে। ময়নার হাতে বানানো চুরুটের গন্ধ নাকে-মুখে সুরসুরি দিচ্ছে, অস্বস্তি লাগছে।

সেই রাতে সূর্য স্বপ্নে পড়ল; স্বপ্ন। স্বপ্নের মধ্যে তামাকের খেতটা চলতে চলতে নদী ও চর-সিকস্তি পেরিয়ে সীতা পাহাড়ে চলে গেল, তারপর আর তামাক খেত নেই, পাহাড় নেই, নদী নেই—এক সময় দেখে সে নিজেও তার কাপড়-চোপড়ের মধ্যে নেই। তার নগ্ন শরীরটা ধু ধু বিলের ওপর পড়ে আছে, চারিদিকে নিচু কাশফুলের বন, বিঘৎখানেক উঁচুও হবে না, সাদা ধবধবে কাশফুল ফুটেছে---সেই মাঠ থেকে আবার মজা দিঘির ঘাসের চত্বরে সূর্য শুয়ে আছে, দিঘির দামড়া ঘাস থেকে অগুণতি কাঁকড়া, বিছা ও আরশোলা উঠে আসছে। প্রত্যেকটি বিছা ও আরশোলা তার কাছাকাছি আসতেই থেমে যাচ্ছে, হাতখানেক দূরে শুঁড় বাগিয়ে বসে আছে। বিছাগুলো নড়ছে না, কাঁপছে না, শুঁড়ও দোলাচ্ছে না। তার নগ্ন শরীরটা নিয়ে বিছাদের সামনে সে লজ্জায় পড়ে গেল, হাত দিয়ে সে তার শিশ্নটা ঢেকে রাখল। কী অদ্ভুত কাণ্ড, সে মৃত। মৃত হলেও সবকিছু দেখতে

পাচ্ছে। কাঁকড়া, বিছা ও আরশোলাদের দেখতে পাচ্ছে, কাশফুলের মাথা তোলা দেখছে, বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা কে যেন নখ দিয়ে খুঁটছে।

মাঠের মধ্যে তাকে কে রেখে গেল একবার ভাবল সূর্য। বনি, তুন্টু, সহেলি ও তানিয়া চারজনেই তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে ছিল মনে আছে মাত্র। কিন্তু সহেলি কেন কাঁদল না, তানিয়া কেন চোখ মুছল না; বনিও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল না। কেবল তুন্টু বাকি। তুন্টুকে দেখে সে মনে মনে খুব ক্ষেপে গেল। তামাকের খেতে তাকে ওভাবে দেখাটা দুর্ঘটনা মাত্র। সূর্য তো আর তাকে উঁকি মেরে দেখতে যায় নি। তবে সত্য যে, সে দেখামাত্র চোখ ফিরিয়ে নেয় নি--কে এভাবে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে। সূর্য তো সাধু-সন্ত নয়, বুদ্ধ বা খ্রীষ্টের মতো জাগতিক সবকিছু থেকে নিস্পৃহতা অর্জন করতে পারে নি--আরেক জন্মে যদি পারে, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য যদি জয় করতে পারে...সে তো মোহহীন নয়। তানিয়া তো তাকে শেখায় নি ভালোবেসে আলিঙ্গন থেকে বিরত হতে...স্বপ্নের মধ্যে কাঁকড়া বিছাগুলো সরে গেলেও আরশোলারা আছে.....চুরুটগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে মাথার কাছে। চুরুট খেতে মোটেই ভালো লাগছে না, গতকাল দুটো সিগারেট মাত্র খেয়েছে...এতগুলো হাভানা চুরুট কোত্থেকে এল। হঠাৎ তানিয়া এল, আরশোলারা সরে গেল, কাশফুল কোমর সমান উঁচু হয়ে ঢল নিয়ে এল, তানিয়া একটা আস্ত চুরুট তার মুখে তুলে দিল। চুম্বনের বদলে তানিয়া চুরুট তুলে দিল কেন ভাবল, কাশফুলের বন্যা কী বলতে চায় ভাবল...হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল। ছুটতে লাগল। তানিয়াও ছুটছে কাশফুলে প্লাবন এনে...আর সে ছুটতে পারছে না। তানিয়া ডাকছে, বনি ডাকছে, তার মা ডাকছে, বাবা ও সাহেলি সবাই ডাকছে। ভার্জিনিয়া তামাকের খেতের আল থেকে রজু মিয়া জীবন সাধন মনীন্দ্র তুন্টু কইতুরী সবাই কাঁদতে কাঁদতে ডাকছে...হায়, তানিয়া কেন তাকে আলিঙ্গনের বদলে কাশফুলের মাঠে একা একা ফেলে গেল, চুম্বনের বদলে কেন একটা হাভানা চুরুট মুখে তুলে দিল...।

স্বপ্ন ভাঙলেও স্বপ্নের রেশ থেকে যায়। শিথান থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিল। দেশলাই জ্বালল, সিগারেট জ্বালল, এক টান মেরে ফেলে দিল...স্বপ্ন আর থাকে না।

স্বপ্নটা ভারী ভালো লাগল তার। অমন দিগন্ত-জোড়া কাশফুলের ঢেউটা বাস্তবে দেখতে পাবে না, অমন আকুল হয়ে তামাকের আল থেকে কাঁদতে কাঁদতে কেউ কোনোদিন তাকে ডাকে নি...ঐ কাঁকড়া বিছাগুলো যা একটু বিশ্রি। আরশোলার ঘাড়ের ওপর সাদা ফুটকি আর বাড়িয়ে দেওয়া লম্বা মুখটা দেখতে তেমন মন্দ না, তার পাখার অমন রঙ কয়টি পোকা-মাকড় পেয়েছে! পাখার ফুলটা সুন্দরীদের কপালের টিপ হিসেবে ভালোই দেখাবে।

আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠল, দরজা খুলে বার্ণ দেখতে গেল। বুকের ভেতর সেই অদৃশ্য ব্যথাটা আর নেই—হালকা মনে হচ্ছে নিজেকে, স্বপ্নটা সবকিছু মিলিয়ে তাকে হালকা করে দিয়ে গেছে—দুঃখ তানিয়া একটা চুমু দিল না, একবার আলিঙ্গন দিল না। থাক আর বেদনা জাগিয়ে লাভ নেই। ও ঘরে মা-বাবা-সহেলি ঘুমুচ্ছে। দক্ষিণের ঘরে ছোট ভাইটা একা একা শোয়। বেশ ফুর্তিতে থাকে সে, তামাকের কাজ দেখে, আবার মাঝে মাঝে বিকেলটা কাটিয়ে আসে পাহাড়ের দিকে গিয়ে। তবে কাজের সময় বেশ ফুর্তি করে গল্প করতে জানে, সবাই তাকে মান্যও করে। রাত গড়ায়।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সূর্য। জলপাই গাছে হারিকেনের আলো পড়ে ঝাঁকরা ও ঘোলাটে দেখাচ্ছে, দূরে মামা-ভাগ্নে পাহাড়ে জুম-পোড়া আগুন দেখা যাচ্ছে।

সাধন, ঘুলঘুলি বন্ধ করে দিলে যে, তাপ কত?

১৫০ ডিগ্রি।

আরেকটু বাড়াবে?

বাড়ান যায়।—ঘুমে ঢুলঢুল করছে তার চোখ, লাল চোখ রগড়ে বলল।

ওঘরের তাপ কত?

১৫৫ ডিগ্রি।

সব ঘুলঘুলি-জানালা বন্ধ তো?

বন্ধ।

আগের চেয়ে রঙ ভালো হয়েছে তো?

না। মাঝে-মাঝে ফুটকি আসছে। বোধয় সার বেশি দেওয়ার জন্য।

ইন্সপেক্টরগুলো এক-একটা গর্দভ। একেকজন একেক রকম বলে—শুনে সূর্য একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল।

সূর্য, সাধন ও রজু মিয়া তিনজনেই কাঠের বাক্সের ওপর বসল। বাক্সের মধ্যে তামাক পালা করে গদি সাজিয়েছে। এভাবে চাপ খাওয়ার পর তামাকগুলো চট দিয়ে গাঁট বাঁধা হবে। গাঁট বাঁধা মানে বিক্রির জন্য তৈরি হওয়া। রজু মিয়ার সঙ্গে কথা বলছে সে। কথা বলতে বলতে

একটা সিগারেট খাবে ভাবল, ঠিক তখনই রজু নিজের থেকে ভালো পাতার একটা চুরুট দিল। বলল, এটা কেমন লাগে দেখুন।

চুরুট হাতে নিতেই সূর্য ভাবনায় পড়ল। আজকাল চুরুট বা সিগারেট খাওয়ার সময় কেমন একটা বিশ্রী অনুভূতি জাগে। কেমন একটা ভয়, একটা ভয় জাপটে ধরে...কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার সেটা কেটে যায়।

তামাকের পাতার ধুলোবালি ভালো করে ঝেড়ে নিয়ে সিগার বানালে মন্দ হয় না। কিন্তু বিদেশী চুরুটের চেয়ে ধুলোবালি মাখা দিশি তামাকের চুরুট নাকি কড়া ও খেতে ভালো লাগে। একটা কাঁচা স্বাদ পাওয়া যায়। এক রকম কড়া মাদকতা আছে। তামাকের নিজস্ব কড়া স্বাদ বজায় থাকে। বিদেশী চুরুটে একটা সুগন্ধি মাখা হয়। র‍্যাপারের তামাকের রঙটাও সুন্দর। দিশি র‍্যাপার তামাকে অমন সোনালি রঙটা খোলে না, একটা কালচে ভাব থেকেই যায়।

চুরুট না জ্বেলেই সূর্য বলল, রজু তোমার চুরুটটার বোধহয় ভালোই গন্ধ...কথাটা শেষ করতে পারল না। বিশ্রী একটা কাশি এসে বুকটা ভারী করে দিল। সূর্য মনে মনে লজ্জা পেল। কিন্তু কাশি পেলে লজ্জার কী আছে সে বুঝতে পারল না—বনির সামনে হলে না হয় কথা ছিল, আর তানিয়া হলে কি করত বলা যায় না! তানিয়ার সামনে এরকম কোনোদিন হয় নি। ধরতে গেলে সে সিগারেটে অভ্যস্ত নয়, তবুও...তানিকে এখনই চিঠি লিখব, এখনই যাচ্ছি, চিঠি পড়ে তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে আমার হৃদয় এখনো চকচকে শাণিত...কাশি-টাশি, বুকের সূক্ষ্ম ব্যথাট্যাথা ওসব কিচ্ছু না, যা গরম পড়েছে আর কাজের ধকল যাচ্ছে! চোতের জুম-পোড়া গরম তোমাকে পোহাতে হয় নি...এই পাঁচ মাসে পঁচিশ প্যাকেট সিগারেটও খেয়েছে বলে মনে হয় না। তবুও আরো একটু বসে সূর্য উঠল। তানিয়াকে চিঠি লেখা দরকার, শুধু শুধু তাকে কষ্ট দেওয়ার মানে হয় না। শেষ চিঠিটা উত্তেজনাবশতঃ লেখা, ওটা তো স্বতঃসিদ্ধ নয়। তানি অমনই। আসলে তার হৃদয়টা ভালো, গনগনে আগুনের মতো দাপাদাপি করে...

চিঠি লেখা শেষ হলেও রাত অনেক থাকবে। রাত শেষ হতে অনেক রাত থাকবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভোরে ঘুম থেকে উঠেই বিশ্রী একটা অনুভূতি পেয়ে বসল। সব কিছুতে বিতৃষ্ণা। ঘুম ভেঙেছে ঠিক, কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে নেই। ওঘর থেকে মা উঠতে নিষেধ করেছে, সহেলিকে ডাকতে না করেছে—আহা বেচারী, দিনরাত খাটছে, তামাক তামাক করে ছেলেটা পাগল হয়ে যাবে, একটু ঘুমুক, ঘুমুতে দে। সূর্যও ভাবল। না, এখন উঠবে না। তামাক ভালোই তো হয়েছে। সব পাতা পুরুট হয় নি, সব তামাক ভালো করে হলদে হয় নি, তবুও এক নম্বর তামাক খুব একটা কম হবে না। আধা-আধি হলেও খুব ভালো। কিছু তামাক কালচে হয়েছে, ছিটে পড়া দাগও এসেছে কিছু কিছু তামাকে। বিশটি করে পাতার এক একটি মুঠা বাঁধা হয়। মুঠা বাঁধার সময় খারাপ পাতা আলাদা করা হচ্ছে। সবকিছু বিচার করলে ফলন ভালো হয়েছে বলা চলে। এখন কালবোশেখীর জোর বৃষ্টি না এলেই হলো। গত বছর তো বোশেখ আসতেই বর্ষার মতো বৃষ্টি নেমেছিল।

রজু মিয়ার ডাক শোনা যাচ্ছে। ছেলেরা কাজ করছে বোঝা যাচ্ছে, শোনা যায় তাদের কলকল গলা...চাষ ভালোই হচ্ছে...মা রান্নাঘরে ডাকছে সহেলিকে, বাবার কাশি শোনা যাচ্ছে...তামাকে লাভ হবে ধরে নেওয়া যায়...বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না, অসুখ করেছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু ঠিক অসুখ বলা যায় না ; শরীরটা মেজমেজ করছে বলে নয়, ঘুম কম হয়েছে বলেও নয়—অমনি অমনি ; ভালো লাগছে না। সূর্য জানে চিঠি পেলে তানিয়া অভিমান ভুলে যাবে, তানিয়াও দীর্ঘ চিঠি লিখবে ভালোবাসা জানিয়ে। অনেক কথা লিখবে, অনেক গল্প ফাঁদবে, অবশ্য স্বপ্নের মধ্যে সূর্যকেও কেমন করে পেয়েছে তা লুকোচুরি করে লিখবে, একটু ইঙ্গিত মাত্র দিয়ে কলমটা বাগিয়ে ধরবে—তানিয়া অমনই। কিন্তু যেসব কথা লেখার দরকার নেই বরং সেসব হড় হড় করে লিখে যাবে। কোথায় কোন বান্ধবী কখন কার সঙ্গে রাগ করে কী কী করে নি ইত্যাদি ফলাও করে লিখবে। কী দরকার ওসব লিখে!

চুপচাপ পড়ে রইল সূর্য। একবার সহেলি দরজায় টোকা দিয়ে ফিস ফিস করে ডাকল,...এ্যাই দাদা...

শুনে চুপচাপ পড়ে রইল সূর্য। ভাবল সাড়া দেবে, দুষ্টুমি করবে, খসখস শব্দ করে উত্তর দেবে—করল না। শিথান থেকে নিয়ে ঘড়িটা দেখবে তাও দেখল না, আন্দাজ করল সাড়ে ছয়টা বেজে গেছে, রোদের ঝাঁঝ দেখা যাচ্ছে বেড়ার ফাঁক দিয়ে, বাবার হুঁকোর শব্দ উঠছে, রান্নাঘর থেকে তেলন-পাতিল নড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে, ভাইটা চমৎকার একট গল্প ফেঁদেছে...সূর্য সচরাচর এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠে অনেক কাজ শেষ করে।

পারছে না উঠতে। পারছে না নয়, কেমন যেন ইচ্ছে নেই। কী যেন একটা আড়ষ্টতা পেয়ে বসেছে, যেন আলসেমী...ধুত্তোরি এর কোনো মানে আছে! রজু আর সাধন কী কী যেন বলছে। মনীন্দ্র কোথায় গেল কে জানে! বার্ণ অবশ্য ঠিক মতো চালাবে তারা মিয়া। রাজুকে ঘুমুতে পাঠানো উচিত, ও বেচারী তিনদিন তিনরাত সামান্যই ঘুমিয়েছে। বার্ণ তারা মিয়া চালাতে পারবে। তুষ্টু কইতরী সবাই পাতা ভাঙতে চলে গেছে। বাচ্চা ছেলেরা ঠিক ঠিক মুঠা বাঁধছে, তাদের কলকল শব্দ শোনা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে একেবারে চুপচাপ, পাখিরাও ঠিক তেমনটি করে, অমন চেঁচামেচি স্বভাবের শালিকও মাঝে মাঝে চুপ মেরে যায়। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে সাধনের হম্বিতম্বি শোনা যাচ্ছে, তাহলে সাধন এখনও ঘুমুতে যায় নি। দুপুরে ঘুমুবে বুঝি!

সহেলি এসে দরজার পাল্লায় শক্ত একটা কিছু দিয়ে আঁচড় টেনে যেন বলল, দাদা ওঠো। চুপিচুপি বলল, সাতটা বাজে, তোমার জন্য মা না খেয়েই কাজ করছে। আমিও খাই নি।

সত্যি অন্যায়। এখন ওঠা দরকার। কিন্তু সহেলির ডাকে সাড়া দিতে ইচ্ছে করলেও চুপচাপ শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে। মাথার নিচে দু'হাত দিয়ে চিৎপাত পড়ে থাকতে ভালো লাগছে কেন? শুয়ে শুয়ে দেখে ছাদের বেড়ার বুনুনি ভালো হয় নি, কড়ির সঙ্গে আড়াআড়ি বাঁশ কম হয়েছে...চুপচাপ পড়ে থাকতে ভালো লাগছে কেন, বিপদ সঙ্কেত নয় তো। স্বপ্নটা কি বিপৎপাত বোঝাচ্ছে? কিন্তু স্বপ্নটা তো বেশ মজার, কাশফুলগুলো কেমন মাথা দুলিয়ে ভাসছিল বাতাস, ঠেলে-ঠেলে বাতাসের পিঠে সাদা ফুলের পাপড়ি উড়ে গেল—তানিয়াকে আলিঙ্গন দেয় নি, কিন্তু মিষ্টি করে চোখ বুজে চুম্বনের মতো ভঙ্গিতে কী সুন্দর কাশফুলের ওপর তাকে উড়তে দিল...কী যে ভালো লাগল! না ক্ষমা করা যায় না, আলিঙ্গন তারও দরকার ছিল, খুব আশা করেছিল আলিঙ্গনের মধ্যে বুকের ভার লাঘব করবে...ভালোবেসে আলিঙ্গনের মতো সুখের কিছু পৃথিবীতে নেই, কোমল বুকের আলিঙ্গনের মতো ভালো কিছু পৃথিবীতে আছে বলে তার মনে হয় না...কী যে হাল্কা হয়ে যায় বুকের সমস্ত ভার! কী যে স্বাচ্ছন্দ্য নেমে আসে, কী যে সুস্থি মাধুর্য সম্পন্নতা—আলিঙ্গনে দুই হৃদয়ের সব দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে বুকটা ফুলের রেণুর মতো অনুভূতিশীল হয়ে যায়। তানিয়াকে আলিঙ্গন দিল না কেন, স্বপ্নে আলিঙ্গন দেওয়ার মধ্যে তো কোনো দোষ থাকতে পারে না...তানিয়াকে কি সে ভালোবাসে না তাহলে?

সহেলি আরেকটু জোরে ডাকল, ডাকতে ডাকতে বারান্দার ওদিকে দেখল মা আসছে কিনা, রান্নাঘর থেকে মা শুনতে না পায় মতো ডাকল। এবারও সূর্য সাড়া দিলে না! এভাবে দু-তিন বার সাড়া না দিয়ে সূর্য কৌতুক অনুভব করল, ভাবল চুপচাপ উঠে দরজা খুলে সহেলিকে অবাক করে দেবে, কাঠের দরজা খুলে হুড়মুড় করে তার মুখের ওপর হেসে উঠবে হো হো—বেশ মজা হবে! কিন্তু উঠল না। দেশলাইয়ে শব্দ হবে ভেবে সিগারেট জ্বালল না। যদিও কিছু না খেয়ে সকালে সে সিগারেট খায় না...এসময় সিগারেট জ্বালানোর কোনো মানে হয় না। কেন যে সব সময় সে সিগারেটের প্যাকেট সঙ্গে রাখে, কত সিগারেট যে এভাবে নষ্ট হয়ে গেছে! আবার ডাকল সহেলি। বাবা যেন কোথায় বেরিয়েছে, ভাইটা গেছে বনে, তামাকের কাজ করছে আর সবাই, রান্নার মেয়েটির পেছনে আছে মা—সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত। এবার দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকল, ডাকে বেশ ঝাঁঝ আছে, ভালোবাসা উদ্বেগ ভয় মমতা সব আছে। ডাকল, আবার আবার।

ডাক শুনতে শুনতে সূর্য আগের রাতের স্বপ্নের দিকে ছুটছে, কাশফুলের বন্যা ছুঁতে হাত বাড়িয়েছে, ছুঁয়ে যাচ্ছে কপোল, বুক, রাতের নগ্ন শরীর। মুখে হাসির ছোঁয়া ফুটে উঠল, সহেলির ডাক বাতাসে ভেসে আসছে, তানি ডাকছে কাশফুলের বনে উঁকি দিয়ে, তামাকের ফুল উড়ে আসছে—তানিয়া বলছে, আমাকে আলিঙ্গন দাও চুম্বন দাও, তুমি কোনোদিন ভালোবেসে আলিঙ্গন দাও নি। আমাকে, আমাকে এক মুহূর্তের জন্য চুম্বনে ডুবিয়ে ভালোবাসতে দাও নি, কোনো দিন আলিঙ্গনের স্বাচ্ছন্দ্যে শুইয়ে দাও নি—আমাকে ভালোবাসা দাও, আলিঙ্গন দাও, চুম্বন দাও, সন্তান দাও, সন্তানের ভালোবাসার বীজ দিয়ে জিম্মি করো...না, আর চুপ থাকা উচিত নয় তাহলে, সহেলি বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতে চেষ্টা করল, কিন্তু দরমা বেড়ার ঠাস বুনুনিতে কিছুই দেখা গেল না।

এ্যাই দাদা, ওঠো। তোমার অসুখ করেছ, পরে উঠবে, ঘুমুচ্ছ? সাড়া দাও, আমার স্কুলে যাওয়ার সময় হয়েছে।

বনি এল বইপত্র বুকে চেপে। সাতটা বাজে। বনি বলে, কী হল রে?

দ্যাখ না, উঠছে না, কথা বলছে না।

সে কী! কিছু বলছে না!

সূর্য ভাবল, এ্যাই রে আবার আরেক জন?

এখন কী করি! উঠি!

অনেক চেষ্টা করল, যেন কিছুই হয় নি, যেন এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে তেমন করে চেষ্টা করল। মনে মনে একবার মহড়া দিতে গিয়েও কিছুতেই সবকিছু স্বাভাবিক হল না। আবার চেষ্টা করল, আবার মনে মনে বলল, তুই যা আমি উঠছি। ওদিকে বাচ্চা ছেলেরা কথা বলছে, কী একটা কথা নিয়ে হৈ চৈ হেসে উঠল, ময়না কী যেন বলল একটা ··আবার হাসির ঝড় উঠল।

সূর্য আকাশের মতো পড়ে থেকে মহড়া দিল, বনির মুখে কালো-ছায়া নেমে এল, বুকে চেপে ধরা বইগুলো চেয়ারে রেখে অনেক সাহস সঞ্চয় করে দরজায় ঘা দিল, আপনার অসুখ করেছে ? আপনি···

বনি কথাটা শেষ করতে পারল না, সূর্য বেশ করে জবাব দিল, তোরা যা, আমি উঠছি।

বাব্বা, আচ্ছা তোমার ঘুম! কী ভয়ই না পাইয়ে দিলে—সহেলী আবার বলল--যাব না, একসঙ্গে খাব, তুমি ওঠো।

সূর্য এবার চুপসে গেল। কী বলবে ভাবতে লাগল। গতরাতের চিঠিখানা ভাঁজ করে থুতু দিয়ে খামের মুখ এঁটে বইতে পুরে রাখল-- খসখস শব্দটা ওরা শুনল। সহেলিকে হাসতে শুনল। ঘড়ি দেখল, সিগারেটের প্যাকেট সরিয়ে রাখল, গায়ের চাদর সরাতে সরাতে লুংগি পরল, গেঞ্জিতে গা গলিয়ে দিল। বলল, তোরা যা তো, সক্‌কাল বেলা মেয়েদের মুখ দেখলে সারাদিন···

কথাটা শেষ করতে পারল না। সহেলি বলল, তাহলে সারা দিন দেখতে পারবে না, ডাকতে পারবে না, চা দিতে বলতে পারবে না, মা ডাকতে পারবে না।

মা তো মা। মাকে টানছিস কেন ?

তর্ক করবে নাকি উঠবে।

ভালো লাগছে না উঠতে।

সারারাত পড়েছ ? লিখেছ বুঝি ? সহেলি ইচ্ছে করে চিঠি কথাটা যোগ করল না।

বিছানা থেকে উঠে আরও সময় কাটাল, আয়না দেখল, চুলগুলো হাত দিয়ে ঠেলে দিল, মগজের ভেতর সরসর শিরশির ঢেউ ছুটে গেল।

বুকের ভেতর কোথায় যেন শব্দ হচ্ছে, অবসাদ ছুটে আসছে—ঘুম থেকে ওঠার অবসাদ হতে পারে না কি!

উঠলে, নাকি মাকে ডাকব।

মা বলেছে শুয়ে থাকতে। লাভ হবে না।

কখখনো না। এতক্ষণ শুয়ে থাকতে বলবে না। বাবা এলে হত।

ঘেঁচু পোড়া হত। যা, বকবক না করে সরে যা। খুব কর্তামি শুরু করেছিস আজকাল।

দরজা খুলতেই বনির চোখেমুখে লজ্জা ও উদ্বেগ দেখে তানিয়ার সঙ্গে আলিঙ্গন না করার কথা মনে পড়ল—বনিকে আশা দেওয়ার কোনো মানে হয় না। মনে মনে এতদূর এগোনো ঠিক হয় নি, তানিয়া আলিঙ্গন দেবে, একদিন দিয়েছিল, আবার...স্বপ্নে নাইবা হল। স্বপ্নে অনেক কিছু হয় না, আবার অনেক বেশিও মেলে।

উঠোন থেকে ঝলমল রোদ এসে চোখ ধাঁধিয়ে দিল। সহেলিকে বলল, যা চা তৈরি কর গে, কড়া চা বানাবি। সবকিছুই এখন ঠিক ঠিক চলছে, সব ঠিক হয়ে গেছে, হাল্কা মনে হচ্ছে, রোদের তেজও চোখ-সহা হয়ে গেছে, বনিকেও আর ম্লান দেখাচ্ছে না---সবকিছু সুন্দর। বাচ্চা ছেলেরা চটপট মুঠা বাঁধছে, রাতের ক্লান্তি দূর করতে হুঁকো টানছে ময়না---সবকিছু ঠিকঠাক আছে। জলপাই গাছে একটা বেনেবউ ডাকছে---কুটুম আসছে বুঝি, যদি তানিয়া আসে! হৃদয়ের কুটুম আসলে ভালো হয়।

তানিয়া আসবে তো, যদি আসে, চিঠি পাওয়ার আগেই যদি তানি ছুটে আসে...হৃদয় থেকে ডাকলে আসবে, আসবে, আসতে বাধ্য। বড্ড অভিমানী সে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আরও একদিন পর আরেকটি রাত ভোর হল। ঘুম ভাঙতেই সূর্য শুনল, তুষ্টু আত্মহত্যা করেছে। কেন ? তুষ্টু কি বৈধব্যের জ্বালা ভুলতে আত্মহত্যা করেছে ? সন্তান নেই বলে---কি কারণ থাকতে পারে ? তাহলে পরশু দিন গরমের জন্য ব্লাউজ খোলে নি ? পেটে অবৈধ সন্তান এসেছে ? সূর্য কিছুই বুঝতে পারছে না। তার ওঠা দরকার, দেখা দরকার। আত্মহত্যা করলে পুলিশের টানাটানি, নানা রকম সন্দেহে নানা জন জড়িয়ে পড়তে পারে। কিন্তু আজও বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। তামাক কিনতে কোম্পানীর লোক আসবে। চল্লিশ মণ তামাক গাঁট বাঁধা আছে। এতক্ষণে তাদের চলে আসার কথা--- তুষ্টুর কি হবে ? গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা! না, সে দেখতে পারবে না, ঐ জিব বের করা, টান-টান হাত-পায়ের আঙুল, ভাটার মতো

চোখ, মুখ দিয়ে একটু রক্ত বেরিয়ে আসা, মাথাটা একটু কাৎ করে দড়িতে ঝুলে থাকা---সূর্য দু' হাতে মুখ ঢাকল।

তুষ্টু আত্মহত্যা করল কেন ? আবার বিয়ে করলেও পারত। কেউ না কেউ তাকে বিয়ে করতে রাজী হত, অমন সুন্দর চেহারা---তুষ্টু কি বাঁজা মেয়ে ?

মাথাটা বেশ ধরেছে। শরীরে ঠিক কি হচ্ছে বুঝতে পারছে না। গতকাল কালবোশেখীতে সে ভিজেছে। তামাকের খেতে থাকতেই হু-হু বাতাস ছুটেছিল, মুহূর্তের মধ্যে সবুজ মেঘ এসে ঝাপটে ধরেছিল---বৃষ্টি এল ঝমঝম, মাত্র পাঁচ-সাত মিনিট। কিন্তু কালবোশেখীতে ভিজলে তো অসুখ করে না, তেমন খুব ঠাণ্ডা বৃষ্টিও ছিল না। তবুও শরীরের ভেতর কী যেন ঘটে যাচ্ছে, সহেলি একবার ডেকে গেছে। আজ আর চুপচাপ থাকে নি সে। পাশে বাবা তামাক খেতে খেতে মাকে কী যেন বলছিল, ছোট্ট ভাইটা আবার বনে বেড়াতে গেছে, সহেলি কী একটা খবর দেবে বলে চুপিচুপি বলে গেল---তানিয়ার চিঠি আসে নি তো ? এই সাত সকালে চিঠি আসবে কোত্থেকে। তুষ্টুর খবরটা সব কিছু তালগোল পাকিয়ে দিয়ে গেল। সে পাঁচ-সাত দিনের টাকাও পেত। টাকাটা সে জমা রাখবে বলে নেয় নি। বোধ হয় অনেক ভেবে-চিন্তে টাকা জমাতে শুরু করেছে---বাঁধা কাজ পেয়েছে তো !

সহেলি ভাবল আবার। এখনও সাড়ে পাঁচটা বাজে নি, ইতিমধ্যে তুষ্টুর খবর চারিদিকে রটে গেছে। চারদিকে কী সব কাণ্ড ঘটছে !

সূর্য উঠল না। সহেলি তো সহেলি, তানিয়াও এসময় তাকে ওঠাতে পারত কিনা সন্দেহ। ওদিকে রজু ও সাধন হম্বিতম্বি করছে। বার্ণ এখনও খালি, নতুন হালি ঢোকাতে হবে, দ্রুত কাজ চলছে, বাচ্চা খোকাদের হাত দ্রুত চলছে, দু'টো করে পাতা কাঠির দু' দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ওদিকে পালা সাজানো হচ্ছে, অন্যদিকে রজু ও ময়না চট দিয়ে গাঁট বাঁধছে, নতুন পালা দিতে হবে বলে পুরোনো পালা নেড়ে-চেড়ে রাখছে—কাজ চলছে ; কাজ। মাঝে মাঝে তুষ্টুর কথা দখল করে নিচ্ছে তাদের, মাঝে মাঝে ময়না সাধন রজু মিয়া কী যেন বলে ফিস ফিস করে, মাদার গাছে টকটকে ফুল দুলছে, টুপটাপ ঝরে পড়ছে, শালিকগুলো ক্যাঁচ ক্যাঁচ পাপিস পাপিস ডাকছে। মাঝে মাঝে বকাবকি করে ওঠে সাধন, হালির কাজ শেষ কর, বার্ণ খালি যাচ্ছে। মেঝেয় পানি ঢেলে বার্ণ ঠাণ্ডা করা হয়েছে, শুকানো হালি বের করা হয়েছে। আবার গর্জন করে উঠল সাধন, এই শুয়োরের বাচ্চারা কাজ কর, হাত চালা।

রজুও গাল দেয় কিন্তু তুষ্টুর ঘটনাটা তাকেও কাহিল করে করে তোলে। তাই বলে কাজ না করে চুপ থাকা যায় না, বার্ণ খালি যাচ্ছে। এখনও তুষ্টুকে ফাঁস থেকে নামান হয় নি, মাদার গাছে ঝুলছে। টকটকে লাল পালতে মাদার ফুল ঝরে পড়ছে। সূর্য শুনতে পাচ্ছে মেয়েরা নিচু গলায় ফিসফিস করে কী যেন বলছে, কাজও করছে। কইতুরী ঝাঁটা নিয়ে এসে ছেঁড়া পচা পাতাগুলো সাফ করে নেয়, ফুল্লুরা ও রুখিয়া একেবারে চুপচাপ, মাঝে মাঝে বিনোদিনী ফোঁসফাঁস করছে—বেচারী তুষ্টু ! হঠাৎ ঈষাণ কোণে সবুজ মেঘ দলামোচা পাকিয়ে উঁকি দেয়। খেত থেকে যারা তামাক পাতা আনতে গেছে তারা চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকায়। উঠোনের কাজ ফেলে রজু ছোটে, সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। উঠোনময় ছড়ানো তামাক, নতুন বাঁধা হালিগুলো বাঁশের মাচায় ঝোলানো, বার্ণ থেকে বের করা হালিগুলোও বাইরে, সবগুলো চালা ঘরে আনা দরকার। বিনোদিনী এখন আর ফোঁসফাঁস করছে না, কইতুরী গা লাগিয়ে কাজ করছে। বাচ্চাগুলো আবার কী কারণে হেসে একে অপরের ওপর ঢলে পড়ে। সাধন ধমক দিয়ে ওঠে, কুত্তার বাচ্চা, সবগুলো কুত্তার ছা।

সূর্যের কোনো ভাবান্তর নেই। সহেলি কাজে লেগেছে, মা-বাবাও ব্যস্ত। ছোট্ট ভাইটি পাহাড়ে কী করছে কে জানে ? কাজে ডুবে গেছে সবাই। কেউ খোঁজ নিচ্ছে না সূর্য কোথায়, সূর্য তেমনি শুয়ে শুয়ে একটা সিগারেট ফুঁকছে। বোধ হয় জীবনে এই প্রথম সে সকালে কিছু না খেয়ে আয়েশ করে সিগারেট টানছে, বুকের ভেতর ব্যথাটা চনমন করছে...করুক গে ! তানিয়াকে লেখা অনুরাগ ভরা চিঠিখানা ডাকবাক্সে ফেলেছে, তাকে আসতে লিখছে, যেন দু' দিনের জন্য হলেও আসে, এসে তাকে নিয়ে যায়..... হৃদপিণ্ডটা পচে গেছে মনে হয়.....

ঝাপটা মেরে ধুলোবালি উড়িয়ে কালবোশেখী নেমে এল। বাতাসের দমকে মাদার ফুলের পাপড়ি এক প্রস্থ ঝরে পড়ল। সবুজ মেঘ এক মুহূর্তে কালো হয়ে আকাশটা জবরদখল করে নিল। তছনছ করে ছুটছে ঝড়ো বাতাস। আবার ঝাপটা এল আবার গাছপালা সাঁই সাঁই করে এ ওর গায়ে আছড়ে পড়ল। ঘরের আড়ালে দাঁড়ানো জলপাই গাছটা একবার যেন সবকিছু কান পেতে শুনল, তারপর গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলে হারামজাদার মতো মাথা আছড়াতে লাগল। পুকুর পাড়ের ঝাউগাছটা তো প্রথম থেকেই শোঁ শোঁ করছিল, এখন তার দেমাগ সবচেয়ে বেশি, মাথা উঁচিয়ে সকলের কাণ্ডকারখানা দেখছে আর শোঁ শোঁ হা হা হাসছে।

দরকচা মেরে দাঁড়ানো সোঁদাল গাছগুলো পাতা ঝরিয়ে আগাম ফুল নিয়ে এসেছে, ঝুলন্ত সোনালি-পীত রঙের ফুলের কলিগুলো একে অপরের গায়ে ঢলে পড়ছে—সূর্য পড়ে আছে, যেন বুকের বাঁ পাশটা কিসের ভারে চাপ খেয়ে আছে, জমে আছে—শ্বাস নিতেও যে কষ্ট। চারদিকে বাতাসের এত উদ্দামতা, কিন্তু তার বুকের ভেতর বাতাসের ঘাটতি কেন—সবাই কাজে ব্যস্ত, হৈ চৈ ছোটাছুটি করছে, তামাকের হালিগুলো চালাঘরে তুলে রাখছে—সূর্য আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ে। তানিয়া নয়, বনি নয়, সহেলি-মা-বাবা-ভাই কেউই নয়, কেউই তার বুকের ভারটা লাঘব করতে ছুটে আসছে না।

খোলা জানালা দিয়ে পলতে মাদারের একটা পাপড়ি এসে পড়ল তার বিছানায়। আঃ কী টকটকে লাল, নাকি পচে কালচে হয়ে গেছে কে জানে! মাদারের পাপড়িটা দু' আঙুলে ধরে চোখের সামনে তুলে ধরল সূর্য।

কী লাল, কী ভয়ঙ্কর!

সূর্য চোখ বন্ধ করল—কাল-বোশেখের তাণ্ডব কী মধুর! সে চোখ বুজে চোখের ওপর মাদারের লাল পাপড়িটা ধরে আছে—কাল বোশেখির তাণ্ডবে আর একটি মাদার গাছে তুষ্টুর জিব বের করা মৃতদেহটা দোল খাচ্ছে।

[গল্পগ্রন্থ : উল্কি একটি প্রেমের গল্প]

বন্য স্বপ্ন

এক রকম আচ্ছন্নের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনের পলতে মাদার গাছের পাশ দিয়ে যেতে যেতে শঙ্খচূড় সাপটি দেখতে পেল সে। সাপ কখন ঝাঁপি থেকে বেরিয়ে গেল, এবং কী ভাবে বের হল ভাবতেই সে অবাক হয়ে গেল। তাকে দেখতে পেয়ে সাপ ফোঁস ফোঁস করে আগে আগে ছুটল। এভাবে তার আগে আগে চলার মধ্যে কোনো অর্থ আছে মনে করে সেও তাকে চুপচাপ অনুসরণ শুরু করল। গতকালও সাপের মাথার রঙ ছিল হলদেটে, এখন ফণার ওপর চারটি এড়ো রেখা, কালোর ওপর হলদে চিহ্নগুলো জ্বলজ্বল করছে। একবার সে ভাবল সাপটি ধরে ঝাঁপিতে রেখে আসবে, কিন্তু ভালো করে মনোযোগ দিতেই বুঝতে পারল সাপের পালিয়ে যাবার মতলব নেই বরং কোথাও যেন তাকে ডেকে নিয়ে যেতে চায়—কাজেই সে চুপচাপ অনুসরণ করে চলল।

চার মাস আগে জোড়ের পুরুষ শঙ্খচূড়টি সে ধরেছিল, স্ত্রী সাপটি সেই ফাঁকে চোখের পলকে গর্জন গাছের কোটরে যে ঢুকল আর বের হল না।

শঙ্খচূড়কে অনুসরণ করতে করতে সে ভাবল—দেখাই যাক না কি হয়! বরং সাপের পিছু পিছু চলার মধ্যে এক রকম উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ অনুভব করল সে। চারপাশের গাছপালার সঙ্গে নীরবে কথা বলতে বলতে চলল। পাড়াগাঁর চেনা পরিবেশের মধ্য দিয়ে সাপকে অনুসরণ করে পৌঁছল সেই গর্জন গাছের নিচে। সে খোড়লটি ভালো করে দেখল, সেখানে জোড়ের স্ত্রী সাপটি পালিয়ে গিয়েছিল। গাছের নিচের আলো-ছায়ায় সাপ দুটি হিস শব্দ করে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে…এক একবার ছুটে দূরে সরে যায়…মাথা উঁচু করে ঠোকাঠুকি করে…দেহের সঙ্গে দেহের শক্ত পাক লাগায়…দাঁড়িয়ে ওঠে—বোধহয় সাপ দুটিতে শঙ্খ লেগেছিল। একবার যখন দুটি সাপের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যে ছাড়াছাড়ি হয়, ঠিক তখন চোখের পলকে সে পুরুষ সাপটিকে ধরে ফেলে। কিন্তু স্ত্রী সাপটি ধরতে পারে নি।

সে দেখল কোটরের খাঁজে খাঁজে জমেছে তেল, জমাট বেঁধে হয়েছে স্বচ্ছ দানাদার ধূপ। সাপটি সেই গর্তের মুখে গিয়ে একবার মাথা তুলে

চারদিকে তাকাল। ফণা তুলে স্থির হয়ে যখন দাঁড়াল তখন মোটেই মাথা দোলাল না, সোজা দণ্ডের মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে তার থেকে যেন অনুমতি প্রার্থনা করছে। উদ্যত ফণা শঙ্খচূড়কে দেখে সে এক বার ভাবল, স্ত্রী সাপটির মতো যদি গর্তে ঢুকে চুপচাপ বসে থাকে, আর বের না হয়?

মনের মধ্যে সন্দেহ দানা বাঁধতেই সে মুহূর্তের জন্য আবার ভেবে নিল কি করবে, সাপের মন বুঝতে চেষ্টা করল। সাপের মন আছে কিনা সে জানে না, সর্পবিশারদরা কি বলে তাও তার জানা নেই, তবে সে মনে করে মানুষের যখন মন আছে সাপেরও মন থাকা স্বাভাবিক। এসব ভেবে হাতের কাঠিটা বাগিয়ে ধরল—এখুনি বুঝি সে কাঠি দিয়ে সাপকে উত্তেজিত করতে আঘাত করবে, ফিরে দাঁড়াতে বাধ্য করবে?

না, পালাবার কোনো লক্ষণ নেই বলা যায়; এ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সে সাপকে গর্জন গাছের খোঁদলের গর্তে ঢোকার অনুমতি দিল, এবং বিড়বিড় করে বললে—যা, সাত রাজার মানিকটা নিয়ে আয় তারপর তোর বউকে নিয়ে মনের মতো ঘর বাঁধ।

সাপকে ঢুকতে গিয়ে গর্তের মুখের ওপর নতজানু হয়ে দেখতে দেখতে সে কতক্ষণ ভাবল ঠিক মনে নেই। ইতিমধ্যে আরো কি কি ঘটল তাও মনে পড়ছে না—শঙ্খচূড়ের কথাও একসময় ভুলে গেল। দেখল দূরে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে উঁচু-নিচু ঘর, দুই টিলার মাঝে হাতির খেদার মতো রাস্তা, বড় বড় চাপালিশ ও গর্জন গাছ মাথা তুলে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে জলাভূমি, জলাভূমির পর থেকে শুরু হয়েছে বন, সেই বনে নোয়াখালী-বরিশাল থেকে আসা লোকের নতুন নতুন বসতি গড়ে উঠেছে, সেখানে পাহাড়ের পাদদেশে চিরকালের চেনা পাড়াগাঁ অচেনা আচ্ছন্নতায় ডুবে আছে।

স্বপ্ন ভাঙতেই সে বাস্তবে দেখল, চার মাস আগে ধরা শঙ্খচূড়ের পেছনে নয়, বরং বাসমতির ঘরের দরজার সামনে নতজানু হয়ে সে বসে আছে। উঠোনের দিক থেকে ঝিঁঝির একটানা শব্দ আসছে, পুকুর পাড়ের গাবের গাছ থেকে একটা পেঁচা ডাকতে ডাকতে নতুন রোয়া ধানখেতের দিকে চলে গেছে, বসন্তের অসচরাচর হাল্কা কুয়াশা জমেছে চারদিকে, ডুবতে-বসা চাঁদের শেষ জ্যোৎস্নার ম্লান আলোতে চরাচর ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। সে নিজেকে বাসমতিদের ঘরের দরজায় আবিষ্কার করে কেঁপে উঠল। গতকাল তো সন্ধের পরপরই সে নিজের বিছানায় হাল্কা শরীর-মন নিয়ে শুয়েছিল, সময় মতো ঘুমও এসেছিল, তারপর কখন ঘরের দরজা খুলে এতদূর চলে এল, কি করে এল? সে উঠে দাঁড়াল। তারপর নিশি-পাওয়া আচ্ছন্নতা কেটে যেতেই সে বুঝল এভাবে বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়।

কিন্তু বাসমতিকে একবার না ডেকে এভাবে শূন্য হাতে ফিরে যাবে সে? বাসমতিও যদি এই মুহূর্তে একটা স্বপ্ন দেখে—বাসমতিকে একবার ডাকলে হয় না? খুব ইচ্ছে করল বাসমতিকে ডেকে সব কথা খুলে বলে, জিজ্ঞেস করে স্বপ্নের শঙ্খচূড় ও গর্জন গাছের কথা, সাপের মণির কী অর্থ। ঐ গর্জন গাছের নিচে কোনো গুপ্তধন নেই তো, সাপের মানিক লুকানো আছে বুঝি—ভাবতে ভাবতে তার বুকটা ধড়াস ধড়াস কেঁপে উঠল।

তবুও আস্তে আস্তে সে ফিরে দাঁড়াল, ফেরার আগে দরজাটা একবার আলতো করে ছুঁয়ে দিল, তারপর পা বাড়াল উঁচু বারান্দা থেকে উঠোনে—বাসমতিকে আর ডাকতে সাহস পেল না। রাস্তায় বেরিয়ে সে দেখল বসন্তের হাল্কা কুয়াশা জমেছে নতুন রোয়া ধানখেতের ওপর, পাহাড়ের দিকে আবছা অন্ধকার জমে আছে আর চাঁদতো আলো হারাতে বসেছে সেই কবে থেকে।

ভোরের আলো ফুটতেই সাপের ঝাঁপি নিয়ে সে তড়িঘড়ি গর্জন গাছের নিচে ছুটে গেল। ঝাঁপি খুলতেই দেখল শঙ্খচূড় পলকহীন চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। অমন তেজী ও সাহসী শঙ্খচূড় তাকে দেখে কয়েকবার মাত্র জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিল, তবুও সেই নিঃশ্বাসে বয়ে গেল ঝড়। কিন্তু বেতের ঝাঁপি থেকে বের হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, পালাবার কোনো রকম চেষ্টাও করল না। গত চার মাস কিছু খায় নি বলে হোক, কিংবা অভিমানবশতই হোক সাপ পলকহীন চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে রইল শুধু। মাথাটা নিজের কুণ্ডলির ওপর ভাঁজ করে রেখে বিশ্রাম নিতে লাগল, ভোরের আলো গায়ে লাগতে যেন আরো আয়েশী হয়ে পৃথিবীর যাবতীয় সুখঃ[illegible]-অতীত আরেক পৃথিবীর কথা ভাবতে লাগল।

সে কাঠি দিয়ে বেতের ঝাঁপিটা একবার নেড়ে দিল, হাতের ডালাটা দূরে এক পাশে রাখল, আবার একটু উসকে সাপকে গর্জন গাছের কোটরের গর্তে ঠেলে পাঠাতে চেষ্টা করল—কিন্তু শঙ্খচূড় কী জানি কী ভাবল ভেবেচিন্তে তেমনি অনড় পড়ে থেকে ফুঁসে ফুঁসে স্পর্ধা দেখাতে লাগল; বসন্ত এলেও শীতঘুমের আয়েশ নিয়ে পড়ে রইল।

সে সাপটি রেখে একটু দূরে সরে দাঁড়াল, একবার ভাবল মেরে চামড়াটা তুলে নেয়। চার মাস ধরে যে কিছু খায় না তাকে কষ্ট

দিয়েই বা কী লাভ। তারচেয়ে ছেড়ে দেওয়া ভালো, সামান্য চামড়ার জন্য লোভ করা উচিত হবে না। বাসমতিও বলেছে, ওটা ছেড়ে দাও, শঙ্খ-লাগার সময় জোড়ের সাপ ধরেছ, তোমার ভালো হবে না, অই কালসাপকে দূর করো।

আবার তার গতরাতের স্বপ্নের কথা মনে পড়ল, বাসমতিকে মনে মনে ডাকল। বাসমতিতো প্রতিদিন তাদের মনাভিটেয় তরকারী তুলতে আসে, কিন্তু আজ এখনো আসে না কেন? বাসমতিকে বিয়ে করতে টাকা চাই—অত টাকা সে পাবে কোথায়? সাপের চামড়া বিক্রি করে, নানা জাতের সাপ ধরে বেচাবিক্রি করে আর কয় টাকাই বা জমানো যায়। মাঝে-সাজে ময়াল সাপ পাওয়া যায় বটে, সস্তা দরে হরিণের চামড়াও পাওয়া যায়, কিন্তু ভালো দাম পাওয়াটা তার নিজের মর্জির ওপর নির্ভর করে না। ঠিক মতো খদ্দের পাওয়া চাই, কিন্তু পাহাড়ের পাশে আর পাড়াগাঁয়ে এসব জিনিস কে-ই বা কিনতে চায়। দূরে গঞ্জের বাজারে গেলে বেশ দাম পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানেও পুলিশ আছে। এতোসব কাণ্ড করেও কি পারা যায়? নিজের খাওয়া-পরা আছে, বুড়ি মা আছে, সুখ-অসুখ আছে--ভাবতে ভাবতে আবার সাপের দিকে চোখ তুলে তাকাল সে।

মাঝে মাঝে সে ভাবে বাসমতিকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে গিয়ে ঘর বাঁধে। কিন্তু ভাবনা ও স্বপ্ন দেখাই সার, স্বপ্ন তাকে ডাকতে ডাকতে বনের ভেতর নিয়ে যায়, খোঁড়াতে খোঁড়াতে তাকিয়ে বেড়ায়। এসব স্বপ্ন দেখে দেখে সে আলসেমিতে ভোগে, তখন আর কিছুই ভালো লাগে না। তবুও জোড়ের দুটি সাপ যদি ধরতে পারত--শঙ্খলাগা সাপ নিয়ে কত গল্পই না সে শুনেছে--ওরা নাকি ভাগ্য পাল্টে দিতে পারত।

এদিকে পাড়ার অনেকেই চায় সাপটাকে সে মেরে ফেলুক। কিন্তু চারমাস ধরে যে-সাপের খাওয়া-দাওয়া নেই সে-সাপকে মারতে ইচ্ছে করে না, বেচে হাতছাড়া করতেও কষ্ট হয়। সে জানে শঙ্খচূড় জাতি সাপ, ভালো খদ্দের খুঁজে বেচতে পারলে দাম পাওয়া যাবে—কিন্তু সাপটার জন্য তার ভারি মমতা। বাসমতিও বারবার বলছে ওটা ছেড়ে দিতে--পাড়ায় লোকজন তাকে ভয়ও দেখিয়েছে। মা বলে শঙ্খ-লাগা সাপ অভিশাপ দেয় এবং সেই অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলে। তবুও সে এতদিন ধরে সাপটি আগলে রেখেছে বসন্তের শুরুতে জোরের সাপটি খুঁজে বের করবে বলে।

বসন্তের হঠাৎ নামা কুয়াশা তখন দলামোচা হয়ে সমভূমিতে নেমে এসেছে, পথে পথে নামা মানুষের চুলে দানা দানা কুয়াশায় বিন্দু লেগে আছে, যাযাবর পাখিরা বিল ও জলাভূমি ছেড়ে দেশে ফেরার তোড়জোড় শুরু করেছে, ঠিক তখন হঠাৎ করে কুয়াশা ফুঁড়ে আচমকা তীব্র একটা গন্ধ ছুটে আসে। সে উত্তেজিত হয়ে ঝাঁপিতে রাখা সাপের দিকে ছুটে গেল, কান পেতে শুনল সাপ ফোঁসফাঁস করছে কিনা—না, একেবারে চুপ, শীতনিদ্রা শেষ হয় নি বোধ হয়। অথবা শীতঘুম ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে তার সঙ্গীর কথা ভাবছে কিনা কে জানে—ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে বুকের কাছে প্রেয়সীকে চাই...যেমন বাসমতিকে চাই তার, যেমন বাসমতির বড় বোন ফুলমতিও হয়তো স্বপ্নের ভেতর কাউকে হাতড়ে বেড়ায়!

তাহলে গন্ধটা কি জোড়ের স্ত্রী সাপের, স্ত্রী সাপটি ঋতুমতী হয়ে গন্ধ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে? গন্ধটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপির সাপ আড়মোড়া ভাঙে, চোখ তুলে তাকায়, আবার যেন আলসের মতো পড়ে থাকে।

আস্তে আস্তে সে রাগে ফুঁসতে থাকে। সাপটাকে সে মুক্তি দিচ্ছে অথচ তার নড়াচড়া নেই, ওদিকে বাসমতিও আসে না—ঐ তো একটু দূরেই বাসমতিদের উলু খড়ে ঢাকা মনাভিটা। ভিটের এক দিকে আট-দশটা আমগাছ দাঁড়িয়ে আছে, যেন ওরা কিছু বোঝে না, কিছু জানে না, তার পাশে শিম আর অড়হড়ের গাছগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন তার জীবনের ব্যর্থতা দেখছে--তাহলে বৃক্ষদেরও বোধ শক্তি আছে, বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা রাখে তারা! ওখানে বাসমতির আসার কথা--গর্জন গাছের দিক থেকে সে দেখে ওখানে কেউ নেই, সাপও তেমনি পড়ে আছে ···হয়তো ঘুম ভাঙা বসন্তের রোদের আশায়। তবে সাপের বুঝি অভিমান হয়েছে, শীতনিদ্রা থেকে উঠে দুর্বল হয়ে পড়েছে--নাকি আত্মহত্যার পরিকল্পনা নিচ্ছে! বাসমতিও কি তার কথা ভুলে গেছে, সাপটা আবার গর্জে উঠছে কেন··· ?

সে সাপ ধরে বলে বাসমতির বড় ভয়। সে তো সাপুড়ে নয়, সাপের বিষের ব্যবসা করে না, ওঝাগিরিও করে না। সাপের চামড়া বিক্রি করে সে, হরিণের চামড়া সংগ্রহ করে বেচে, মৌচাক কাটে। তার বাবার মধুর ব্যবসা করত, সাপ ধরতে জানত—বাপ-দাদার পেশাই তো ছেলেরা গ্রহণ করে। তার বাবা মরেছে বহুদিন আগে, তাই বলে সে শোকে আত্মহত্যা করতে পারে না। বাসমতিকে সে বিয়ে করতে চায়, বাসমতির জন্য বুকের ভেতর টিপটিপ করে—সাপের উদ্যত ফণার সঙ্গে তার নিজের কামনা-বাসনাও মাঝে মাঝে মাথা তুলে দাঁড়ায়। সাপের

ফণা বশ করতে শিখেছে সে, ক্ষিপ্রগতিতে হাত চালিয়ে সে কাবু করে উদ্যত ফণা সাপ, মুহূর্তের মধ্যে পথ চলতি সাপ হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে জানে।

ঝাঁপিতে রাখা শঙ্খচূড়ের কাছে এসে সে আবার তাকে লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে দিল। সাপ আগের মতো অপলক চোখে তাকিয়ে জিবটা বের করল শুধু, কয়েকবার গর্জে আবার চুপচাপ পড়ে রইল। ঠিক তখনই সে বাসমতিকে মনাভিটেয় দেখতে পেল। দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে বাসমতির কাছে ছুটে গেল না--নির্জন ঝাড়-জঙ্গলে ভরা উঁচু ডিবির ভিটেটা তখন সকালের রোদে ঝিলমিল করছে, গর্জন গাছটা মাথা তুলে বনবাদাড় ও জাগতিক সবকিছু তাকিয়ে দেখছে। ···শঙ্খচূড়, গত রাতের স্বপ্ন, গাছপালা, উলুখাগড়া, বাসমতি ও বসন্তের কুয়াশা ভেদ করা সূর্যের আলোয় সে এবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল।

উলুবন ও অড়হড়ের ঝোপ থেকে পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ বাসমতি ইশারায় তাকে ডাকল। কিন্তু চাক বেঁধে মটকা মেরে পড়ে থাকা সাপ ফেলে সে যাবে কিনা ভাবল--কারণ সে পরখ করে দেখতে চায় সাপটা কোনদিকে যায়। গর্জন গাছের গর্তে গিয়ে আশ্রয় নেবে, নাকি স্ত্রী সাপের দেহনিঃসৃত গন্ধ যেদিক থেকে আসছে সেদিক যাবে--তাহলে স্বপ্ন কি সত্য নয়?

বাসমতি আসার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খচূড় আড়মোড়া ভেঙে মাথা তুলল। সেই তীব্র গন্ধটা কোথা থেকে এসে বাসমতির নাকে লাগল। ভয়ে কেঁপে উঠল বাসমতি, অস্ফুট চিৎকার করে সেঁটে দাঁড়াল তার গায়ের সঙ্গে। সে বাসমতিকে টেনে নিয়ে গেল আরো দূরে, দূর থেকে দেখল শঙ্খচূড় ঝাঁপি থেকে মাথা তুলে বের হচ্ছে। গায়ের হলদেটে কালো রঙ গতিশীল হয়ে ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটছে। আস্তে আস্তে সাপ জিব বের করে স্থির চোখে এগিয়ে চলেছে গর্জন গাছের গর্তের দিকে, একটা চলমান রেখা ঘাসের সবুজের ওপর দিয়ে পথ কেটে ছুটে চলছে--উত্তেজনায় আনন্দে ফেটে পড়ল সে, দেখতে দেখতে সে এক হাতে বাসমতিকে জাপটে ধরে টেনে নিয়ে চলল সাপের দিকে, আবার কোমর ছেড়ে হাত ধরে টানতে টানতে আলিঙ্গনে বেঁধে আত্মহারা হয়ে গেল।

বলল, বাসমতি দ্যাখো, আমার গত রাতের স্বপ্ন···গাছের কোটর শঙ্খচূড় তার মানিক রেখেছে, চলো, দেখে আসি!

বলতে বলতে সে বাসমতিকে ছেড়ে আচ্ছন্নের মতো গর্জন গাছের দিকে পা বাড়াল, কিন্তু বাসমতি তাকে ছাড়ল না। শুধু বলল, কাজ নেই, ওকে যেতে দাও।

বাসমতি তার কোনো কথা শুনল না, বরং তাকে জোর করে ঘাসের ওপর বসিয়ে দিল। বাসমতির চোখে-মুখে তখন নিঃশ্বাসের ঝড় বইছে, ফোঁস ফোঁস করছে। ফুঁসে-গর্জে বাসমতি শুধু বললে, আমার স্বপ্ন!

সে বাসমতিকে প্রশ্ন করল, কিসের স্বপ্ন!

ওরা দু' জনে দু' জনের স্বপ্নের কথা বলতে বলতে ঝাঁকড়া মাথা গর্জন গাছের চুড়োর দিকে তাকাল—এত উঁচু যে মাথা কাত করে দেখতে হল তাদের। বাসমতি তার গতরাতে দেখা স্বপ্নের কথা বলতে বলতে ফুঁসে উঠল, নিজের বোনের প্রতি এবং তার প্রতি আক্রোশে ফেটে পড়ল।

ফুলমতিকে কেন তুমি শুয়ে শুয়ে চুমু খেলে, কেন ফুলমতির বুকে মুখ রেখে সন্তান দেবে বললে---বলতে বলতে বাসমতি কাঁদল হু হু--কেন তুমি ফুলমতিকে আমাদের মানভিটেয় নিয়ে এলে, কেন?

সে চুপচাপ শুনল, নিজের কথা বলতে চেষ্টা করল, বোঝাতে চাইল নিজের দেখা স্বপ্নের অর্থ, মিল খুঁজতে চেষ্টা করল বাসমতির দেখা স্বপ্নের সঙ্গে নিজের স্বপ্নের, তারপর কুয়াশা কেটে ঝলমল রোদ ওঠা দেখে সে বাসমতিকে আগলে নিতে চেষ্টা করল···বাসমতি তাকে কোনো সুযোগই দিল না।

বাসমতি আবার প্রশ্ন করলে, ফুলমতিকে বিয়ে করতে চাও তুমি?

বাসমতির মুখে হাত দিয়ে সে থামিয়ে দিল—হিংস্র হয়ে বাসমতির মুখ দু' হাতে তুলে ধরে বলতে চেষ্টা করল, তোমার বোনকে নয় তোমাকে। কিন্তু বলতে পারল না, উত্তেজনায় তার শরীরে সাপের মতো ক্ষণে ক্ষণে আক্ষেপ খেলে গেল--শঙ্খচূড়ও তখন চারদিক দেখে শুনে গর্জন গাছের কোটরের মুখে ঢুকে গেছে!

সে বাসমতিকে আবার বোঝাতে চেষ্টা করল, দু' হাতে আলিঙ্গনে বেঁধে গর্জন গাছের দিকে তাকাল, আক্রোশে গলা টিপে ধরল···।

পরমুহূর্তে সে দেখল, সূর্যের আলো নয়, অন্য এক রকম জ্যোতি নিয়ে সাপটি হিসহিস করে তার সঙ্গীকে নিয়ে গর্জন গাছের গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে দুলকি চালে, তাদের দিকে এগিয়ে আসছে, নির্ভয়ে এগিয়ে আসছে।

[গল্পগ্রন্থ ঃ নদীর নাম গণতন্ত্র]

ভালোবাসা

প্রথম অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর পর একরকম সুন্দর দিনের কথা মনে পড়ে। চারদিকে মুক্তির একটা ঝলমল রূপ, বাতাসের ফু'য়ে ছুটে চলা তারুণ্য, ঝনঝন মরমর শব্দ করে বেজে ওঠা বসন্ত, বসন্তের নিঃশ্বাসে উপচে পড়া রমণীদের মধুর দেমাগ---যুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলো মনে পড়লেও মুক্তির আনন্দে সকলেই কী খুশি। ঘর নেই, বসতবাড়ি ও গাছপালায় শ্রী-ছাঁদ নেই, স্বজন বান্ধব হারানোর বেদনা--সকলেই তবুও কী একটা লঘুভার নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে. বেঁচে আছে বলে পূর্বপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানায়। সকলেইতো বলাবলি করছে জিনিসপত্রের দাম আর বাড়বে না——এর চেয়ে খুশির কথা আর কীই বা হতে পারে! রোদভরা স্নিগ্ধ মাঠ চারদিকে, পালতোলা নৌকোয় চলকে উঠছে নদী, সমুদ্রের ছলোচ্ছল ঢেউয়ে পাল খাটানো জেলে নৌকোয় অপরূপ দৃশ্য কে ভুলতে পারে! পূর্বপুরুষের ভিটেবাড়ির একটা আলাদা সোঁদা গন্ধ আছে। মাঘের শেষ দিকে একবার বৃষ্টিও হয়ে গেছে, কথায়ও বলে 'যদি বর্ষে মাঘের শেষ ধন্যি রাজা পুণ্যি দেশ'। গ্রামে গ্রামে ঢেঁড়া পিটিয়ে দেওয়া হয়েছে এক ফালি জমিও যেন অনাবাদী পড়ে না থাকে। যেন ভিটেতলার জমি, মজা পুকুর আর নদী-সিকস্তি ভূমি...পূর্বপুরুষের মধ্যে সব চেয়ে দক্ষ কর্মী মানুষটি কেমন করে হাতিয়ার তুলে নিয়ে মাটি কুপিয়ে চাষ করত সে-কথা স্মরণ রাখা তো অধস্তন পুরুষের গৌরবের বিষয়।

চোত মাসে ফুটি-তরমুজের সুবাস সিকস্তি জমিতে কেমন সৌরভ তুলতে সেও মনে রাখার কথাই——এসব কি কেউ ভুলতে পারে? উঁচু-উঁচু টিলা জমির পোড়া মাটির বাগানে যখন আনারস পাকতে শুরু করে, গন্ধে চারদিকটা একেবারে ম-ম করে। রসালো জলডুবি আনারস ছুলে না-কেটে কামড়ে কামড়ে খেতে থাকে কেউ, আর এমন একদিন গেছে যখন বাগানের মালিক বলত, আরে বাপু খাও-খাও খেতে এসে যত পারো খেয়ে নাও, কিন্তু খাওয়ার সময় দু-চারটা নিয়ে যাওয়ার কথা বলো না। ফল খেতে-আসা লোক তো বাগানের লক্ষ্মী, তাতে ফলন হয় আরও বেশি। তা আপনি ক'টা খেতে পারেন? দুটো কিংবা তিনটে খাওয়ার পর তো নিজেই থেমে যাবেন! যখন হাত চুইয়ে রস গড়িয়ে পড়বে লোভী না-হলেও তখন হাতের পিটটা চেটেপুটে খেতে আপনার খুব ইচ্ছে করবে। ও যে গড়িয়ে পড়া মধু! ফুটির গন্ধ তো খোদ চোত মাসটাকে একরকম তাড়িয়ে বেড়ায়। অথবা আমের বোলের সৌরভ যখন চারদিক মাতোয়ারা করে দেয়, কাঁচামিঠে কচি আমের লোভে মেয়েরা যখন দল বেঁধে আম গাছের নিচে এসে জমা হয়, তরুণী মেয়েদের সে কী উল্লাস! সে কী দৌড়-ঝাঁপ। নিজেদের ঝলমল যৌবন উড়িয়ে কী মধুর ভঙ্গিই না করে! আর সদ্য প্রেমে পড়া কোনো তরুণী যখন তার প্রেমিকের বুকে মাথা রেখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে, মধুর অধর তুলে দিয়ে ভালোবাসার যাচ্ঞা করে, নিজের পুষ্ট স্তনে প্রেমিকের মাথা চেপে ধরে চোখের জল ফেলে--আপনি বলবেন ওসব বই-পুস্তকের কথা রাখুন তো, ওসব দেহতত্ত্বের টানা-পোড়নের কথা ছাড়ুন! পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে পেয়ারা বাগান এখন আবার বেড়েছে, মরসুমের দিনেও আর গাছে গাছে পেয়ারা পচে ঝড়ে পড়ে না নতুন করে নাশপতির বাগান গড়ে তোলা হলেও এখনও খুব একটা জমে ওঠে নি এই চাষ। এসব বাগান করছে উঠতি পুঁজিপতিরা। লবনের ব্যবসায় যারা ফুলে-ফেঁপে উঠছে তারা তো আর পয়সাটা কাঁড়ি মেরে কিংবা গোলায় তুলে রাখতে পারে না! একটা না একটা কিছু করা তো চাই। তবুও ভালো। কালো টাকার পাহাড় বানিয়ে তোলার চেয়ে বাগানে খাটিয়ে এভাবে ফলের গন্ধে চারদিক নরম ও সুরভিত করে রাখা যায় তো মন্দ নয়। হেমন্ত আসতেই পাকা ধানের গন্ধে বিল মেতে উঠবে। সকালে শিশির জমা পথে প্রথম একটা লোক হেঁটে গেলে কী সুন্দর একটা ছাপ পড়ে যায়! আর পেছন পেছন একটা কুকুর গেলে, কিংবা কোনো শিকারী যখন শুকিয়ে আসা জলাভূমিতে কাচিচোরা কিংবা খোরল হাঁস মারতে যায়? ভোরের প্রথম আলোয় প্রথম বন্দুকের শব্দ যখন চারিদিক গমগম করে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে? সে-শব্দ পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে আবার অন্য দিকে ছুটতে থাকে তখন কী যে এক সজাগ অনুভূতির সৃষ্টি হয়! ঐ যে বর্ষায় গাছ-পাকা একটা আনারস কেটে মুখে পুরে দিলে যেমন অদ্ভুত একটা রসাল অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে, তেমন একটা গভীর রাতে একটা নেড়ি কুকুর যখন কেউঁ-কেউঁ ডেকে ওঠে, তারপর আর একটা... একের পর এক কুকুর ডেকে ওঠে--পুরো দিগন্ত জোড়া পাড়াগাঁর কথা

এভাবে বলতে শুরু করলে বা একজন লেখক আরো বর্ণাঢ্যতা মেশাবেন তাতো অতি সত্যি কথা। বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের কথাই ধরুন না কেন।

কিন্তু এসবতো শুধু কথার কথা নয়, এসব লিপিবদ্ধ করেছে একজন চিত্রশিল্পী। একজন আবেগপ্রবণ চিত্রকর পাড়াগাঁর বৌদ্ধ বিহারের পড়ো পড়ো কক্ষে বসে রঙ-তুলিতে ছবি আঁকতে শুরু করেছে এভাবে। ছবির মানুষগুলোও কী তাগড়া জোয়ান, কী পেশীবহুল সব মানুষ, পেশীর ফুঁসে ওঠা দমক যেন ছবির ফ্রেম ভেঙে বেরিয়ে আসবে! পাড়াগাঁর চাষাভুষো মানুষের আন্তর-শক্তিকেই শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছে। শুধু কি ছবি আঁকা? তার জীবনে সুন্দরী তরুণীর আবির্ভাব.....বেদনা..... ভালোবাসা সবই, সবই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শতেক বছর আগে এক রাজমহিষী এই বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের সামনে শ্বেত-পাথরের ফলকে কালিন্দী রানীর নাম খোদাই করা আছে। মন্দিরের মূল গম্বুজটি ৪০ ফুটের মতো উঁচু, চার কোণায় আছে ছোট ছোট গম্বুজ, ভেতরে আছে পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধ। কোনো এক নামজাদা বর্মী স্থপতিশিল্পী মূর্তিটি তৈরী করেছিলেন বলে লোকমুখে শোনা যায়।

ওপাশে একটা একতলা বাড়ি। ইটগুলো ইঞ্চি দেড়েক পুরু। জীর্ণ এবং ভেঙে পড়ার উপক্রম একটা বাড়ি। ওখানে শিল্পী ক ছবি আঁকছে। পাশে ছোট একটা নদী। বালুচর আর পাথুরে এবড়োখেবড়ো তীর, অগভীর জলের শীর্ণ ধারা, পুরোনো ঝুলনামা বটগাছ, আম-কাঁঠাল-পেয়ারা-সুপুরীর বাগান, শান বাঁধানো ঘাটের একটা মজা পুকুর, উত্তর দিকে ধানের জমি, আর মাথার ওপর আদিম আকাশ তো আছেই। সে আকাশও ঋতুতে ঋতুতে তার পোশাক বদলায় কিন্তু সব ঋতুতেই মাঝে মাঝে আকাশটা তার নিজস্ব নীল রঙ সবাইকে দেখিয়ে জানান দেয় যে মেঘ হোক, জুম-পোড়া ধোঁয়ায় চারদিক যতই ঢেকে যাক, নীল রঙটা তার ভারি প্রিয়। আর শিল্পীও এসব চাষাভুষো মানুষের সভ্যতার ক্রম-বিকাশ আঁকতে গিয়ে দিগন্তের একটা ফলক তুলিতে আনবেই। কিন্তু মানুষের বংশগতি ধারার বর্ণাঢ্যতা, তুলির পোঁচে আঁকা উদয়াস্ত পরিশ্রমী মানুষের পেশির দাপট আকাশটাকে পর্যন্ত তার নীল রঙ নিয়ে কখনো-কখনো মুখ লুকিয়ে রাখতে শাসিয়ে দেয়। বাস্তবের শীর্ণ রুগ্ন মানুষকে ছবিতে সে শক্তি আরোপ করে, পেশিগুলো ফেটে পড়ার উপক্রম করে তোলে—বোধকরি শিল্পী বলতে চায় পায়ের নিচের মাটিকে বশে রাখতে হলে চাই এমন শক্ত-সামর্থ পেশির দেমাগ। চাই এরকম পুষ্ট পেশির রলরোল। শক্ত পেশি ছাড়া, দুটো সবল হাত ছাড়া, রুক্ষ মাটি তো আর বশ মানবে না। কিংবা ঢেঁকিতে পাড় দিতে হলে চাই শক্ত-সবল দুটি পা। মাচা থেকে ঝুলে পড়া লকলকে পুঁই ডগাটি মাচায় তুলে দিতে হলেও চাই পেশিবহুল দুটো বাহু। আর অত্যাচারীর হাতকে মুচড়ে-দুমড়ে ভেঙে দিতে হলে শক্তিমান বাহুর মিছিল চাই—যেন রোদ-বৃষ্টিতে জীর্ণ, তাল-পাতার মতো লিকলিকে পাতলা মানুষের বসবাস গ্রামে থাকতে নেই।

বিহারের হলঘরের দেওয়ালে লোনা ধরেছে, ছাদের বড় বড় বিম ফ্যাকাশে হয়ে আছে, কিন্তু সেই পুরোনো আমলের মেহগিনি কাঠ তো, পাঁচ-সাত শো বছরে কিছুই হবে না। যুদ্ধের সময় এসব কড়িকাঠের দিকে অনেকের নজর পড়েছিল। তা লোপাট করতে পারে নি। ভিক্ষু আনন্দের জন্য কেউ সাহস করে নি। অথচ লুটেরাদের তিনি বাধা দিতে পারতেন না, রুখে দাঁড়াতে পারতেন না, বাধা দেওয়ার মতো ক্ষমতাই বা কোথায়! তা হাজারীদের দোমহলা বাড়ির জানালা-দরজা-কানিশের কারুকাজ করা কাঠের আসবাব তো দু দিনেই লোপাট হয়ে গেছে। তখন কে কাকে মানে, কে কার ধার ধারে! হাজারীদের ভূমিদাস গগন তানুকে একটা মাছির সমান ভয়ও তারা করে নি। তার বউ...তেমন অনেক বৌ-ঝির কপাল ভেঙেছে। যুদ্ধের তো আর বসন্তের হাওয়ার মতো পুলক খেলার দায়-দায়িত্ব নয়, তার চেয়ে সে মহামারীই বেশি ছড়ায়। তা কোথা থেকে তখন চোখ লাল হয়ে যন্ত্রণাকর একরকম ভাইরাস রোগ এসেছিল, আর অমনি রোগটার নাম হল 'জয় বাংলা' রোগ। কিসের থেকে যে কী নাম হয়ে একটা হৈ হৈ পড়ে যায় তা কেউ বলতেই পারল না। যুদ্ধের রীতিনীতিই আলাদা।

বিহারের পুরোনো কোঠাবাড়ির পাশটিতে লাগোয়া নদী। নদীর এপার আর ভাঙছে না। বর্ষায় পাহাড় থেকে নামা ঢলে এদিকে আর ভাঙে না, কারণ নদী এখানে এসে পাথুরে মাটিতে পোষ মেনে গেছে। একটু উঁচু টিলার মতো জমিটা তাই কালিন্দী রানীকে এত আকর্ষণ করেছে। তিনি নিজেই জায়গাটা বিহারের জন্য পছন্দ করলেন। আর ঘুরতে ঘুরতে ক এখানে এসে ডেরা পাতল—ভিক্ষু আনন্দও প্রকৃত মানুষ চিনতে পারেন।

এসময় একদিন শহর থেকে একটি পরিবার গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এল। দীর্ঘদিন পর তারা এল। গ্রামও খুব একটা ছোট নয়। নদীর বাঁকের কোলে এই গ্রাম, অর্থাৎ গ্রামের তিন দিকে নদী, এই নদী গ্রামকে বিল থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। আর বিলটিও দিগন্তের দিকে পাহাড়ের সঙ্গে নিজেকে এগিয়ে দিয়ে শুয়ে আছে। হেমন্ত শুরু হচ্ছে বলে কুয়াশা জমাট-বাঁধাতে শুরু হয়েছে, ধানখেত আচ্ছন্ন হয়ে থাকে কুয়াশায়। বনের গাছপালা নিয়ে পাহাড় তো সেই কবে থেকে কুয়াশার বুক-ভরা ভালোবাসা নিয়ে চুপ করে আছে। হেমন্তের ছুটি নিয়ে এই পরিবার গ্রামে এল... ঝরে পড়া শিউলি ফুলের উজ্জ্বল সাদা রঙ এবং বোঁটার রুবি রঙ কেমন সৌরভ ছড়াচ্ছে···সঙ্গে সঙ্গে ক-এর চারপাশে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের বয়সও কমে গেল। এরকম মনে হওয়ার কারণ হচ্ছে ঐ পরিবারের সুন্দরী মেয়ে। সবকিছুতে, সবকিছুতে···বিশেষ করে ক-এর তৈলচিত্রগুলো যেন ভালোবাসার অনিন্দ্য লাল রঙ পেয়ে টলটল করে উঠছে। মনে হয় রঙ লেগে গেছে তার আপন সত্তার, তার বালক বয়সের, তার কিশোর মনের, যৌবনের যাদু-বয়সে ভালোবাসার উত্তাল জোয়ার ফুঁসে উঠছে, উপচে পড়ছে ফ্রেমে বাঁধা অতিকায় ছবিগুলো। ক্যানভাসে আঁকা চাষাভুষোদের ছবিতে, উন্মত্ত ষাঁড়ের লড়াই-এ, মোষের শিঙ বাঁকিয়ে তেড়ে ছুটে যাওয়ার মধ্যে, পানের বরজের পাশে ঐ জমিদখল নিয়ে দু দলের মধ্যে কিরিচ-ঢাল-লাঠি নিয়ে মরণ লড়াইয়ে, কিষানী মেয়ের পুষ্ট স্তনে হাত দিয়ে তরুণ কৃষক ছেলেটি যখন প্রথম ভালোবাসার আবেগে থরথর কাঁপে—শিল্পীর ক্যানভাসের পরিবেশ ছবির মূল সুরের সঙ্গে তেমনি কথা কয়ে ওঠে। শহর থেকে আসা সুন্দরী মেয়ে, কুমারী ল সেদিন গোধূলি সময়ে রানীর বিহার দেখতে আসে। তখন বিহারের ভং (গমগমে আওয়াজের এক রকম কাঁসার থালার মতো বাদ্যযন্ত্র) ও কাসর ঘন্টা একসঙ্গে বেজে উঠেছে। ক তখন তার প্রাত্যহিক সময়ের মতো হাত থেকে তুলি রেখে জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে, পৃথিবীর চেয়ে ঢের-ঢের বুড়ো ও অনেক বেশি বয়সী অথচ চির তরুণ আকাশের দিকে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়েছে। চারদিকে দৃশ্য-আদৃশ্য সময়ের খেলা চলছে, দিনশেষে পাখিরা কুলায় ফিরেছে, নিত্যকার মতো গাছ-গাছালির পাশ দিয়ে রাখালছেলে গরু তাড়িয়ে আনছে বাড়ির দিকে, ধূসর-তামাটে রঙের একটা মোষ প্রতিদিনের মতো টিলার পাশে এসে শিঙ বাগিয়ে মাটি উপড়ে কেলী করছে। ওখানে নিঃসঙ্গ শেফালি গাছটিও তেমনি তার প্রাত্যহিক কাজ মতো শেষ কটি দিনের জন্য কলি ফোটাতে শুরু করেছে। ল তখন ধীরে ধীরে শিল্পীর কক্ষে ঢুকল তার বাবার পাশে পাশে। তার চলার ভঙ্গিতে একটা কমনীয় দৃঢ়তা আছে। বুক উঁচিয়ে মাথাটা একটু পেছনে হেলিয়ে হাঁটার মধ্যে যে দেমাগী ভাব আছে তা তার রূপের সঙ্গে মানানসই ও সুন্দর।

ভিক্ষু আনন্দও তাদের নিয়ে শিল্পীর কক্ষে ঢুকলেন কথা বলতে বলতে। তার মন হচ্ছে ঠিক যেন দূরাগত সঙ্গীতের ভাষা, যেন দল মেলে পদ্মফুল তাকিয়ে আছে সূর্যের দিকে, যেন ঝমঝম শব্দ করে একটা এক্কাগাড়ি বিলের মাঝ বরাবর ধানখেতের ওপর দিয়ে অদৃশ্য ছুটে আসছে, কিংবা সেই একদিন যেমন একটা বাচ্চা ছেলে মোষের পিঠে চড়ে পুরোনো দিনের একটা জনপ্রিয় গান গাইতে গাইতে আসছিল—এখনি উঠিবে চাঁদ আধো আলো আধো ছায়াতে—গানটির সুর ক খুব মনে করতে পারে, খুব মনে পড়ে বলেই বুঝি তেমন একটা সুর তার কানে ভেসে আসতে থাকে। কুয়াশার ছোপছোপ ঘন রেখা তখন ধানখেতের ওপর নির্ভার এলিয়ে দিচ্ছে তার হাল্কা সুন্দর শরীর—এরকম কত বিকেল-সন্ধে পৃথিবী থেকে উধাও হয়ে গেছে বালক বয়সের ভুলতে না-পারা প্রথম প্রণয়ের মতো—বাল্য প্রণয়ে বোধ করি কিছু অভিসম্পাতও আছে—অনেক হেমন্তের অনেক সন্ধে অদৃশ্য হয়ে গেছে ইহলোক থেকে...ঠিক তেমনি একটা সময়ে ভিক্ষু আনন্দ, ল এবং তার বাবা ঐ কামরায় ঢুকল। ভিক্ষু আনন্দ একেবারে ছেলেমানুষের মতো, যেমন আস্তে আস্তে গোধূলি গড়িয়ে সন্ধে নেমে আসে অথবা যেমন রাতের পালা বদল করে সূর্য গুড়ি মেরে উঠে আসে সীতা পাহাড়ের পেছন থেকে—ভিক্ষু তেমনি শিল্পীর নাম ধরে ডাকলেন। সময় তখন কত ঐশ্বর্যময়, কেমন ছন্নছাড়া, কেমন আবেগশীল তা বোঝানো বা বিশ্বাস করানো কঠিন। ল, ঐ দীর্ঘ হাল্কা-পাতলা উৎসাহী তরুণীটি, মাঝে-মধ্যে যে উদাসীন হয়ে পড়ে, পরমুহূর্তে উজ্জ্বল অস্থির ও আদুরে হয়ে ওঠে, সেই ল এখন শিল্পী ক-এর 'আবেগপ্রবণ প্রেমিক' নামক ছবিটির নিচে দাঁড়িয়ে অভিভূত হয়ে আছে। গৈরিক চীবর (বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরিধের বস্ত্র) পরিহিত ভিক্ষু ধীরে ধীরে ক-এর কাছে গেলেন। সুন্দরী ল কাঁপছে, তার মনের কোণে বুকের ঠিক-ঠিক জায়গায় একরকম তোলপাড় করা কোমল বেদনা জেগে উঠছে—তার বুকটা মুচড়ে উঠল মধুর ব্যথায়, তারপর পুরোনো আশঙ্কা আতঙ্ক আনন্দ হর্ষ স্নিগ্ধতা ভালো লাগা আর স্বর্গসুখের আকাঙ্ক্ষা,

ঘর বাঁধার মধুর আনন্দ, গোধূলির দুর্লভ সময়ে কুয়াশা-জমা মুহূর্তে, শেফালির কলি ফোটা সেই ঋতুতে, নদীর বৈকালিক গন্ধ আচ্ছন্ন করে ঝুঁকে পড়া আকাশে...এই মুহূর্তে কল্লোল তুলে ছুটে আসা মনের বিহ্বল ভাবটিকে সে নিজের হাতে নিজে যত্ন করে মোড় ঘুরিয়ে দেবে কিনা অপেক্ষা করতে লাগল, কিংবা সদ্য জাগা ভাবটি নিয়ে অন্য কিছু কি করবে ভাবতে লাগল, কিংবা হয়তো হৃদয় দাবিয়ে রেখে আরও পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল। তার শিরায়-শিরায় জাগা অনুভূতি, তার কোমল বুকের গভীরে লালিত অতি সম্প্রতি জাগা আশ্চর্য সুখদল...শহরে যুবকের কৃত্রিম প্রণয় যাচ্ঞা যা তাকে এতদিন ধরে বিতৃষ্ণ করে তুলছে, তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা দুটি চোখ তখন বাইরের দিগন্ত থেকে ফিরে এসে এইমাত্র তার দিকে তাকিয়েছে। স্বল্প অন্ধকারে সেই দুটি চোখ সে ভালো করে দেখতেও পায় নি। ক যখন তার বাবার সঙ্গে সৌজন্য প্রকাশ করে ছবি সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতে শুরু করেছে, কী যেন তত্ত্বকথা ছবি সম্পর্কে বলছে, চিত্র শিল্পে কী এক বিবর্তন এসেছে বলতে গিয়ে...একজন শিল্পীর সঙ্গে পরিচয়ের মুহূর্তটি কত যে মধুর ও মনোরম হতে পারে, পরিচয়ের মধ্যে এমন নিবিড় নাড়ির টান থাকতে পারে, প্রথম পরিচয় এমন সর্বনাশা কাঁপন তুলতে পারে, হ্যাঁ প্রথম পরিচয়...বুকের গভীরে একটা হাত ঢুকিয়ে যেন হৃদপিণ্ডের মুল ধরে হেঁচকা টান দিয়ে উপড়ে ফেলতে চাইছে...কী মধুর এই সান্ধ্যকালীন আবছা আলো-অন্ধকারে চোখে চোখে তাকানো, সমস্ত স্নায়ু এক পায়ে দাঁড়িয়ে থর থর করে উঠল---এই অনুভূতি, মানুষের পূর্বপুরুষের রক্ত থেকে বয়ে এসেছে কিনা কে বলতে পারে! ল কোনো কিছুরই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এই গতানুগতিকতাহীনতা, অনিন্দ্য অনুভূতি, নদীগর্ভের শুকিয়ে যাওয়া বালির ঝুরুঝুরু ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে যা একরকম মিলেমিশে একাকার... স্বপ্ন, গোধূলির লগ্ন, কোমলতা, মাধুর্য ও নিবিড়তা কুমারী ল-এর বুকের মধ্যে নৃত্য খেলে গেল। তার বুকের গভীরে, হৃদয়ের অলিন্দে, করুণ স্তনের ওপর অবুঝ শিশুর মতো কে একজন মুখ রেখে একটা অমোঘ মধুর সর্বনাশ তুলল; অসম্ভব তৃষ্ণায় দু চোখ জেগে উঠল...সে নিজের অজ্ঞাতসারে ডান হাতখানা তার অনাঘ্রাত পুষ্প-স্তবকের মতো স্তনের মাঝখানে ঝুলন্ত চুনির লকেটে রাখল...মধুর, মধুর এই সর্বনাশা ঝড়, প্রথম তারা ফোটার সন্ধিক্ষণের মতো করুণ এই আলো এবং আকাঙ্ক্ষার উষ্ণ উন্মেষ...।

ভিক্ষু আনন্দ চলে গেলেন। কারণ তাঁর সান্ধ্য প্রার্থনার সময় সমাগত প্রায়। ল তার বাবার সঙ্গে আর মাত্র অল্প সময় কাটাল, তারপর ফিরল। ল ফিরল। ফেরার অর্থ নিজেকে মুহূর্তের মধ্যে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলা থেকে রক্ষা করা কিংবা কী ঘটতে যাচ্ছে একটু ভেবে নেওয়ার সময় খোঁজা। না, ফেরার অর্থ নতুন করে সাজানো। না, এই ফেরার অর্থ নিজেকে নিয়ে আরও একটু অন্তরঙ্গ হওয়া...ভালোবাসার গভীর সলজ্জ অনুভূতিকে হঠাৎ করে প্রকাশ করতে না-পারার দুর্বলতা...হয়তো, হয়তো! বুকের মধ্যে কচকচ দুরু দুরু চিনচিন ব্যথা বয়ে যেতে লাগল, উদ্দাম হয়ে ছুটতে লাগল বুকের ভেতরে বাইরে। সবকিছুতে ছারখার তছনছ ঝড় বয়ে যাচ্ছে---একটা আশ্রয় চাই তার। তবুও সে বুকের আবেগতাড়িত ভাষাটা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, শুদ্ধ প্রেমের শুদ্ধ আবেগকে নিজের মধ্যে খুব সতর্কতার সঙ্গে একবার ওখানে আবার সেখানে লুকিয়ে রাখতে চাইছে---বুকের মধ্যে যে গভীরতর আরেকটি বুক আছে, বুকের মধ্যে বক্ষজোড়া যে অতুল সম্পদ আছে...এই জন্যেই বুঝি আলিঙ্গনে এত সুখ। সে জানে না প্রার্থিত পুরুষকে আলিঙ্গন করতে কেমন সুখ, কিন্তু তার ভীষণ ইচ্ছে করছে দুই বাহুর কোমল প্রবল শক্তিতে কিছু আঁকড়ে ধরে, দু হাতে বুকের মধ্যে চেপে ধরে চুরমার করে গুঁড়িয়ে দেয় এবং নিজেও ছারখার হয়ে যায়...সর্বনাশা ইচ্ছে করেছে। বুকের ভেতর, তার অনাঘ্রাত বুকের পুষ্পকোরকে, ওষ্ঠে, স্নায়ুতে ও মস্তিষ্কের ভেতরে চারদিকে ঝড় বইছে।

ঘরে এসে খাওয়া-শোওয়া কিছুই ভালো লাগে না। খেতে বসে একরকম না খেয়ে উঠে পড়ে। শুতে গিয়ে ঘুম আসে না। শুধু হৃদয় জোড়া চিনচিন ব্যথা, তিরতির কাঁপন, হুহু কান্না। এক সময় সে বুকে বালিশ চেপে শুয়ে পড়ল। কাঁদল। সমস্ত শরীর-মন আকুলি-বিকুলি করে উঠল। সে আর নিজেকে সামলাতে পারে না, রাতও ভোর হয় না। এই অস্থিরতায় তার মায়ের কথা মনে পড়ল! মা তার বাবাকে কেমন ভালোবাসে সেই কাহিনী মনে পড়ল। বাবা তার মা-মনিকে ভালোবেসে কেমন কষ্ট দিয়েছিল চোখের সামনে ভেসে উঠল। মায়ের ভালোবাসার সেই সব দিনের সকল চিঠির ভাষা মনে পড়ল---রাতের কুয়াশা তখন অনেক গাঢ় হয়েছে, রাত-পাখি মাঝে মাঝে ডেকে কী যেন বলতে চাইছে। সে আবার বুকের নিচে বালিশ রেখে দু হাত ভাঁজ করে অতীত-ভবিষ্যৎ ভাবতে লাগল : এখন আমি কি করি, আমি কি আর আমাকে ধরে রাখব ? আমি কি ভালোবাসার উন্মেষ নাকি আমার সর্বনাশের ঘণ্টা

শুনতে পাচ্ছি ? নাকি আমাকে কাঁদতে হবে আমার মায়ের মতো। নাকি আমি ভালোবাসার সম্রাজ্ঞী হয়ে ভাসতে পারব, বাঁচতে পারব, জাগব—আমার ভালোবাসা, আমার প্রেম ....! তারপর কখন সেভাবেই সুখে কাঁদতে লাগল সে নিজেও জানে না।

তৃতীয় অধ্যায়

ভোর-ভোর সময় ক ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। সারারাত সে ঘুমোয় নি। 'আবেগপ্রবণ প্রেমিক' চিত্রটি অসমাপ্ত থেকে গেল। বিশাল ক্যানভাস জুড়ে শুয়ে থাকা মানুষটির পেছনে দেখা যাচ্ছে শস্যখেত, দিগন্তের এক ফালি আকাশটাও উঁকি দিচ্ছে, বাঁ হাতে একটা খেলনা-পুতুল, ডান হাতটি কপালের ওপর রেখে দূরে কী যেন দেখতে চেষ্টা করছে, চোখ দুটো স্বপ্ননীল। ছবির চোখ দুটো তখনো অসমাপ্ত। সারারাত সে ভেবেছে হাতের পুতুল ফেলে দিয়ে মুখে একটা ফুল দেওয়া যায় কিনা, কুমারী ল-কে ছবিটি উপহার দিলে সে কিছু মনে করবে কিনা—তার আবেগতাড়িত কথাগুলো তখনো ঘরের ভেতর গমগম করে বন্দী আছে। রাতে একবার ভিক্ষু আনন্দ এসেছিলেন তার কুশলবার্তা জানতে, ভোরে তিনি শ্রমণদের সঙ্গে ভিক্ষে করতে বের হবেন। তিনি গভীর দৃষ্টি দিয়ে ক-এর দিকে তাকালেন, কী যেন খুঁজলেন, কী যেন হারিয়ে গেছে, যেন ক খুব অচেনা, যেন সে আর আগের ক নয়। তার ভালোবাসায় কম্পিত চোখ দেখে ভিক্ষু শিহরে উঠলেন। একবার তিনি ভাবলেন নিষেধ করবেন, কিছু বলবেন, প্রশ্ন করবেন, শিল্পী-বন্ধুকে সতর্ক করে দেবেন। না, তিনি চুপ করে গেলেন।

কৃষ্ণপক্ষের আকাশ। কুয়াশারা চারদিক জবর দখল করে নিয়েছে, চরাচরের ওপর কঠিন সওয়ার হয়ে বসেছে। বড় বড় মোমের পাত্র থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে ছবির ওপর—ছবিগুলো আলোকিত করে তুলেছে। ভিক্ষু আনন্দ একটি মস্ত বড় ছবির সুমুখে দাঁড়ালেন। ছবিটি রমণীর, ভূষণহীন অলঙ্কারহীন রমণীর, হাতে একটি পাত্র, পাত্রটি রমণীর বাম স্তনের নিচে ধরা, পাত্র আর স্তনের রঙ হুবহু এক, বোঝা যায় স্তনদ্বয় দুধে আর্দ্র, চারদিকে অনেক শিশু দাঁড়িয়ে আছে, রমণীর মুখের দিকে তাদের দৃষ্টি একাগ্র, বোঝা যায় তারা খাদ্য চাইছে, পেছনে অস্পষ্ট দিগন্তরেখা, মাথার ওপর স্তবকে স্তবকে ফোটা অশোক-মঞ্জরী, ডালের ফাঁকে দুটি দেবশিশু, হয়তো তারাই মায়ের স্তনে অনন্ত উৎসের মতো দুধ বিতরণ করছে—প্রেমিকার কাছে সেই স্তন প্রিয়, শিশুর কাছেও। ডান স্তনটি অদৃশ্যপ্রায় পুরুষের হাতে, রমণীর মুখে পরিপূর্ণ তৃপ্তি, চোখও স্বপ্নাচ্ছন্ন।

ছবিটি দেখে ভিক্ষু আনন্দে বললেন, মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক। ক দাঁড়িয়ে আছে, ভাবতে ভাবতে উত্তেজিত হয়ে উঠল, অস্থির আবেগে কক্ষময় পায়চারী করতে শুরু করল তারপর হঠাৎ ভিক্ষু আনন্দের কাছে বিদায় চাইল•••। তারপর, আবার উত্তেজিত হয়ে ঠিক অন্ধকারে বিপদগ্রস্ত লোক যেমন সাহায্যের আশায় গেরস্থ বাড়ির দুয়ারে প্রবল বেগে কড়া নাড়ে—ভিক্ষুর কাছে সে সময় চেয়ে নিল ভিক্ষু আনন্দ কিছু না বলে চলে গেলেন।

তারপর সে পাগলের মতো ছবি আঁকল, সারারাত একজন রমণীর ভালোবাসার ছবি আঁকল, সদ্য-জাগা ভালোবাসা ঢেলে দিল ছবিতে। উলঙ্গ রমণীর ছবি আঁকতে আজ বুক কেঁপে উঠল, একটা সূক্ষ্ম বেদনা-বোধ যেন, কোথা থেকে যেন অপরাধবোধের মতো দূরতর সংকেত এল ··রমণীর চিত্র কি কুমারী ল-এর মতো হয়েছে ? আবার ছবিটি ভালো করে খুঁটিয়ে দেখল। আবার তুলি চালাল, গাঢ় রঙ দিল বিশেষ-বিশেষ জায়গায়। এক সঙ্গে পাঁচটি ছবি আঁকতে শুরু করল, এবং প্রত্যেকটি ছবি বড়, কোনটিই সাত হাতের ছোট নয়।

আরো কিছু সময় তুলি চালাতে পারলে আরো কিছু ছবি সমাপ্তির শেষ পর্যায়ে নিয়ে আসা যেত। 'আবেগপ্রবণ প্রেমিক' ছবিটি শেষ করতে পারত, তুলির সর্বশেষ টান দিতে পারত, কিন্তু আর কাজ করা উচিৎ নয় মনে করে সে থামল। বসে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ছবিগুলো দেখল, তারপর ভোর ভোর সময়ে বেড়িয়ে পড়ল। আঙিনা দিয়ে যেতে যেতে দেখল বিহারের ভেতরে, বুদ্ধমূর্তির সামনে ঝাড়বাতি জ্বলছে, বাতির কাচদানি থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে, উঠোনে ও আঙিনায় ফুল ফুটে আছে, পুকুরে পদ্ম ফুটেছে, তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। সৌম্য ধ্যানরত বুদ্ধের সামনে হাতজোড় করে আছে দেবরাজ, ওপাশে যমদণ্ড হাতে মৃত্যুর অধিপতি যমরাজ। তার পাশের কক্ষটিতে ভিক্ষু আনন্দে থাকেন, তিনিও রাতের শেষ যামের ধ্যানে নিবিষ্ট-চিত্ত। রাত শেষ হতে থাকে—ক বেরিয়ে পড়ে। দীর্ঘ চত্ত্বর অতিক্রম করে ঘাস বিছানো উঠোন পেরিয়ে পাম গাছের পাশে একবার থমকে দাঁড়ায় ; ওপাশে বোধিবৃক্ষ। তারপর সে সিঁড়ি ভেঙে নামতে থাকে। আস্তে আস্তে কুয়াশার বিস্তীর্ণ জাল ভেদ করে আরও এগিয়ে যায়,

বিহারের পুকুরের পাশে পৌঁছল, পুকুরের পাশ থেকে নদীর তীরের দিকে যেতে শুরু করল, ওদিকে গ্রামের ঘর-বাড়ি। নদীর ধারে পৌঁছল। খাড়ি ভাঙা তীরে দাঁড়িয়ে গতরাতের স্বপ্ন ও বাস্তব জগতের খতিয়ান নিতে শুরু করল। গত সন্ধেয় ল তাকে কিছু প্রশ্ন করেছিল, শিল্পের জগতের খবর জানতে চেয়েছিল—শিল্পের জগতের খবর তো নয় ও-যে তার ব্যক্তিগত জীবনের হিসেব চাওয়া। সে নিজেও ব্যক্তিগতভাবে ওসব প্রশ্নের মুখোমুখী বহুবার হয়েছে, পাশ কেটে গেছে, বুকের প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রেখেছে সকল প্রশ্ন, সকল ভালোবাসা—ল আবার সে-সব প্রশ্ন তুলে তাকে উচ্চকিত করে তুলেছে। তবুও সে একে একে প্রত্যেকটি প্রশ্ন, প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করল, প্রতিটি প্রশ্ন মনে মনে আওড়ে নিল, একটা চুরুট ধরিয়ে ভাবনার গভীরে ডুবে গেল···ভালোবাসা এভাবে হয়তো গভীরে ডুবিয়ে দেয়। এক নারী সুন্দর হতে হতে, আরো সুন্দরী হয়ে তার মুখোমুখী সুখের পতাকা উড়িয়ে দিল, তারপর···তারপর এভাবে সমস্ত কিছু ভাবতে ভাবতে খালের ধারে কদম গাছের নিচে কুয়াশার গভীরে দাঁড়িয়ে রইল, যেন কার আগমন প্রতীক্ষা করছে, যেন কেউ আসবে বলে কথা দিয়েছে, যেন এক জীবন ধরে কেউ তাকে ভালোবাসার রাজপথের তেমাথায় দাঁড়িয়ে থাকতে নির্দেশ দিয়েছে, যেন বুকের মধ্যে কেউ একজন তোলপাড় তুলে দূরে থেকে চুপচাপ সব-কিছু লক্ষ্য করছে···যেন, যেন, যেন-বা কুমারী ল আসবে বলে ঠিক এই নির্জন কুয়াশা-ঘেরা নদীধারে প্রান্তরের পাশে পূর্ব নির্ধারিত স্থানে প্রতীক্ষা করছে। সে কুয়াশা-ঘেরা চাঁদ ও আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকে, ল-এর আসার পথের দিকে তাকিরে থাকে, আর দীঘল শরীরের ছবি আঁকতে থাকে··'আমি চেয়ে চেয়ে দেখি তাকে, সুন্দরতর লাগে' গানটির ভাঙা ভাঙা কলি আওড়াতে থাকে।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ অস্তের দিকে, দিগন্তের একটু ওপরে পোড়া পোড়া রং বিলিয়ে অনাদি কালের চাঁদ অনন্তের বুকে খুঁটি গেড়ে বসে আছে। ঝাপসা গাছপালা কুয়াশার গভীরে চুপ মেরে আছে। চারদিক কেমন বিষণ্ণ ও সুন্দর! চারদিক কী ঝাপসা ও মায়াময়!

ভালোবাসা, শিরশির কাপা বুক, এলোমেলো ভাবনা···ধীরে ধীরে সে পায়চারী করে, গুণে গুণে পদক্ষেপ দেয়, 'আবেগপ্রবণ প্রেমিক' ছবিটি কোথায় অসমাপ্ত আছে ভাবতে থাকে। নদীর ধার, বাঁশ বাগান ও ধানের বিল স্বপ্নের মতো অতিক্রম করে সে হাঁটতে থাকে, ল-এর বাড়ির আঙিনায় গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর ভাবতে লাগল এত ভোরে

তাকে কি বলে ডাকবে?

একজন শিল্পী হিসেবে এই গ্রামে সে পরিচিত। ভিক্ষু আনন্দ তাকে বিহারে থাকতে দিয়েছেন। শহরে থাকে সে, কতই বা বয়স, কতটুকুইবা তার পরিচিতি! এখনও একটা প্রদর্শনী করতে পারে নি, নাম কুড়োতে পারে নি···এখন গ্রামে এসে সে দু হাতে ছবি আঁকছে··· দরজায় দাঁড়িয়ে প্রথমে ল-এর বাবাকে ডাকল। ভোর হয়! কুয়াশার আবরণ আরও গাঢ় হয়। পাহাড় থেকে নেমে আসছে কুয়াশার ঢল, পাহাড়ের পুব পাড়ে ফর্সা ভোর জাগছে। আস্তে আস্তে স্বপ্নের নদী পেরিয়ে ল জাগছে, বঙ্গোপসাগর থেকে বাতাস আসছে, ঘুমের শেষ ও স্বপ্নের শেষ কী মধুর ··বুকের মধ্যে ডিবডিব তিরতির, গতকাল যার সঙ্গে তার অনিন্দ্য সাক্ষাৎ হয়েছে সেই মানুষটি এখন তার দরজায়, কী মধুর আশ্চর্য ঢল নামছে তার বুক জুড়ে!

ক দাঁড়িয়ে রইল। কে তাকে দরজা খুলে ডাকবে? ভোরের কুয়াশা ম্লান আচ্ছন্নতায় একজনের ঘরের দরজায় ভিখিরির মতো সে দাঁড়িয়ে —শেষ সম্বল শেষ ভরসা ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, আবার ডাকতে যেন সাহস বা ভরসা নেই, আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াবে কি দাঁড়াবে না দ্বিধায় পড়ল, মুখের চুরুট টানতে ভুলে গিয়ে যেন আবার বেপরোয়া ও বিষণ্ণ হয়ে উঠল—ভাবতে লাগল, দীপ্ত চোখজোড়া দরজার দিকে তাকিয়ে আছে কখন দরজা খুলবে, কখন গতরাতে জন্ম নেওয়া ভালোবাসা কথা বলবে—কখন যে ...!

চতুর্থ অধ্যায়

ভোর হওয়ার অনেক আগেই চাষীরা মাঠে হাল নিয়ে গেছে। চাঁদের আলোয় সিকস্তি জমিতে চাষ দিচ্ছে তারা। রবিশস্যের জমি চাষের ভর-মরসুম তখন, চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত শেষ রাতটিও তখন তাদের খুব কাজে লাগে। চারদিকে কাজ, পাউণ্ডি জমি (রবিশস্যের জমি) থেকে শেষ রাতের নীরবতা ছিঁড়ে মধুর 'তি তি' শব্দ আসছে। দু দিন পর ধান পাকতে শুরু করবে, নদী সিকস্তির সব জমি চাষযোগ্য হয়ে উঠেছে। কে একজন ভেলুয়া সুন্দরীর পালা থেকে বরমাস্যা গাইছে। বেলে জমিতে আগাম রোয়া মুলো একটু লায়েক হয়ে উঠেছে, এক রকম অপরূপ দিন চলছে. ফসল ফলানোর উৎসব শুরু হয়েছে, প্রতিযোগিতা চলছে—পূর্বপুরুষের আমল থেকে কথিত সেই স্বর্ণযুগ যেন তারা ছিনিয়ে আনবে···কী স্পর্ধা, দুঃসাহসের সীমা-সরহদ্দ নেই।

ক দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ জুড়ে আছে একটি নীল শাড়ি আর মখমলের লাল ব্লাউজ-পরা দীর্ঘাঙ্গী তন্বী এক মেয়ে, যার আছে গোলাপী একজোড়া ওষ্ঠ, উজ্জ্বল আরক্তিম মুখ, মধুর স্নিগ্ধ চোখ, এবং চিবুকের নিচে ডানদিকে যার একটি মধুময় তিল আছে। গত সন্ধের মতো মন্ত্রমুগ্ধ ক দাঁড়িয়ে আছে। দেহ নয়, বলতে গেলে একরকম অদেহী সজাগ সংবেদনশীল এক তরুণী তার দিকে ইশারার হাত বাড়িয়ে তাকে ডেকেছিল। ঐ গত সন্ধেয় অন্ধকারে ফিরে যাওয়ার সময় সে ল-কে বলেছিল, যেতে দেব না আপনাকে।

বুকের লকেটের ওপর হাত রেখে, উত্তর দিয়েছিল ল, নিন, কাল কোনো সময় গিয়ে নিয়ে আসবেন আমাকে, কাল আপনার ছবি ভালো করে দেখব, ছবি সম্পর্কে আলাপ করব···।

সেই স্বর্গসুখ, সেই আনন্দ, সেই মধুর তৃপ্তি, সেই স্ফীত বুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গতরাতে আরও কত কাণ্ড ঘটে গেছে! কথা বলতে বলতে তার উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে থাকা, ঠোঁট টিপে দীর্ঘশ্বাস টানা, রঙ-তুলির বাক্স ঘেঁটে অপ্রাসঙ্গিক উক্তি করা···রাতের নদীর শান্ত জলে একটা মাছ নড়ে উঠলে গম্ভীর গমগমে একটা ধ্বনিময়তা যেমন চারদিক ছড়িয়ে পড়ে তেমনি তার বুকের ভেতর থেকে কী যেন একটা উঠে এল। শুধু হৃদয় নয়, সেই সঙ্গে তার বাবা-ভাই-বোন পরিবার সম্পর্কে অল্প সময়ে যেটুকু কথা হয়েছে, তার বাবা যে দু-চারটা কথা বলেছে, তাতে ক-এর মনে হল গোটা পৃথিবীটাই যেন অলক্ষ্যে তাদের ভালোবাসার বন্ধনে আটকে গেছে। যে চাকমা রানী বৌদ্ধ বিহার দান করেছেন সেই রানীর আসনে আরএক মহারানীকে স্থাপন করল সে। শুধু ভালোবাসা, ভালোবাসার সুখ, বুকের মধ্যে গড়ে ওঠা এক দুর্বার আবেগকে লালিত করে, আরও অধীর আরও আবেগময় আরও সঞ্চরণশীল করে, বিহারের প্রতিটি প্রাচীন কক্ষ ছবি ইজেল তুলি রঙে ভরে, সর্বোপরি হেমন্তের কুয়াশা-জমা প্রকৃতিতে নিজেকে পুরোপুরি ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার করে দিল···ভালোবাসার এক আবর্তনশীল রাজ্যপাট···সবই মনে মনে, সবই মনের উদাস আবেগ থেকে ছাড়পত্র পাওয়া, হৃদয়ের প্রবল আবেগের জলসত্র খোলা...।

তারপর ল যখন বাড়ি ফিরে গেল বুকের গভীরে সে কী মত্ততা! খাওয়া শোওয়া ছবি আঁকা কোনোটিই আর মন চায় না। শেষ পর্যন্ত বুকের অস্থিরতা এক সময় ছবির দিকে ফিরে গেল বৈকি। প্রথমে অনেকক্ষণ ধরে ছবিগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখল, তারপর অসমাপ্ত ছবিগুলোতে একসঙ্গে প্রাণভরে তুলি চালাল, একসঙ্গে পাঁচটি ছবির কাজ করল। লাল রঙের কাজ চালাতে হলে একটির পর একটি ছবিতে লাল রঙের কাজ করল, অথবা নীল রঙের ব্যবহার করল একের পর এক করে পাঁচটি ছবিতে, কখনও বা নতুন ছবির পটভূমিও রচনা করল। আর এক-একটা ক্যানভাসতো ঘরের একেকটি দেয়াল।

মনে নেই...হ্যাঁ, তবে বুকের মধ্যে, পেছন থেকে ল যেন তাকে আবেগ ভরে বলছে, 'আঁকো, আরও আরও আরও অনেক ছবি আঁকতে হবে'—এভাবে প্রেরণা দিয়েছে, স্বপ্নে স্বপ্নে আলতো করে বুকের কোমল স্পর্শে পুরে নিয়েছে, আদর-সোহাগে অস্থির করে তুলেছে, চুমুতে চুমুতে আচ্ছন্ন করে...ক পাগলের মতো ছবির মধ্যে ডুবে গেল...ভালোবাসা যে ভালোবাসা, সর্বনাশা গতিশীল ও স্থবির, স্পন্দনশীল ও মূক, মার-মুখো ও আপোষকামী...ভালোবাসা কেমন?

সচল সরাগ ভালোবাসা নিয়ে ক দাঁড়িয়ে রইল। ভেতর থেকে ডাক আসে না, দরজা খোলে না, ফিরে যাবে-কি-যাবে না···দাঁড়িয়ে থেকে ক্লান্ত হতে হতে হৃতসর্বস্ব হতে হতে ভালোবাসা জপতে জপতে দাঁড়িয়েই রইল। লজ্জা এসে ঘিরে ধরল। এই ভোরবেলায় কারো বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে একজন নারীকে ডাকা...লজ্জা এসে ঘিরে ধরল তাকে, বুকের ভেতরের ধুকপুক ঘন্টা হয়ে বাজতে লাগল।

বুকের দুরুদুরু শব্দ প্রচণ্ড নিনাদে পরিণত হতেই হঠাৎ সামনের কাঠের দরজার হুক খুলে গেল। সে তার এলোমেলো পাঞ্জাবি আর নোংরা পাতলুন আলোড়িত করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাবল দরজা খুলবে তার ভালোবাসার দেবী, মহিমাময়ী রাজরানী দাঁড়াবে তার চোখের সামনে। তখন ক আর ক থাকবে না, সে অপলক তাকিয়ে থাকবে, নতজানু হয়ে তার হাঁটু চুম্বন করবে এবং বলবে এই গ্রহণ করো আমাকে, আমার সত্তা, আমার আমি, সম্পূর্ণ আমাকে গ্রহণ করো। বহু আকাঙ্ক্ষিত সময় এসে দরজা খুলে গেল...কিন্তু কুমারী ল দরজা খুলে বেরিয়ে এল না, তার কাকার মেয়েটি বেরিয়ে বলল, দিদি উঠেছে, আপনি একটু দাঁড়ান। বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে পুকুর ঘাটের দিকে চলে গেল। অস্থির অধৈর্য ক আবার সেখানে জড়বৎ দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু জড়বৎ থাকতে পারল না। কোঠা বাড়ির দরজা পেরিয়ে ঘরে ঢুকল, ঢুকে আবছা অন্ধকারে ডান দিকে মোড় নিয়ে আর একটি দরজা পেরিয়ে ঠিক তার পালঙ্কের বাজুবন্ধ ধরে দাঁড়াল। তখন ল তার

নীল শাড়ি পাল্টে গোলাপী ছোপের শাড়ি পরছে। সেই লাল মখমল রঙের ব্লাউজটি তখনও গায়ে, বোধ করি খুলে আর একটি পরবে কিংবা রাতের ব্লাউজ পাল্টে নিয়েছে, খাটের ওপর তখন ব্লাউজ অন্তর্বাস শাড়ি পড়ে আছে।

ঘরে ঢুকে দাঁড়াতেই ল আস্তে আস্তে বলল, তুমি এসেছ, তুমি এত ভোরে এভাবে আসবে বিশ্বাস করি নি !

দুরুদুরু বুকে আস্তে আস্তে সেও উত্তর দিল, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের অতীত কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যায়। গতরাত অনেক কিছু ঘটে গেছে।

তারপর সে তাকে কাপড় বদলাতে, চুল বিন্যাস করতে, কিংবা অন্য অন্য কারণে সুযোগ দেয়ার জন্য ঘুরতেই ল ঝটিতি তার হাত ধরে থামিয়ে দিল। ক তখন পূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, তিরতির কাঁপতে লাগল, প্রচণ্ড আলোড়িত শক্তিতে বুকের ভেতরটা দুমড়ে উঠল, একটা পাগলা ঘোড়া বুকের ভেতর জোড় কদমে দিগ্‌বিদিক ছুটতে লাগল, বুকের ভেতর থেকে হৃদপিণ্ড বেরিয়ে আসতে চাইল, সমস্ত স্নায়ু এক যোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করল, সামান্য হাতের স্পর্শে নিষেধের কোমল আবেদনে বুকের সমস্ত ভালোবাসা কলকল খলখল বেজে উঠল। সে আস্তে আস্তে তার হাতখানা টেনে নিয়ে কোমল করে চুমু খেল, তারপর তার চোখের ওপর চোখ রাখল। দু জনই তখন কথাহীন, কাঁপছে দু জন, দু জন পরস্পরের দিকে আরো এগিয়ে এল, পৃথিবী থেকে অনেক দূরে যেমন চন্দ্র-গ্রহণ ও সূর্য-গ্রহণ হয়...দু জন দু জনের ছায়ায় মিশে গেল, আলিঙ্গনাবদ্ধ হল। কুমারী ল আস্তে আস্তে নিজের মাথার ভার ক-এর ডান কাঁধে রাখল, আস্তে আস্তে সমস্ত ভারসাম্য হারিয়ে নিজেকে ছেড়ে দিল, সমস্ত শরীর বিক্ষেপে কাঁপতে লাগল, ফুঁপিয়ে উঠল, কাঁদতে লাগল...দু জনের, হ্যাঁ দু জনেই প্রবল এক আলিঙ্গনে মূর্ছাতুরের মতো মিশে রইল, ল তার শরীরের সমস্ত ভার সঁপে দিয়ে কাঁপতে লাগল...আর দু জনের ভয় পাছে এই সুখ এখনই হারিয়ে যায়। নষ্ট হয়ে যাবে না তো, ভালোবাসা হারিয়ে যাবে না তো, দেহ ছেড়ে ভালোবাসা কোথাও উধাও হয়ে যাবে না তো...যদি যায়, যদি পালিয়ে যায়, যদি...! ক ভীষণ ভয়ে ভয়ে ভীষণ সুখে ওকে পালঙ্কের ওপর রাখল, ভারি এক মমতায় আদরে সোহাগে দু'জনে আচ্ছন্ন হয়ে রইল, পরস্পরের প্রতি পরস্পরে সম্মান দেখিয়ে তাকাল, পরস্পর পরস্পরের বুকের গভীরে সুখ খুঁজল, হৃদয়ের নিবিড়ে প্রবেশ করল.... ওরা ভীষণ সুন্দর আদর-ভালোবাসার জন্মান্তর পার হতে লাগল—এক

জীবনে জন্ম-জন্মান্তর পেরিয়ে যাওয়া যায় যেমন করে, যেমন করে সাত আকাশ ভেদ করে যায় একজন বৈমানিক মুক্তিযোদ্ধা···।

ঘর থেকে বের হল ওরা। কুয়াশা ভরা অন্ধকারে ডুবে গেল তারা। দু জনেই ভাবতে ভাবতে কথা বলতে বলতে পায়ের চিহ্ন নিয়ে পড়ে থাকা কুয়াশা ভেজা পথ দিয়ে চলছে। দু জন এখন কত সুখী, পৃথিবীর সকল সুখ এখন ওদের হাতে ওষ্ঠে চিবুকে বুকে চোখে শরীরে, চরাচরে! কুয়াশার নিচে মাঠচেরা পথ আরও স্বপ্নময়, গ্রাম আর ঘরগুলো কুয়াশার মোড়কে আরও উঁচু।

সত্যি করে বলো—আস্তে আস্তে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল ক—সত্যি করে বলো স্বপ্নটা কি তাই ছিল...!

ল তার মুখের দিকে তাকাল, নিজেই নিজের মুখ সুন্দর করে তুলে ধরল। ক দু হাতে তার মুখ তুলে নিয়ে চুমু খেল ঠোঁটে, কুয়াশার ধূম্রজালে চুম্বনটা আরও আরও দীর্ঘস্থায়ী হল, তার গাল দু হাতে আলতো করে ধরে চুমুর মধ্যে শুনতে পেল ল কী যেন বলছে। শব্দটি ঠিক স্পষ্ট হয় না অথচ থেকে থেকে বলে চলছে। ল-এর দু হাত মালার মতো ক-এর গলায় তুলে ধরল। তারপর সমস্ত ভালোবাসা নিবেদন করার মতো ল তার চোখের রহস্যময়তা দিয়ে যখন সবকিছু অনুভব করছে, যখন সমস্ত চরাচর তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে...এক ফাঁকে ক দেখল তার প্রিয়তমার অনিন্দ্য চোখের ভাষা; এবং সেই দুর্লভ মুহূর্তটি ক মনের মধ্যে ধরে রাখল। তখন ওদিকে নদী-জোড়া সিকস্তি জমিতে চাষীরা চাষ দিচ্ছে, ভাদ্র মাসে লাগানো বেগুন মুলো বেশমাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। চাষীদের 'তি তি ব ব' ডাক কানে আসছে, প্রকৃতির হৃদপিণ্ডের শব্দ শোনা যাচ্ছে চর জুড়ে।

তারপর তারা হঠাৎ এক সঙ্গে শব্দ করে হেসে ছুটতে শুরু করল। দৌড়ে আরও পুব দিকে চলে গেল। আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নদীর বুক দিয়ে, মাথার ওপর দিয়ে, বুকের ওপর দিয়ে বকের উড়ে যাওয়ার শব্দ শুনল। হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকাল প্রথম ভোরের উড়ে যাওয়া বকের পংক্তিমালা দেখতে, কিন্তু কুয়াশার জন্য কিছুই ভালো করে দেখতে পেল না।

আবার ছুটতে ছুটতে ওরা রানীর ঘাটে পেঁছিল। সেখানে গোটা দশেক বহুদিনের পুরোনো আমগাছ আছে, আছে গাছের পাশে পানের বরজ, একটু দূরে থুরথুরে একটা কাঁঠালগাছ আছে...ওখানে ঐ গোপাটের দিকে এককালে আম-কাঁঠালের বাগান ছিল, ছিল কলাগাছ ঘেরা একটা

বাঁশের ঘর, ঘরটি ছিল দুনিয়া মাঝির, সেই দুনিয়া মাঝি খেয়া দিতে দিতে একদিন নৌকোতেই বাজ পড়ে মারা গেল...সেই থেকে কেউ কেউ ঐ ঘাটে রানীর স্নান করার সঙ্গে দুনিয়া মাঝির গল্পও বলে বেড়ায়। রানীর স্নানের সময়ও এমনি এক কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল ছিল—হাল্কা শীতের আমেজে কুয়াশার আবছা অন্ধকারে নদীর মৃদু ঠাণ্ডা জলে স্নান করা হয়তো রোমাঞ্চকর ছিল।

এসব বলতে বলতে ওরা একটা কর্কশ নিষ্ঠুর ও অসুন্দর গলায় শব্দ শুনতে পেল।

ঘটনাটা কি? বলতে বলতে দু জনেই চলছে নদীর ধারের পথ ধরার জন্য। তারপর কুয়াশার ভীড়ে সেই শব্দ আরও স্পষ্ট হতে লাগল, একটা এক তরফা ঝগড়ার আওয়াজ শোনা গেল। তখন আস্তে আস্তে ল তাকে বলল, চলো, আমরা অন্য পথ দিয়ে যাই।

শব্দটা তখন স্পষ্ট। বেশ বোঝা গেল একজন আর একজনকে ধমক দিচ্ছে, গালাগাল করছে। গালিগালাজ দেওয়া লোকটিকে ক্ষমতাবান বোঝা গেল, আর গালখাওয়া লোকটি হবে ভূমিহীন চাষী। সে বারবার ক্ষমা চাইছে, বারবার বলছে, এমন কাজ আর কখনো হবে না, দয়া করে একবার ক্ষমা করুন, দয়া করুন প্রভু, দয়া করুন।

ল বুঝতে পারে সেই কর্কশ ভাষায় কথা বলা মানুষটি তার বাবা। তার বাবা ভূমিহীন চাষীকে জমির খাজনা না দিয়ে খেত করার জন্য শাস্তি দিচ্ছে। আর শাস্তিটা হচ্ছে ঐ চাষীর বেড়ে ওঠা মুলো খেতে হাল চালিয়ে নষ্ট করে দেওয়া। তার বাবা ঐ চাষীর ফলন্ত মুলো খেত ভাঙতে একসঙ্গে তিনটি হাল জুড়ে দিয়েছে...লোকটি করুণ সুরে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করছে ঃ প্রভু ক্ষমা করুন, এবারের মতো রেহাই দিন।

নদীর পাড় থেকে অন্যদিকে যাওয়ার জন্য ডান দিকের জমির আলের ওপর উঠে গেছে তারা। তখনও তারা শুনতে পাচ্ছে ঃ হ্যাঁ ভেঙে দাও, আজ কত বছর ব্যাটা খাজানা ফাঁকি দিচ্ছে। ছোট লোক, ইতর, নেমক হারাম...।

হৃত সর্বস্ব, ক্লান্ত ওরা ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল।

দৃশ্যটি খুব অপ্রীতিকর। ক-ও বুঝতে পারল।

তারপর!

আরও কয়েকবার তাদের দু জনের দেখা হয়েছে। ল নিজের থেকে ক-এর সঙ্গে বিহারের জীর্ণ নিভৃত কক্ষে কয়েকবার দেখা করতে গেছে, কিন্তু কী যেন হয়ে গেল। তারপর ল-এর চলে যাওয়ার সময় এল, তার চলে যাওয়ার কথা ক-কে জানিয়ে দিল। কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকে তারা যখনই মুখোমুখি হয়েছে তখনই কুয়াশা-ভরা চর-সিকস্তির ঘটনাটি তাদের দু জনকেই কেমন অন্য রকম করে দেয়, বিশেষত ল-এর অনিন্দ্য চোখে-মুখে সেই ঘটনার ছায়াপাত হয় বেশি...সেই থেকে সে কেমন আবছা এলোমেলো আনমনা হয়ে যায়...কী অমোঘ আর ক্ষমতাশালী, কী বিষণ্ণ সেই ছায়াপাত, ভালোবাসার কোমল ঐশ্বর্যময় বুকে কী নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ সেই ঘটনার অনুপ্রবেশ!

কী অমোঘ, কী সর্বনাশা! সত্যি কী তাদের দু জনের আর দেখা হবে না?

এও কি সম্ভব!

[গল্পগ্রন্থ ঃ উল্কি একটি প্রেমের গল্প]

সমুদ্র সওয়ার

সমুদ্র সম্ভোগ ও জয়ের অভিযান

সমুদ্রের মুখোমুখি বালির ওপর বসে আছে জয়। অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে। কচিৎ দু-একজন মানুষ জয়ের পেছনের সমুদ্র-বরাবর রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কক্সবাজার সমুদ্রতীর। ভ্রমণ বিলাসী বা স্নানার্থীরা নামে নি তখনো, হোটেল ও মর্টেলে তারা চিনি-ঘুম দিচ্ছে। সূর্য ওঠারও অনেকক্ষণ আগে বলে চারদিকে প্রাকৃতিক শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই—যেন কিছুই ঘটে না বা ঘটার নেই সেরকম একটা দিন শুরু হতে যাচ্ছে। জয় সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। ঢেউগুলো বালিয়াড়িতে ভেঙে পড়ছে, পাহাড় ঘিরে আছে বোশেখের হাল্কা কুয়াশার জাল—কুয়াশায় গাছপালা খুব আচ্ছন্ন সে-কথাও বলা যায় না।

সমুদ্রের মুখোমুখি জয়। কুয়াশার চাদর কেটে যাচ্ছে। ঝাউগাছ শব্দ ঝারছে। সে কি সারাক্ষণ কারো জন্য বসে থাকবে?

মাছের নৌকোগুলো দুলছে, ঝাঁকে ঝাঁকে উঠে আসছে ফুটকি ইলিশ। জয় সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে, এই তার প্রথম কক্সবাজারে বঙ্গোপসাগরের কূলে আসা। নীল জলের কী অপার্থিব বিস্তার! ইলিশ ধরা পড়ছে জালে। লটে মাছের তুলতুলে শরীর, নরম ছুরি মাছের ফটফটে শরীর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। জয় উঠবে বলে বালির ওপর আঙুলে টানা আঁচড়গুলো আস্তে আস্তে মুছে দিচ্ছে। সে নৌকোয় চড়ে এক মাইলও সমুদ্র পাড়ি দেয় নি। মাথার ওপর পড়ে থাকা আকাশের মতো সেও দুলছে। জয় উঠল। বাঁ হাতে কাপড় থেকে বালি ঝেড়ে নিল ঝুরঝুর। আস্তে আস্তে ভেজা বালির দিকে পা বাড়ল। হঠাৎ সে দৌড় দিল, যেন কেউকেটা বীরপুরুষের মতো শক্তিতে তাকে পেয়ে বসল।

একটু পরে সূর্য উঠে আসবে, মাছের নৌকো আসবে কূলের দিকে। ইলিশ, রূপচাঁদা, লাল চিংড়ি, ছুরি, লটে—কত রকমের মাছ। জয় সমুদ্রের জলের রেখা ধরে দক্ষিণ দিকে ছুটছে। টেকনাফে বা বার্মায় হয়তো সূর্য উঠেছে পাহাড় ডিঙিয়ে। তার পায়ের নিচে ঝিনুকের ছোট ছোট খোলস। দৌড়ুতে দৌড়ুতে সে দেখছে চিত্র-বিচিত্র ঝিনুকের দল, পায়ের নিচে পড়ে বালিতে দেবে যাচ্ছে। ঢেউ এসে বালিতে ঢেকে যাচ্ছে, আবার আরেকটি ঢেউয়ে জেগে উঠছে...সমুদ্র এরকমই। সমুদ্র সমুদ্রের মতো দুলছে।

জয় কি কারো অপেক্ষায় বসে ছিল, এবং অধৈর্য হয়ে ছুটতে শুরু করেছে? ততক্ষণে কক্সবাজারের ঘুম ভেঙে গেছে। দু-একজন করে বালিয়াড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। জেলেরা খাঁচা-ভর্তি মাছ তুলছে, কাঁধে ভার নিয়ে নৌকো থেকে ছুটছে। মরা মাছের সঙ্গে সঙ্গে শরীর থেকে এরকম অপার্থিব সাদা আলো বের হচ্ছে। পর্যটন ভবন উর্মি থেকে কয়েকজন মহিলা ও পুরুষ বেরিয়েছে, ততক্ষণ জয় অনেক দূর চলে গেছে, একটি বিন্দুর মতো মনে হচ্ছে তাকে। হঠাৎ সেই বিন্দুটি ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রে, উথাল-পাথাল ঢেউয়ে সাঁতার কাটতে লাগল, মাছেরাও যেন সে-খবর পেয়ে আরো গতিশীল হয়ে উঠল।

উর্মি থেকে বেরিয়ে আসা জনৈক মহিলা তাকিয়ে দেখল তার দিকে। রক্তিম পা ফেলে ভেজা বালির রেখা ধরে ছোটাছুটি করছে অনেকে। সমুদ্রে আলোর রেখা ফুটে উঠেছে, সে তার হাল্কা-নীল উত্তরীয় খুলে ছুঁড়ে ফেলল, ঝলকে ঝলকে বদলে যাচ্ছে তার রূপ।

জয় সাঁতার কাটছে। এখন সে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। সমুদ্রের ঢেউ যেন তার কাছে রহস্য মেলে ধরেছে। কী প্রশান্তি! সে যেন এক শক্তিমান অতিমানব···যেন দৈত্য···নির্ভয়ে সাঁতার কাটছে সে। তখন সূর্যের আলো প্রথমে আকাশে পাখা মেলে তারপর সমুদ্রের বুকে লুটিয়ে পড়ল। বৌদ্ধ বিহারে ঘন্টা বাজছে। আর তখন সঙ্গীতা জয়কে বিহারে না পেয়ে সমুদ্রের দিকে ছুটে আসছে।

আগের দিন সঙ্গীতা জয়কে বলেছিল প্রথমে তারা পাহাড়ের ওপরের বৌদ্ধ বিহারে যাবে, সেখান থেকে যাবে সমুদ্রের কূলে; কিন্তু জয় সঙ্গীতাকে মনে মনে প্রথমে সমুদ্রের ধারে কল্পনা করেছে। সঙ্গীতা জয়ের জন্য গৌতম বুদ্ধকে সাক্ষী মেনেছিল। জয় সমুদ্রকে মেনেছিল।

এতক্ষণ সঙ্গীতা জয়ের জন্য বিহারে অপেক্ষা করে করে শঙ্কিত হয়ে শেষে সমুদ্রের দিকে ছুটে আসছে। জয় তখন সাঁতার কাটছে।

সঙ্গীতা জয়ের জন্য কী প্রার্থনা করেছে আর মনে নেই···শুধু মনে আছে কী যেন তার চাওয়ার আছে। সে ভালোবেসে জয়ের সঙ্গে বেড়াতে এসেছে। জয় এখন সঙ্গীতার কথা আর ভাবছে না। গতকাল সম্পর্কে এখন তার আর ভাবনা নেই, সে তার কবিতার

পাণ্ডুলিপি বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছে।

সঙ্গীতা জয়ের জন্য সমুদ্রের দিকে ছুটছে। সে বিহারের ঢালু পথ বেয়ে পাহাড় থেকে নামছে, পাহাড়ের চুড়োয় বিহার, বরাভয় মুদ্রায় উপবিষ্ট গৌতম বুদ্ধ···সেখান থেকে সঙ্গীতা জয়কে খুঁজতে সমুদ্রের দিকে ছুটছে।

শুক্রবার । একটি সংক্ষিপ্ত পূর্ববর্তী অধ্যায় ও আজ

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঝাউ ও সমুদ্রের শব্দ শুনতে শুনতে দেখল জয় বিছানায় নেই। বারান্দা, শৌচাগার—কোথাও নেই। গতরাত অব্দি ঠিক ছিল খুব ভোরে তারা বৌদ্ধ বিহারে যাবে, সেখানে থেকে সমুদ্র সৈকতে যাবে সূর্য ওঠার আগে। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে জয়কে দেখতে না পেয়ে সঙ্গীতার সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেল। জয়ের থেকে হঠাৎ এরকম ব্যবহার সে আশা করে নি। এরি মধ্যে এমন কিছু ঘটেও নি যে জয় না বলে কোথাও চলে যাবে। ঘরের সবকিছু ঠিকঠাক আছে। টেবিলের ওপর কাগজ-কলম, দু'টি বই, গ্লাস-ভর্তি জল, বাসি পত্রিকা, কাটাকুটি করা কিছু কাগজ, একটি বড় রক্তিম শঙ্খ ঠিক তেমনি পড়ে আছে। জয় কিছু লিখে গেছে কিনা সে খুঁজল। বাতি জ্বেলে আরো কিছুক্ষণ এটা-ওটা দেখে শেষে জানালা দিয়ে দূরের দিকে তাকাল। কাছেই পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে তরল কুয়াশার পর্দা হাওয়ায় হাওয়ায় দুলছে। খুব কাছের পাহাড়ে আছে বৌদ্ধ বিহার, গাছের ফাঁক দিয়ে আবছা দেখা যাচ্ছে, আকাশের সঙ্গে কানাকানি করে কী যেন বলছে। সঙ্গীতা হাতঘড়ি নিতে বালিশ ওল্টাল, সেখানে টাকাও রয়েছে। সঙ্গীতার একটু অভিমান হল। জয় কি তাকে এড়াতে চায়? অথচ সে-রকম কিছু তো ঘটে নি! গতরাতও সে আদর করেছে, বুকে মুখ রেখেছে, দু হাতে তুলে নিয়ে চুমুও খেয়েছে···

শুক্রবার তাদের প্রথম পরিচয়, তাই জয় তাকে এই নামেও ডাকে।

শুক্রবার, নাও শুরু করো। তর সইছে না।

গল্প বলবে বলেছিলে, আর আমি ···

কিসের গল্প?

কেন, তোমাদের দলের সবাইকে ছেড়ে তুমি আমার কাছে এলে, আমি তো তোমাদের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম।

ইস, বড় ইয়ে যে! নাও আমি বলব না।

কেন শুক্রবা ··আজ তো সেই এক বছর পরের দিনটি···

ও, এই বুঝি তোমার···না, আমি বলব না।—এই বলে সঙ্গীতা পাশ ফিরে শুল, কপট অভিমান দেখাল।

জয় তাকে ফেরাল। সে সঙ্গীতার মুখ টেনে নিল নিজের দিকে, অস্ফুট শব্দ করল···গানের সুর···অথবা ভালোবাসার শব্দ।

জয় বলল, এই বুঝি তোমার গল্প বলা, অথচ সকাল সকাল ফিরিয়ে আনলে সমুদ্র থেকে, বর্মীদের তৈরী বুদ্ধ মূর্তিগুলো দেখা হল না। এখানে এসে ধ্যানী বুদ্ধকে না দেখলে···

নাও। আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

অসুখ, দুর্বল লাগছে?

হ্যাঁ, ইয়ে, শরীরটা একটু গুলুচ্ছে।

কি?

তেমন কিছু না। খুব ভালো লাগছে এভাবে থাকতে।

বক্স খুলে কিছু নিতে হবে···শুক্রবা···

দুষ্টু! এসব শিখলে কোত্থেকে? এদিকে সাধু-সন্তের মতো বলো কোনো মেয়ের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা নেই, তুমি আমার ইয়ে···ইয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে খুব বলতে জানো।···এ্যাই এ্যাই, মুখটা দেখি--বলতে বলতে জয়কে বুকের কাছে টেনে নিয়ে এক গণ্ডা চুমো খেয়েছিল।

গতরাতের কথা ভাবতে ভাবতে সঙ্গীতার মনে সূক্ষ্ম বেদনা দোলা দিল। জয় এমন কাণ্ড করে যে সঙ্গীতা থরথর করে ওঠে। গতরাতের জয়, গত দিনগুলোর জয় আজ তাকে না কিছু বলে কোথায় চলে গেল। অভিমানে ও কষ্টে বুক ভারী হয়ে উঠল—না বলে পাহাড়ে যাওয়ার মজাটা বুঝিয়ে দেবে সে—এই ভেবে আরো কষ্ট বাড়তে লাগল। কোথাও যাবে না সে, জয় এসে সাধলেও নয়! কিন্তু স্থির থাকতে না পেরে সে বেরিয়ে পড়ল পাহাড়ের দিকে। চারদিক তখন ফর্সা, বিহারে ঘন্টা বাজছে—সঙ্গীতার বুক সেই ধ্বনি-তরঙ্গে ভরে উঠল। বঙ্গোপসাগরে যেন নীল আকাশ। নীল আকাশ যেন বঙ্গোপসাগর। ভোরের পাখিরা ডাকছে, সেই সঙ্গে বিহারের ঘন্টাধ্বনিও। বিহারে পৌঁছে সঙ্গীতা সকলের পেছনে বসল। জয়ের জন্য, নিজের জন্য, ও পৃথিবীর সকল জীবের জন্য প্রার্থনা করে চলল। 'প্রাণের অধিকারী যে প্রাণী তা এক অমূল্য ও দুর্লভ ধন। মানুষই শুধু প্রাণের অধিকারী নয়, আরো শত-সহস্র প্রাণী রয়েছে পৃথিবীতে। কাজেই শুধু

মানুষ নয়, সব প্রাণীর প্রাণ মূল্যবান। এজন্য প্রাণহনন এক গর্হিত কর্ম। সর্ব জীবে দয়া…' বলে মারমা ভিক্ষু প্রার্থনা শেষ করলেন। সঙ্গীতা উঠে দাঁড়াল। ধূপ-দীপাধারে আলোকিত বুদ্ধ মূর্তির বরাভয় বুকে এঁকে বঙ্গোপসাগরের দিকে ছুটল…সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

দ্যাখো বাতাসে পাতারা কেমন করছে সারা থেকে শুরু হচ্ছে সব কিছু

জয় সাঁতার কাটছে। কখনো বুকে ভেসে, কখনো ঢেউয়ে চিৎপাত শরীর ভাসিয়ে, কখনো আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে--এভাবে অনন্তকাল যদি সাঁতার কাটা যায় তো তা-ই সে আকাঙ্ক্ষা করবে। জয় বুঝি লক্ষ লক্ষ বছর এভাবে সমুদ্র-সম্ভোগ করছে। পৃথিবী যখন শুধু জল আর স্থলে বিভক্ত ছিল, যখন পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হয় নি সেই থেকে জয় সমুদ্রে ভাসছে…এভাবে সে অনন্তকাল ভাসতে পারবে…ভাসতে ভাসতে জয় ডুব দিল…ঢেউয়ের নিচের সমুদ্রমুখী স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল…জয় ভেসে চলল, ভাসতে ভাসতে কোথায় যাবে সে জানে না…অথচ মানুষ কোথাও না কোথাও যায় একথা জয় জানে। জয় ডুবতে লাগল, যেন বহুদিন ধরে সে ডুবছে অথচ তল নেই…ডুবতে ডুবতে স্বপ্ন দেখছে…বালক বয়সে দেখা ভবিষ্যতের কল্প-জগৎ অথবা রূপকথার রাজ্যের মতো, অথবা সমুদ্র দেখার আগে যেমন কাল্পনিক সমুদ্রের স্বপ্ন দেখত ঠিক তেমনি। কুয়াশার সঙ্গে যেমন ধোঁয়া মিশে বেড়ায়, বোশেখের দুপুরে যেমন রোদের ভাপের সঙ্গে উদাস হাওয়া ভেসে বেড়ায়, কবিতা লিখতে লিখতে যেমন স্বপ্নের রাজ্যে ঘুরে আসা যায়…জলের নিচে শুয়ে শুয়ে জয় একটি একটি স্বপ্ন দেখছে…এরকম একটি স্বপ্নও হয়তো দেখে থাকবে ঃ জয় জলের ঠাণ্ডা বিছানায় শুয়ে আছে এবং তার চারদিকে মাছেরা তাকে গল্প শোনাচ্ছে…সমুদ্রের বুকে জয়ের মৃত্যু হয়েছে, তাই জয়ের পাড়াপড়শী, পুস্তক প্রকাশক, সঙ্গীতা—সবাই তার বাড়িতে ভীড় করেছে, প্রকাশক এসে পাণ্ডুলিপি খুঁজছে, মৃত্যুর পর জয় একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক হয়ে গেছে…তারা জয়ের পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাচ্ছে না…খুঁজতে খুঁজতে কক্সবাজারে পৌঁছে যায়, তারা জানতে পেরেছে জয় তার জীবনের শেষ দিনগুলো কক্সবাজারে কাটিয়েছে…তারা কক্সবাজারে এসে দেখল জয় সমুদ্রের নিচে শুয়ে আছে—শুয়ে শুয়ে সে নিজেকে দেখছে, অতীত ও ভবিষ্যত এক হয়ে গেছে স্বপ্নে,

গাছে গাছে ভীমরাজ পাখি ডাকছে, বালুচরে ডাকছে টিটিভ, সমুদ্রের নীল রঙ এক বার রুপোলি, রুপোলি থেকে নীল হচ্ছে, গাঙচিল ভাসছে ঢেউয়ে, উড়ছে ও নামছে, কূলের থমথমে ঝাউয়েরা বাস্তব-অবাস্তবের বাসিন্দা হয়ে যায়…সঙ্গীতা আচ্ছন্ন চোখে দাঁড়িয়ে আছে। প্রার্থনা হচ্ছে, 'যে কোনো প্রাণী, কী সবল কী দুর্বল, কী দীর্ঘ কী প্রকাণ্ড…যারা দূরে বাস করছে বা যারা নিকটে, যারা জন্মেছে বা জন্মাবে--অনবশেষে সকলেই সুখী হোক।' প্রার্থনা শেষে ঘন্টা বাজছে, ঘন্টার উদাত্ত ধ্বনি জয়ের মৃত্যুর মহিমা ঘোষণা করছে…জয় স্বপ্নে দেখছে।

> 'ফেনিল, নীল অনন্ত সমুদ্র! উভয় পার্শ্বে যত দূর চক্ষু যায় তত দূর পর্যন্ত তরঙ্গ প্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা, স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনার রেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হয়েছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ নীলজলমণ্ডলমধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখন এমত প্রচণ্ড বায়ুবহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগর-তরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল।'

প্রত্যাবর্তন বা জয়ের মর্তে আগমন

জিদ জয়ের ছোট ভাই। জয়ের মৃত্যুর কিছুদিন পর সে কক্সবাজারে বেড়াতে এসেছে। সে কবি নয়, কাব্যচর্চা করার অবসরও তার নেই। চট্টগ্রাম শহরের এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের চাকুরীজীবি সে। আগে কোনোদিন কক্সবাজারের আসে নি, কিন্তু সমুদ্র দেখেছে বহুবার। সমুদ্র পথে সে একবার কোলকাতা যায়, আরেকবার পুরীর সমুদ্রতীরে তিন দিন কাটিয়ে এসেছে, চিল্কা দেখেছে, সেখানে রুমি নামক জনৈকা মহিলার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তার সঙ্গে কোনারক ঘুরেছে…জিদের সমুদ্র-স্মৃতি মধুর উষ্ণতায় ভরা। রুমি চিঠি লিখেছে। সেও উত্তর দিয়েছে শীতের শুরুতে যাবে বলে।

দ্বিতীয় দিনেই জিদের কাছে কক্সবাজার অসহ্য হয়ে উঠল। সমুদ্র থেকে আসা একটি ছায়া যেন বারবার তাকে অধিকার করে বসে,

তাকে নিয়ে বালিয়াড়িতে খেলে...আবার একটি গাঙচিল উড়ে উড়ে জিদের দিকে ছুটে আসে, মাথার ওপর পাক খেয়ে আবার সমুদ্রের দিকে চলে যায়। আবার আসে। তার ধপধপে বুক থেকে এক রকম অপ্রাকৃত আলো বিচ্ছুরিত হয়, 'কুরর কক্' শব্দ করে কী যেন বলতে বলতে চলে যায়। দ্বিতীয় দিন গাঙচিলটি তাকে বেশি করে পেয়ে বসে। সে উড়ে আসে, শাদা বুকে কী যেন দেখায়, আবার চলে যায়।

বালিয়াড়ি পড়ে থাকে। মানুষের আনাগোনা কমে আসে, যারা আসে তারাও যেন ক্লান্ত। অনেকে মোটেলের বারান্দায় ও অলিন্দে বসে বসে সময় কাটায়। কচিৎ কয়েকজন সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার বেলাভূমি শান্ত হয়ে যায়। তখন সেই গাঙচিল জিদের কাছে চলে আসে, সমুদ্র তখন শব্দ করে, ঝাউগাছ ডাক পাড়ে, সকাল-সন্ধেয় বিহারে ঘন্টা বাজে...আস্তে আস্তে জিদ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

দেখতে দেখতে জিদ সবকিছু ভুলে যায়, নিজেকে পবিত্র মনে করে, নিজেকে নিয়ে মনে মনে গর্ব অনুভব করে, খুব শান্ত ও সমাহিত হয়ে যায়। আস্তে আস্তে যেন সমুদ্রের বন্ধ দুয়ার খুলে যায়, নোনা গন্ধ ও কথাবার্তা শুনতে পায়। জয় তাকে ডাকে, জরুরী কথা বলবে বলে তার শরীরেই বুঝি ঢুকে পড়ে। সে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে একটা কিছু করার, একটা জরুরী কাজ যেন করার বাকি রয়ে গেছে—কিছুতেই সে বুঝে উঠতে পারে না। রুমির কাছে যেতে হবে, জয় কি রুমির কথা বলছে? হু হু করে উঠল তার মনপ্রাণ। সেই গাঙচিল আর আসে না কেন? কি বলে গেল ডাকতে ডাকতে? জিদ ভর-সন্ধের হোটেলে ছুটল, হোটেল থেকে বাস ডিপো, বাস ডিপো থেকে হোটেলে, হোটেল থেকে বাজারে......বাজারে পৌঁছে দেশী পানশালায় ঢুকে দুই চুঁআনি খেল ঢক ঢক করে। সেখানেও বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারল না। আবার বঙ্গোপসাগরের কূলে ছুটল, বালিয়াড়িতে পায়চারি করে দক্ষিণমুখী যেতে যেতে জয়ের কথা মনে পড়ল...বালিয়াড়িতে দীর্ঘ ছায়া নেমে পড়েছে, হাওয়া ছুটছে, ঝাউপাতা ডাকছে শন শন ঝম ঝম। সে জয়ের মতো ছুটল। জয় যেন তাকে একটি কবিতার পংক্তি বলে যাচ্ছে, সংকেত পাঠাচ্ছে।

বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছে কূলের ওপর। সর সর করে সে ঢেউ ভেজা বালি মাড়িয়ে তার পায়ের কাছে চলে এল, পা ছুঁয়ে দিল তার সমস্ত শরীরে নতুন এক অনুভূতি জাগিয়ে তুলল। নতুন অনুভূতি নিয়ে সে কী করবে ভাবতে লাগল, আর দাঁড়াতে পারল না

জয় তাকে নিয়ে যেতে চায় কোথাও, জয় যেন তাকে পেছন থেকে তাড়াচ্ছে, হোটেলে যেতে বলছে...।

জিদ আস্তে আস্তে জয় হয়ে গেল। ভেজা বালি, শুকনো বালি, ঝাউবীথি ও বাঁধা রাস্তা ফেলে সে ছুটল।

রাস্তার মানুষ থমকে দাঁড়িয়ে তাকে দেখল। সেদিকে তার খেয়াল নেই। সে রাস্তা পেরিয়ে গেল। হোটেলের ফুল বাগান পেরিয়ে উঠোনে পৌঁছল। একজন বেয়ারা সরে দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দিল। কোনো দিকে তার খেয়াল নেই। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল, চাবি ঘুরিয়ে তালা খুলল, এক ঝটকায় দরজা খুলে টেবিলে সামনের চেয়ারে গিয়ে বসল। কাগজ কলম নিল। কলম খুলল। জয় তার হাতের কলম চালিয়ে লিখিয়ে চলল। কোনোদিন সে যা করে নি তা করল...লিখল,

স্মৃতির ঘরে প্লাবন আজ
মধ্য দিনে খুঁজছি যারে
জ্বলছে ক্ষুধা গরীব ঘরে
রাষ্ট্র করা সঙ্গীতে তাই

বারান্দাটা পেরিয়ে যাবো
অবরোধের ভয় করি না
প্রিয়তমার বুকের প্রেম

স্মৃতির ঘরে
মধ্য দিনে
জ্বলছে
নেই কো সুখ!
নেইকো সুখ।
বারান্দাটা
অবরোধের
রাখবো কি করে!
রাখবো কি করে।

সে পড়ে দেখল। 'গরীব ঘরে' করল 'গরীব দেহে', 'অবরোধের' শব্দটি 'অবরোধ' করল। তারপর নতুন করে ভাবল সে কোনো দিন পদ্য লেখে নি। জয় তাকে তাড়িয়ে চলেছে...আবার মনে পড়ল সমুদ্রের প্রতাপান্বিত ঢেউয়ের কথা, সেই নিঃসঙ্গ গাঙচিলের কথা...ভেজা বালি থেকে অন্তত পনেরো হাত দূরে সে বসেছিল। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল, ঢেউটি যদি আরো শক্তিশালী হয়ে ছুটে আসত, যদি তাকে ধুয়ে নিয়ে যেত—মৃত্যু হত! কেউ বলতে পারে না ঢেউয়ের আক্রমণে জয়ের মৃত্যু হয়েছিল নাকি আত্মহত্যা করেছে! সে নিজেই এখন জয়। আবার নিজেকে নিজে বলল, না।

কিন্তু মৃত জয় তার কাছে কি চায়? জয় তাকে পদ্য লিখিয়ে চলেছে। সে আবার চরণগুলো পড়ে নিল। কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলল, মেঝেয় ছড়িয়ে দিল। পাখার হাওয়ায় ছেঁড়া টুকরো উড়ছে, সর সর শব্দ হচ্ছে, মাথার ভেতর ঘন্টা বাজছে।

রাত অনেক হল। বেয়ারা খাবার দিয়ে যাওয়ার সময় বলেছিল আর কিছু দরকার আছে কিনা! সিগারেট বা চা, দেশলাই না কফি!

খাবার থাক। প্লেটগুলো সকালে নিয়ে যেও। আর কিছু চাই না।

আরো অনেকক্ষন পর সময় মতো একটা বাজল। রাত বেড়ে যায় আরো। বঙ্গোপসাগরের শব্দ, ঝাউ-এর একটানা শীস--পার্থিব ও অপার্থিব সব কিছু কক্সবাজারকে মহিমাময়ী করে তোলে। সে কলম তুলে নেয়, পায়চারী করতে থাকে, গাঙচিলের ডাক শুনতে গায়, বৌদ্ধ বিহারের ঘন্টা শুনতে থাকে......লিখতে শুরু করে। ভোর হয় হয়।

ভোর হয় হয়। ঘুম চোখে স্বপ্ন নিয়ে খেলা চলেছে

সে কবিতার কথাও সঙ্গীতার কথা ভাবতে লাগল।

টেবিল ছেড়ে উঠল, বাথরুমে গেল, হাত-মুখ ধুয়ে এল। দেয়ালের কোথায় যেন একটা টিকটিকি থপ থপ ডাকল। ভোর হয়ে এল। বিছানা থেকে উঠে জিনিসপত্র গোছাতে লাগল, কাপড় বদলে নিল। রুটি-ডিম-চা যা পেল খেয়ে নিল। বিল শোধ করল। বাস ডিপোতে ছুটল।

বাস ছুটল। জনা বিশেক যাত্রী মাত্র। একটা সিগারেট জ্বালল, মিছিল করে নামল ক্লান্তি। জয় তাকে আদর করে ঘুম পাড়াল! সেই বালক বয়সের ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির গান শুনে ঘুমিয়ে পড়ল। ঠিক ঘুম নয়,আবার জাগরণও নয়, অথচ পথে পথে বার বার ঘুম ভাঙে। যত বার ঘুম ভাঙে ততবার পাশের ভদ্রলোক থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়। আবার সেই আচ্ছন্নতা, আবার পাশের ভদ্রলোকের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। সারাক্ষণ বিড় বিড় করে মনে মনে। সঙ্গীতা বারবার তাকে ডাকে, আভাসে কিছু বলতে চায়···সে পাড়াগাঁর আচ্ছন্ন কুয়াশার মতো পড়ে থাকে, ঝিনুকের খোলসের মতো ঢেউ-এর ধোয়া-মোছায় পড়ে আছে।

সঙ্গীতা কি তাকে ডাকছে? সঙ্গীতা জয়কে ভালোবাসত। এখন জয় নেই। সঙ্গীতা কি এখনো জয়কে মনে করতে পারে?

সবুজ পাহাড়ের পাশ দিয়ে রাস্তা চলেছে। গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে যায় সে। এভাবে এক সময় সে শহরে পেঁছিল। চট্টগ্রাম শহরও হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ছে। ভেসে চলেছে গাড়ি ও লোকজন। এক সময় সন্ধে নামল।

শহরে পেঁছেই সে সঙ্গীতার কাছে ছুটল। সঙ্গীতার কাছে পেঁছেই ঠিক জয়ের মতো ডাকল। জয় যেমন কথা বলত, হাসত এবং চোখ তুলে তাকাত ঠিক সেরকম ব্যবহার করল।

সঙ্গীতাও অবাক হয়ে অতীত হাতড়ে স্মৃতি খুঁজতে লাগল। সঙ্গীতা ভেবে ভেবে অবাক হল, জিদ তো কোনো দিন তার হাত ধরে নি! জিদের সঙ্গে দেখাই হয়েছে একবার কি দু বার। সঙ্গীতা স্পষ্ট করেও ভেবে বের করতে পারল না ক'বার দেখা হয়েছে। জিদের ব্যবহার তার সব কিছু এলোমেলো করে দিল। একবার সৌজন্য সাক্ষাতের কথা মনে পড়ে। আর এখন ঠিক জয়ের মতো হাত ধরে টেবিলের ওপর সে বসল। জয়ের মতো কক্সবাজারের কথা বলল, সঙ্গীতার আঙুল বাজিয়ে খেলা করে চলল, সঙ্গীতার তর্জনী ও মধ্যমার ফাঁকের তিলটি আবিষ্কার করে চুমু খেল, তারপর দু জনে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। নিস্তব্ধ প্রান্তরের মতো টেবিলের ওপর ওরা আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল।

অবুঝ হৃদয়। অস্তিত্ব পথ প্রদর্শক। অসমাপ্ত কথা

কী বলছ!

সঙ্গীতা, আমি বেঁচে আছি। আমার মনে হচ্ছে, আমার সবকিছু···

বেঁচে থাকবে না মানে? নিশ্চয়ই আছ!—সঙ্গীতাও কূল না পেয়ে বলে দিল।

মনে হচ্ছে কী-যেন হঠাৎ ওলট-পালট হয়ে গেল, কী-যেন ঘটে গেছে।

কি রকম?

যেন দূরের সঙ্কেত· 'দূর সমুদ্রের নিচ থেকে এক অতল রহস্য আমাকে ডাকছে। সাগরের তল দিয়ে মহাসাগর ঘুরে মেরু সাগরে যেতে হবে। যেতে হবে বলে আমার হৃদয় সারাক্ষণ বকবক করছে। গতকাল একটা গাঙচিল এসে সে-কথা বলে গেছে। একবার ভাবি চুপচাপ পড়ে থাকি, আবার মনে হয় দু হাতে সব লুটপাট করে নিই, জোর করে কেড়ে নিই আমার পাওনা...আবার ভাবি, দুচ্ছাই! পৃথিবীটা পুরনোদের হাতেই থাক, ওরা ঘসামাজা করুক, তারপর এক সময় আমিও ভিড়ে যাব না হয়। এখন মনে হচ্ছে তোমাকে নিয়ে পাহাড়ে যাই, তোমাকে নিয়ে সমুদ্রে বেড়াতে যাই (সমুদ্রের কথা শুনেই সঙ্গীতা চঞ্চল হয়ে উঠল), তোমাকে নিয়ে নিঝুম দ্বীপে যাই (সঙ্গীতা আবার কেঁপে উঠল)...দেখবে জীবন কত সুন্দর! অথচ এরকম কখনো ভাবি নি আমি, শহরে ছেড়ে গ্রামে থাকার কথা কল্পনাও করতে পারতাম না। তোমার সঙ্গেই বা কতটুকু পরিচয়! সঙ্গীতা, তুমি আমাকে পাগল ভাবছ না তো!

দোহাই, দোহাই তোমার জয় (সঙ্গীতা ওকে জয় নামে ডেকে আবার

ভাবল), অমন করো না। আমাকে পাগল করে দিও না। তুমি জিদ হও আর জয় হও, আমাকে আর সংশয়ে রেখো না। আমাকে সবকিছু খুলে বলো!

তার সব কিছু জয়ের মতো। কথা বলা ও আদর করার ভঙ্গী, নাম ধরে ডাকা, চুমু খাওয়া...চুলের ঠিক নিচে ঘাড়ের ওপর চুমু খাওয়া কোথা থেকে শিখল? সঙ্গীতা থর থর করে কাঁপতে লাগল নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল।

আস্তে আস্তে ওরা আবার কথা শুরু করল।

জানো শুক্রবার, আমার ইচ্ছে করছে...আমার খুব একটা কিছু করতে ইচ্ছে করছে...কিন্তু সেটা কী ঠিক বুঝতে পারছি না। আসলে...

বলব?

বলো!

সঙ্গীতা দু হাতে ওর মুখটি তুলে নিল। মমতা ভরে চুমু খেল।

সঙ্গীতা!

জয়!

শাশ্বত সূর্যের ঝিলিমিলি রোদের মতো হেসে উঠল ওরা। অনেকক্ষণ ওরা হাসির উৎসব পালন করল।

তারপর বিছানায় শুয়ে সে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল...সঙ্গীতার শুদ্ধ আবেগের কাছে নিজেকে ভাসিয়ে দিল। ঘুমিয়ে পড়ল। গরমের দুপুরে পাড়াগাঁর মাঠ যেমন আচ্ছন্ন পড়ে থাকে ঠিক সেরকম ঘুমিয়ে পড়ল। সেই ঘুমের ভেতর ঘুমিয়ে থাকতে থাকতে একবার জয় একবার জিদের কথাবার্তা শুনতে পেল। আগামীকাল জাগবে বলে সঙ্গীতার কোলে ঘুমিয়ে পড়ল।

আগামী কাল জাগবে বলে?

আগামী কালের কথা কি কেউ নিশ্চিত বলতে পারে?

'বাতাস উঠিল।

চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিল, গুহামধ্যে অল্প আলোক প্রবেশ করিয়াছে; বাহিরে পক্ষীর প্রভাতকূজন শুনা যাইতেছে---কিন্তু এ কি এ? কাহার অঙ্কে তাহার মাথা রাখিয়াছে---কাহার মুখমণ্ডল, তাহার মস্তকোপরে গগণোদিত পূর্ণচন্দ্রোবৎ এ প্রভাতান্ধকারকে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে?'

[গল্পগ্রন্থ : আকাশে প্রেমের বাদল

চুয়াল্লিশ পা

মানুষের আসার বিরাম নেই। পাড়াগাঁর মানুষ যেন পাগল হয়ে ছুটছে। চারদিকে হু হু একটা শব্দ, একজন আরেকজনকে ডাকছে, ছেলেদের মাঝে পড়ে গেছে ছোটাছুটি—মাঠের মধ্যেও ঝলমল করে বাজছে মানুষ।

মাঠে তখনও খেলোয়াড়রা নামে নি। মাইক থেকে ঘোষণা করছে মাঠ পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য, স্বেচ্ছাসেবকরা ঘোষণা শুনে তৎপর হয়ে উঠেছে। বল নিয়ে মাঠের মধ্যে যে-কয়জন ছেলে ছোটাছুটি করছে তাদের দিকে তাকিয়ে পাড়াগাঁয়ের মানুষগুলো মন্তব্য করছে। স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের তুলে দিতে ছুটল।

হঠাৎ মাঠের এক কোণে লালকালো গেঞ্জি পরা একদল খেলোয়াড়কে দেখা গেল, অমনি দর্শকরা নিমেষের মধ্যে চুপ। ঈষাণ কোণ থেকে মাঠের উত্তর প্রান্ত ধরে একে একে সারবন্দী খেলোয়াড় ছুটে আসছে, মাঠের মাঝ-রেখা বরাবর এল। সামনের কালো মাঝারি ধরনের দীর্ঘ তরুণটিই দলের ক্যাপটেন, আর পেছনের নীল রঙের পুরো-হাতা গেঞ্জি-পরা তরুণটি হবে গোলরক্ষক। বাঘমুখ গ্রামের দল। এবার দর্শকদের অনেকেই হাততালি দিচ্ছে, অনেকেই চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছে, দলের সমর্থকরা দাঁড়িয়ে রুমাল নেড়ে উল্লাসে ফেটে পড়েছে। মাঠে নামল ক্যাপটেন, পেছন থেকে গোলরক্ষক হাত দিয়ে বল ছুঁড়ে দিল, মাঠের মধ্যরেখা ধরে নামা সকল খেলোয়াড় এবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, দর্শকদের অনেকে হাততালি দিচ্ছে, শিস দিচ্ছে। শব্দের ভারে চারদিক ডুবে গেল, পাড়াগাঁর মাঠ একসঙ্গে পাহাড় ও নদীর নৈঃশব্দ বেজে উঠল।

মাঠের তিন দিকে পাহাড়। ঝোপে ঢাকা ছোট ছোট পাহাড়, পাহাড়ের মাঝখানের জায়গাটিই মাঠ—মাঠতো নয় যেন একটা বড় সানকি। তিন দিক থেকে ক্রমশ ঢালু হয়ে মাঠের মাঝখানটিতে মিশেছে। পুব দিকটায় পাহাড় সেই। মাঠ সেদিকটায়ও ঢালু। সেদিকে যারা থাকবে তাদের চোখে সূর্য পড়বে, তবে পোষের দিন বলে সূর্য দক্ষিণ দিকে হেলে আছে, খেলোয়াড়দের জন্যও এইটুকু সুবিধে। দর্শকদের

অনেকেই পাহাড়ের ঢালুতে বসেছে, ঝোপ-ঝাড়ের আঁশটে গন্ধ মেখে তারা বসে আছে, কেউ কেউ পাহাড়ের গায়ের বেশ উঁচুতে বসেছে, দু-তিনটা আম আর কাঁঠাল গাছে চড়ে বসেছে ছেলেপুলের দল, তাদের আনন্দের আর অবধি নেই। পাড়াগাঁয়ের ফুটবল খেলা, গ্রাম ভেঙে মানুষ এসেছে, উল্লাসের বন্যা বয়ে চলেছে। পাড়াগাঁর মানুষের আনন্দের এইতো সম্বল। গ্রাম ভেঙ্গে লোক এসেছে। অনবরত আসছে।

মাঠের ঈষাণ কোণে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘর, সেদিকে মাইক নিয়ে চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে কর্তারা বসেছে, টেবিলের ওপর শহীদ ক্যাপটেন করিম শীল্ড। গ্রামের সঙ্গী-সাঙাতরা তাদের বন্ধু ক্যাপটেন করিমের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের স্মৃতিকে অমর করে রাখতে, কিংবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বন্ধুকে ঘিরে নিজেরা বেঁচে থাকতে এই ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। আজ ফাইনাল খেলা। মাঠের চারদিকে মানুষ দলে দলে আসছে—পাহাড়ের গায়ে, ঢালুতে, নিচে, একটুও ফাঁকা জায়গা থাকবে না। এই খেলাকে কেন্দ্র করে গ্রাম-গ্রামান্ত আলোচনার ঝড় বয়ে চলেছে, চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আজ ক্যাপটেন করিমের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী।

বল নিয়ে সজল ছুটছেন, গোলে গোলরক্ষক নেই, ফরওয়ার্ড ফয়েজ এগিয়ে যাচ্ছেন, বল নিয়ে ছুটলেন সজল, সজল ছুটছেন পুব দিকের গোলের দিকে, আরও বেগে এবং শট করার সঙ্গে সঙ্গে বল সরাসরি গোলের মধ্যে জালে আটকে গেল। বাঘমুখ দলের সমর্থকরা চিৎকারে হাততালিতে ফেটে পড়ল। এভাবে মাঠে নেমেই নিজেদের দিকে ফাঁকা মাঠে একটা গোল করা শুভ লক্ষণ---কিন্তু খেলা শুরু হতে এখনও দেরি আছে। মাঠের পুব দিকে তাদের লাল-কালো পোশাক ঝলমল করে বাজছে। এবার পশ্চিম দিকে নামছে শহরের সড়ক ও জনপথ বিভাগের দল। তারা দল বেঁধে নামল না, কিন্তু যে পাঁচজন হুড়মুড় করে নেমেছে তাদের নীল-লাল পোশাকের ভারি দীপ্তি। তাদের নীল শার্টের ওপর লাল হরফে লেখা আছে 'জনপথ'। বিদেশী সিল্কের পোষাক পরে মাঠে নেমেছে তারা। তাদের রাস্তা তৈরী হচ্ছে বাঘমুখ গ্রামের ওপর দিয়ে, গ্রামের ঘরবাড়ির নির্জনতা ভেদ করে চল্লিশ হাত প্রশস্ত রাস্তা তৈরী হচ্ছে। কুলি-মজুরের আনাগোনায় ও গানে বাঘমুখ গ্রাম তার চিরকালের নির্জনতা হারিয়ে ফেলেছে। লোকে বলে রাস্তা হলে শহরে যেতে আর পুরো পাঁচ ঘন্টা সময় লাগবে না, দু ঘন্টায় যাওয়া যাবে। সেই জনপথ বিভাগ নীল শার্ট পরে মাঠে নেমেছে।

কালো পোশাকে রেফারি নামল, সঙ্গে দু জন লাইনসম্যান। এদিকে মানুষ আসার বিরাম নেই। মাঠের যেদিকে পাহাড় নেই সেদিকটায় ধান জমি। জমিতে ধান নেই। তার পুবে সমবায়, কৃষি, হাসপাতাল, ব্যাংক এবং অন্যান্য অফিস। হাসপাতালের রোগীরাও কেউ কেউ এসেছে, ডাক্তার জমিরউদ্দিন কর্তাদের চেয়ারের প্রথম সারিতে, রেভারেণ্ড পিটার বিশ্বাসের শ্বেতশুভ্র দীর্ঘ পোশাকের ওপর সোনালি ক্রুশ ঝুলছে, তিনিও হাতওয়ালা চেয়ারে বসে আছেন, মুখে কাঁচা শ্মশ্রু। তার পশ্চিমে বসেছেন উইলি সাহেব ও সুন্দরী মেম। তাঁদের কন্যা লোরা এসেছে ছুটিতে, দেরাদুনে থাকে। দেরাদুন কলেজে পড়ে সে, তার দীর্ঘ সোনালি চুল রক্তিম বাহুযুগলের পাশে ঝলমল করছে। পাশে শাড়ি পরা নার্সরা, কলেজের কিছু তরুণরা ওদিকটায় ভিড় করছে। চারদিকে গ্রাম থেকে আসা লুঙ্গি-ধুতি পরা মানুষ, গভীর আগ্রহ নিয়ে তারা বসে আছে খেলা শুরু হবে বলে। ঘড়িতে বেজেছে দু টা এগারো মিনিট।

একদিকে বাঘমুখ গ্রাম, অন্যদিকে জনপথ বিভাগ। দু দল মাঠে নেমে মক্স করছে, কেউ কেউ শরীরের পেশী নিয়ে দলাই-মলাই করছে—মাঠ এখন বলতে গেলে খেলোয়াড়দের দখলে। রেফারি হুইসেল বাজিয়ে বাকি লোকদের মাঠ ছেড়ে দিতে বলছেন, স্বেচ্ছাসেবকরা তৎপর হয়ে উঠেছে, মাইকে ঘন ঘন ঘোষণা চলছে। জনপথ বিভাগ বাঘমুখ গ্রামের পুরোনো বটগাছটি এবার কেটে ফেলবে কারণ রাস্তার ওপর পড়েছে গাছটি। তবে রাস্তাটি দূর থেকে হাত চারেক ঘুরিয়ে আনলে গাছটি রক্ষা করা যেত। দীর্ঘ ঝুল-নামা বটগাছ। কয়েক শ' বছরের পুরোনো গাছ বলে অনেকে গাছটি কাটতে দিতে চায় নি। বিশেষ করে গ্রামের বুড়োরা এই নিয়ে রাস্তার ইঞ্জিনিয়ারের কাছে ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু তরুণ ইঞ্জিনিয়ার রাজী হয় নি। এজন্য বাঘমুখ গ্রামের অনেকেই জনপথ বিভাগের ওপর খুব চটে আছে। আজ তারা দল বেঁধে খেলায় এসেছে, ঐ বয়স্ক লোকেরা এক জায়গায় দলবদ্ধ হয়ে বসেছে, তারা মনে মনে চাইছে জনপথ বিভাগ পরাজিত হোক। এমনকি কয়েকজন বলেই ফেলেছে। তরুণদের মধ্যে কেউ কেউ বাঘমুখ দলের জেতার জন্য মানত করে বসেছে। পাগলা মৌলভীর দরগায় চার জোড়া মোমবাতি দেবে একজন, একজন বাঘমুখ গ্রামের বটগাছের নামে শপথ করে বসেছে, কেউবা 'মা-মগিনী'র নামে মানত করেছে। কয়েকজন বাজি ধরেছে বাঘমুখ ও জনপথ বিভাগের জয়পরাজয় নিয়ে---কত যে কাণ্ড দর্শকদের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে!

কিন্তু এই গল্পের মূল চরিত্র উইলি সাহেবের কন্যা লোরা। অথচ করিম টুর্নামেন্টের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, দু দিন আগের সেমি-ফাইনালেও লোরা উপস্থিত ছিল না, এমনকি আমিও এই খেলার সঙ্গে তেমন যুক্ত নই। বাঘমুখ আমার গ্রাম, গ্রামের ছেলেরা এই টিম পরিচালনা করছে। চাঁদা তুলে ভিক্ষে করে তারা টিমের খরচ চালাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ করে লোরা নামের এই তরুণী এসে এই খেলার গতি ভিন্ন খাতে বইয়ে দিচ্ছে যেন! হঠাৎ করে আমিও খেলা দেখতে এসেছি, অথচ আজ আমার শীলাছড়ি যাওয়ার কথা, শীলাছড়িতে গেলে রাতও কাটিয়ে আসতাম, থাকতাম চা বাগানে। ওখানে একটা বিশেষ কাজে আমার যাওয়া দরকার ছিল। ঠিক আছে, কাল যাওয়া যাবে!

উইলি সাহেবের কন্যা ছুটিছাটায় তার বাবার কাছে আসে, এবং এদিকে বেশ পরিচিত হয়ে গেছে। গতকাল এসেই দোভাষী বাজারে গেছে, মিশন হাসপাতালের সিস্টার রোজকে বড়দিনের নিমন্ত্রণ করে এসেছে। পাড়াগাঁয়ের লোকেরা সুন্দরী লোরাকে দেখলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। লোরার দীর্ঘ গড়ন, লম্বা চুল সকলের কাছে অবাক ঠেকে। পাড়াগাঁয়ের পথ দিয় হাঁটার সময় তার চলাফেরা ভিন্ন রকম, কখনও কখনও যার-তার সাথে কথা বলে, হঠাৎ করে কারো বাড়িতে গিয়ে আলাপ করে আসে। আবার জনপথ বিভাগের নতুন রাস্তার প্রতি তার ভারি মমতা। কেন কে জানে!

লোরা এবার সিসটারদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছে, সকলেই কৌতূহল ভরে দেখছে। মিসেস উইলি পাদ্রী মহাশয়ের পাশে বসেছেন, লোরা সিসটারদের সঙ্গে দক্ষিণের পাহাড়ের ঢালুতে কুঞ্জবনের মতো একটি ঝোপে বসেছে---জায়গাটি ভালোই বলতে হবে, মানুষের দৃষ্টির প্রায় আড়ালে।

রেফারি এখনই হুইসেল দেবেন। মাঠ পরিষ্কার হয়ে গেছে, খেলা শুরু হতে আর দেরি নেই।

আমি ও নাসির বসেছি পাহাড়ের ঢালুতে, অদূরে লোরা ও তিনজন সিসটার। আবছা দেখা যাচ্ছে তাদের, কথাও শুনছি, আমার পাশে নাসির। আমরা কথা শুরু করেছিলাম জনপথ বিভাগের গাজী, মোস্তফা, বিজয় ও পিয়ের সম্পর্কে। প্রসঙ্গ বদলে লোরা ও সিসটারদের দিকে গেলাম। লোরার পিতা উইলি সাহেব দীর্ঘ দিন ধরে এখানে আছেন, অনেকদিন ধরে এখানে থাকার ফলে তার সম্পর্কে মানষ নানা কথা ও গালগল্প বানিয়ে নিয়েছে। সেই উইলি সাহেবের মেয়ে লোরা, লোরার সঙ্গে জলি, রোকেয়া ও সুমিত্রা। আমরা তাদের কাছে গেলাম।

জলি আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল লোরার। সুমিত্রার সঙ্গে নতুন পরিচয় হল। নাসির কথা বলছে রোকেয়ার সঙ্গে। কথা চলছে অনেকটা ছেলেমানুষিভাবে, কিন্তু কথা বলতে বলতে কখন যে আমরা দু দলে ভাগ হয়ে গেলাম বুঝতেও পারলাম না। দেখলাম লোরা আমার বিপক্ষে চলে গেছে--মনে মনে খুব দমে গেলাম আমি। জনপথ বিভাগের পক্ষ অবলম্বন করে দেখি আমার দলে কেউ নেই, অবাক হলাম নাসিরও আমার বিপক্ষ দলে। তখন আমি রেগে এবং অনেকটা প্রতিরোধ নেওয়ার মতো ব্যঙ্গ মিশিয়ে বললাম, বাঘমুখ গ্রামের তিনজন খেলোয়াড় খুব দুর্বিনীত ও রুক্ষ প্রকৃতির, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তারা মারামারি করে। এজন্য আমি জনপথ বিভাগের পক্ষে। নাসির আমাকে বুঝতে পেরে চুপ করে গেল, কিন্তু তবুও আমার বিপক্ষেই রইল। আর লোরা, লোরা বাংলা জানে, তার ভাঙা ভাঙা বাংলায় আমাকে আরও ঠুকছে। বাঘমুখ গ্রামের পক্ষ নিয়ে বলল যে তারা খেলায় মারামারি করবে একথা আগে থেকে বলা যায় না, এটা প্রমাণিত হওয়া দরকার। আসলে লোরার ওপর আমার অকারণ অভিমান হচ্ছে, কারণ আমি, চাইছি লোরা আমার পক্ষ নিক, নিচ্ছে না বলেই আমার রাগ। কিন্তু রাগ তো আর এমনভাবে প্রকাশ করা চলে না, তাছাড়া প্রথম পরিচয়, তবুও আমার মন বোধকরি অনাবৃত থাকে নি। ওদিকে খেলা শুরু হতে চলেছে, রেফারি মাঝ লাইনে দাঁড়িয়ে একবার চার-দিকে তাকিয়ে দেখলেন। বল পেয়েছে জনপথ বিভাগ, দু দল মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে আছে হুইসেল বাজবার অপেক্ষায়। মাঠজুড়ে থমথম করছে নৈঃশব্দ।

ঠিক তখনই কমিটির সদস্য জুমন আমাকে ডাকতে এল--মাইকে আমাকে খেলার ধারা বর্ণনা করতে হবে। জুমনের ডাক পেয়ে আমি খুব উৎসাহিত হলাম, কারণ এখানে লোরা এবং সকলেই আমার বিরুদ্ধে। জনপথ-এর সঙ্গে বাঘমুখ গ্রামের যুদ্ধ শুরু হবে এখুনি। লোরার মতে বাঘমুখ দল ভালো, গ্রামের মানুষ সহজ সরল, খেলায় মারামারি করতে পারে না--আমার কথার মধ্যে নাকি বরং বাড়াবাড়ি আছে।

যাওয়ার জন্য দাঁড়ালাম। কিন্তু কেন জানি না যাওয়ার আগে লোরার দিকে অনুমতির চোখে তাকালাম। আমি মুহূর্তের মধ্যে এমন

অসহায় হয়ে গেলাম যে তারা সকলেই হয়তো আমাকে করুণা করে থাকবে--মানুষের জীবনে এমন কোনো কোনো মুহূর্তে আসে তা হলে। তবুও লোরাকে দেবী মনে হল। আমাকে অসহায় দেখেও ওদের ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। কিন্তু দু কদম এগিয়ে যেতেই শুনলাম---ধারা বর্ণনায় আমি যেন জনপথ বিভাগের পক্ষ নিয়েই বেশি বলি। কথাটির মধ্যে পক্ষপাতের ইঙ্গিত আছে বলে আমি পেছনে ফিরে তাকালাম। ততক্ষণে খেলা শুরু হয়ে গেছে, আমার সামনে পেছনে দর্শক, দর্শকদের সামনে আমার দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয় কাথাটি ভুলে গেলাম।

ঠিক তখনই পেছন থেকে একজন ডাক দিল ঃ সরে যান, নইলে ঢিল পড়বে। মনে মনে লোরাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলতে লাগলাম, মাইকে তখন শিহাব খেলার ধারা বর্ণনা করছে। বল গেছে বাঘমুখের গোলের দিকে, বাঘমুখের সজল এগিয়ে গেছেন সন্তুর দিকে, সন্তু বল নিয়ে ছুটছেন গোলের দিকে, ওখানে কেউ নেই, সেন্টার হাফ অতিক্রম করে সন্তু একা বল নিয়ে ছুটছেন, গোলরক্ষক সুহাস মাথা নিচু করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, কিন্তু বল কেড়ে নিলেন ফয়েজ, ফয়েজ দিলেন মারীকে···আমার মনের মধ্যে লোরা, আমার বাঘমুখ গ্রামের দিকে গোল হবে বলে বুকের মধ্যে সূক্ষ্ম একটি বেদনা··· বল চলে গেল সেন্টারে।

শিহাব বাঘমুখের সুনীলের নমনীয় পাস সম্পর্কে সুন্দর মন্তব্য জুড়ে লোরাদের খুশি করে দিচ্ছে। আর আমি যদি হাকিজের দুর্বিনীত খেলা সম্পর্কে কোনো রকম মন্তব্য করি তো লোরাদের কোথায় লাগবে বুঝতে পারছি। তবুও কে ফাউল করল বা সুন্দর করে বল নিয়ে ছুটল, চৌকশ মার দিল, বা দর্শনীয় পাশ দিল তা আমাকে বলতে হবে—ওভাবে বলা অন্যায় নয়, অতিরিক্ত বলাও হবে না। কিন্তু জলিরা এরপর আমাকে ঘিরে ধরবে, কৈফিয়ৎও তলব করতে পারে। আমি, আমি কোনদিকে যাব, আমি কি করি এখন? অবশ্যই আমাকে বাঘমুখ গ্রামের মারীর খেলার প্রশংসা করতে হবে, তার দীর্ঘ ফুটবল জীবনের যে কিংবদন্তী ছড়িয়ে পড়েছে তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তার খেলা তো ছবির মতো সুন্দর ও উপভোগ্য।

এগিয়ে গেলাম মাইকের দিকে। শিহাব আমাকে দেখতে পেয়েছে, একটা চেয়ার এল, অদূরে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বসে আছেন। শিল্ড, কাপ এবং উইলি সাহেবের পত্নীকে দেখা যাচ্ছে। প্রবীণ খেলোয়াড় কবির রহমান আজ বিজয়ীদের হাতে শিল্ড তুলে দেবেন, তিনি মন দিয়ে খেলা দেখছেন, বলের গতির সঙ্গে তিনিও সংবেদনশীল হয়ে পড়েছেন—যেন তিনিই বল খেলছেন।

বল মাঠের বাইরে গেল, সেই ফাঁকে শিহাব আমার হাতে মাইক তুলে দিল।

...মারী বল থ্রো করছেন, জনপথ বিভাগের রাইট ব্যাকের দিকে বল, সেখানে পিন্টু, সুন্দর বল, রাইট আউট একা, তিনি বল পেলেন, লব করলেন, শট মারার জন্য চেষ্টা করছেন, কিন্তু দেরি হয়ে গেল, বল ছিনিয়ে নিলেন গাজী, গাজীর থেকে সোজা সেন্টারে।

খেলায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। বল বারবার বাঘমুখের দিকে যাচ্ছে, জনপথ বিভাগের সমর্থক কম বলে দর্শকদের মধ্যে প্রায় নীরবতা চলছে। এবার গাজীর পায়ে বল।

...গাজীর পায়ে বল, দর্শনীয়ভাবে বল নিয়ে যাচ্ছেন তিনি, গাজী আজকের মাঠের সম্রাট, ফয়েজ তার থেকে বল কেড়ে নিতে পারলেন না, সজল চলে এসেছেন সামনে, গাজীর মুখোমুখী সজল, গাজী থেমেছেন, বাঁ পায়ে বল মারবেন বলে বোঝাতে চাচ্ছেন, পাশে সজল পড়ে রইলেন, সজল কিন্তু মরিয়া, ছুটছেন...ফাউল, স্পষ্ট ফাউল, করিম ফাউল করেছেন, জনপথ বিভাগের পক্ষে ফাউল।

কিন্তু আমার মন পড়ে আছে লোরার কাছে। বল এখন মারীর পায়ে, চমৎকার বল নিচ্ছেন তিনি, ছুটলেন...লোরার জন্য মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো ইংরেজিও বলছি, সে বুঝতে পারুক, লোরা বুঝুক আমি কত নিরপেক্ষ, বাঘমুখের খেলোয়াড়রা জয়ী হওয়ার জন্য কেমন বেপরোয়া খেলছে বুঝুক। ওদিকে দর্শকরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, বল গেছে বাঘমুখের দিকে। হৈ হৈ চিৎকার হচ্ছে কেন? দর্শকরা কি ক্ষণিকের জন্য জনপথ বিভাগের দিকে চলে গেল?

মাঝে মাঝে আমার ইংরেজি বলা, দু-একটি মন্তব্য করা সবকিছু লোরার উদ্দেশ্যেই বলা। আমার শ্রোতা যেন একজন, খেলার মাঠে শুধু আমিই ধারা বর্ণনাকারী যেন, এবং লোরাই যেন একক দ্রষ্টা ও শ্রোতা। চুয়াল্লিশ পায়ের খেলা চলছে, তাছাড়া রেফারি ও লাইন্সম্যান আছে। করিমের ফাউল হয়েছে, বাঘমুখের পেনাল্টি বক্সে ফাউল। আর লোরা, লোরা নিশ্চয় তার সোনালি চুল উড়িয়ে আমার কথা শুনছে, পাড়াগাঁর দর্শকরা স্নায়ুর পায়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে খেলা দেখছে। বিড়ি-পান-বাদামওয়ালারা নিচু হয়ে জিনিস দিচ্ছে, চাষাভুষোরা চোখ-

মুখ বাড়িয়ে তাকিয়ে আছে। উৎসব চলছে, জোয়ার এসেছে কর্ণফুলিতে, লোরা যেন সোনালি চুল নিয়ে মাঠের মাঝদিয়ে উড়ে আসছে, সমস্ত খেলোয়াড় বল ফেলে দণ্ডবৎ, সকলেই দেখছে লোরাকে, উইলি সাহেবের কন্যা স্কার্ট পরে সোনালি চুল উড়িয়ে মায়াময় পদক্ষেপে স্বপ্নের মতো আমার দিকে এগিয়ে আসছে, আমার বলা বন্ধ, আমার হাত মাউথ পীসে, আবার অন্য হাত লোরার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, মাইকের হর্ণ থেকে এক রকম শূন্যতার শব্দ, একরকম শূন্য শব্দ থেকে মৃদু সঙ্গীতের শব্দ উত্থিত হচ্ছে, অবশেষে এ করকম অশ্রুতপূর্ব সঙ্গীতে মাঠ-পাহাড়-আকাশ অর্থাৎ সমস্ত চরাচরে প্লাবন বয়ে যেতে লাগল, পাড়াগাঁর চিরাচরিত মানুষের মুখ উৎসাহে ভরে গেছে, বাতাসে অন্য এক রকম বাতাস ভেসে যাচ্ছে, লোরা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। লোরা মায়াময় ভঙ্গিতে সামনে এসে দাঁড়াল ঃ লোরা, লো র আ আ ..। হায় আমার দিবাস্বপ্ন !

পেনাল্টি বল সুহাসকে ধুলোয় লুটিয়ে জালে আটকে গেল। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময়ে সকলে চিৎকার করে উঠল, গোল। তারপর চারদিকে উল্লাস। জনপথ বিভাগের সমর্থকরা ছাতা ওড়াচ্ছে ! মাথার টুপি, রুমাল, স্যাণ্ডেল, পাতা, ডালপালা, ঝোপঝাড়, গায়ের কাপড় উড়ছে উড়ছে উড়ছে। হাততালি, শিস, হৈ হৈ; গোল-গোল-গোল শব্দ চতুর্দিকে। ওদিকে কারা যেন ভেঁপু ও ক্যানেস্তারা বাজিয়ে নাচছে। পাহাড়ের ওপরের একটি টিলায় তারা নাচ শুরু করেছে, গান শোনা যাচ্ছে 'ভা-ল করিয়া বাজানরে দোতারা' এবং তালে-তালে করতালি। যদিও পেনাল্টি গোলে কৃতিত্ব খুব একটা নেই মনে হয়, তবুও জনপথ বিভাগ যে চমৎকার সাফসুফ খেলছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাদের খেলোয়াড়রা আক্রোশে প্রতিপক্ষকে আঘাত করে না—লোরা নিশ্চয়ই আমার সূক্ষ্ম ইঙ্গিতগুলো বুঝতে পারছে, এবং এ-জন্যই টুক করে একটা শব্দ ইংরেজিতে বলা। দেখি নাসির চলে এল। কিন্তু কেন? নাসিরকে আমার চেয়ারে বসিয়ে দিলাম। সিসটাররা নাকি আমার ওপর ক্ষেপে গেছে, লোরা আমাকে মাইক ছেড়ে দিতে বলেছে, তার মতে এভাবে ধারা বর্ণনার কোনো অর্থ হয় না। তার মানে? কিন্তু কি করি, আমি কি করেছি? নাসিরকে মাইক দিলাম, শ্রোতা-দর্শকদের কাছে মুক্তিযোদ্ধা নাসিরকে পরিচয় করিয়ে দিলাম, এককালে নাসির ভালো খেলত। এদিকে দর্শকদের মধ্যে চরম উত্তেজনা, বাঘমুখের সমর্থকরা চিৎকার করছে, উৎসাহ দিচ্ছে, চিৎকারে মাঠ পাহাড় আকাশ কেঁপে উঠছে, থরথর করে কাঁপছে মাঠের হৃদয়, হু হু আওয়াজ

আসছে দর্শকদের কাছ থেকে। আমি ভাবছি লোরার কাছে যাব আমার বুক কাঁপছে. আমার সমস্ত স্নায়ু উত্তেজনায় নতজানু।

লোরার পায়ের কাছে চালুতে বসলাম, তার অনাবৃত হাঁটুতে গায়ের জাম্পার, সামনে সিস্টাররা। ওরা আমাকে সুযোগ দিচ্ছে? লোরা মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে, আমি লোরাকে নীরবে ডাকলাম, আমার অজস্র দোষত্রুটির মার্জনা মনে মনে চেয়ে নিলাম, আমার বক্ষ-ভরা দুরু-দুরু শব্দকে সংহত করে বললাম, লোরা, বিদেশিনী, আমি এককালে ভালো ফুটবল খেলতাম, আমি কি স্পোর্টসম্যান স্পিরিট হারিয়েছি? আজ তুমি আমাকে একজন পক্ষপাতদুষ্ট সাধারণ মানুষ হিসাবে বিচার করলে, লো...

লোরা আমার দিকে মমতাময়ী চোখে তাকাল, তার নীল চোখের দৃষ্টিতে আমার চোখের আস্তরণ ভেদ করে বুকের দুরু-দুরু শব্দ বাড়িয়ে তুলল, আমার বাঁ হাত তুলে নিল, আমাকে ফিসফিস করে বলল, এইটুকুই যথেষ্ট, আর বেশি নয়, তোমার কথা মনে থাকবে...আমি বিদেশিনী, আমি একজন বিদেশিনী মাত্র। লোরা আমার হাতের মুদ্রা ভেঙে উদাস চোখে চুয়াল্লিশ পায়ের খেলা দেখছে, মাঠ থেকে দৃষ্টি তুলে সবুজ পাহাড়ের উপরকার নীল আকাশের দিকে চোখ মেলে আছে। আমি লোরার ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমার ফাঁকের তিল আবিষ্কার করে তাকিয়ে রইলাম। আরও অনেকক্ষণ পর জলির ঝলমল হাসিতে আমার চেতনা ফিরে এল, লোরা আমার দিকে তাকাল। রেফারি খেলার মাঝ-বিরতির হুইশেল দিল, দর্শকদের কেউ কেউ মাঠে নামছে, ওদিকে উল্লাস চলছে, ভেঁপু বাজছে, গান গাইছে 'সূর্য যে ডুইব্যা যায়...'।

দর্শকরা ইতিমধ্যে নিজস্ব আলোচনা তুলেছে। গ্রামের এই সব মানুষ, ধুতি-লুঙ্গি পরা সহজ-সরল মানুষ কত রকম মন্তব্য করছে, তাদের নিজস্ব সমস্যার কথা বলছে। মাঠের কথা, খেতের কথা, বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা, পাম্প মেশিন, গ্রাম্য কোঁদল কতকিছু। শুধু ফুটবল নয়, শুধু খেলা দেখা নয়—সমস্যার পাহাড় ডিঙিয়ে সুদিনের দিকে পেঁছা চাই। এই সানকির মতো মাঠে, পাহাড়ের ধার, কর্ণফুলির জোয়ার ঠেলে দাঁড়ের চিৎকার সব কিছু সমান্তরাল গতিতে চলছে। আর লোরা, উইলি সাহেবের কন্যা। লোরা তার পরিপূর্ণ যৌবন নিয়ে, নীল চোখ ও সোনালি চুল উড়িয়ে, বুকের গর্বিত মরমী ভঙ্গীতে আমাকে ভালোলাগা-ভালোবাসার বেদনায় নিষিক্ত করে ডুবিয়ে দিয়েছে। লোরা কি সত্যিই আমার জন্য তিল পরিমাণ ভাবছে, আমার জন্য তার আদৌ কোনো ভাবাভাবি আছে কি?

লোরা-তো বিদেশিনী, এবং উইলি সাহেবই বা দীর্ঘ দিন ধরে কেন এই গণ্ডগ্রামে পড়ে আছেন কে জানে? লোরা দেরাদুন কলেজ থেকে শীতকালীন ছুটি কাটাতে এখানে এসেছে, লোরার পিতা-মাতা কেন যে আমাকে খুব প্রশংসা করল কে জানে? লোরা অন্য কাউকে ভালোবাসে কিবা তাই-বা কে জানে? তার চোখের ভাষা এমনিতেই গভীর—হৃদয়ে অর্গল থাকলেই চোখের এমন ভাষা থাকা স্বাভাবিক বুঝি। লোরা একবার মটকা মেরে তাকিয়েছিল, অথবা জলির সঙ্গে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে থাকবে—ব্যাপারগুলো আমার বোধগম্য নয় কেন? লোরা খেলা দেখছে, লোরা পাহাড়ের গায়ে চিত্রার্পিত, লোরা মানুষের ভিড়ে অন্য এক মানুষী যেন। অথবা এই পাতাঝোপের পাশে বসে, সুমিতা জলি রোকেয়ার সঙ্গে বসে লোরা হাসি-আনন্দে অনন্যা কেন? আমার কি মাইকের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত? নাসির ও শিহাবই ভালো কাজ করছে বোধ হয়। এখন আমার করণীয় কী!

খেলা শেষের হুইশেলও বাজল। চারদিকে হু-হু হৈ-হৈ মানুষ নামছে, ছেচল্লিশ পায়ের মাঠ শত-শত পদশব্দে ছোটো হয়ে যায়, জয়ী দলের চারদিকে ভক্তদের ভিড়, অনেকে তাদের কোলে তুলে নাচছে। বিজিত দলের অনেকে চুপিসারে সরে যাচ্ছে, সব চেয়ে লজ্জা বোধ'য় পাঁড় সমর্থকদের। পরাজিত দল, পরাজিত সমর্থক—দু'য়েরই বেদনা। এই বেদনা পরাজিত ছাড়া কেউ অনুভব করতে পারবে না।

পাহাড়ের শরীর থেকে মানুষ নামছে। আমরা বসে আছি, আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম মানুষের ভিড় কমুক। জলিরা কাছ থেকেও দূরে, রোকেয়া বেশ আড়চোখে তাকিয়ে দেখছে, মিষ্টি করে কথা ঠেলে দিচ্ছে, সিসটার সুমিতা বেশ প্রফুল্ল। কেন? ওরা কি আমাদের একা হতে দিচ্ছে? মাঠে পুরস্কার বিতরণী হচ্ছে। সূর্য ডুবতে আর দেরি নেই। পাহাড়ের ছায়ায় মাঠ একাকার, রোদ বহুদূরে হটে গেছে, বহুদূরে মাইকের শব্দ, ক্যাপটেন করিমের সাহসিক যুদ্ধযাত্রা, শত্রুর সঙ্গে আপোসহীনতা—ক্যাপটেন করিম বিমান বাহিনীর একজন পাইলট ছিল, রামগড় ও সালদা নদী সেক্টরে আমি তার বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ দেখেছি। আজ শহীদ ক্যাপটেন করিমের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী, তার সঙ্গে দীর্ঘদিন থেকে আমার পরিচয়—বুক হু-হু করে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ঘরশত্রুর হাতেই তার মৃত্যু হয়েছে, বিশ্বাসঘাতক একজন রাজাকার আত্মীয়ই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী।

লোরা শুনছ, স্বাধীনতা-যুদ্ধের একজন অসমসাহসী যোদ্ধা এই করিম। আজ তার নামে ফুটবল টুর্ণামেন্ট, তার জন্য শুধু এইটুকুমাত্র

করতে পেরেছি। একজন স্বাধীনতা সৈনিকের জন্য এইটুকুমাত্র করা গেছে। লোরা শুনছ?

লোরা উৎসাহ নিয়ে বলল, তুমি কি তাকে চিনতে, তুমি যুদ্ধ করেছিলে?

সে-কথা থাক।

লোরা আবার আগ্রহ দেখিয়ে প্রশ্ন করলে, কেন? আমার যে শুনতে ইচ্ছে করছে! বলো না! তুমি গেরিলা ট্রেনিং নিয়েছিলে? রক্ষী বাহিনীর নাজমুল তোমার বন্ধু?

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, থাক, ওসব থাক এখন।

কেন কেন? তুমি লুকোতে চাইছ কেন? তোমার হাতের তালু এত শক্ত কেন? তোমার কনু'য়ে জট পড়েছে কেন গো?

ইতিমধ্যে রোকেয়ারা চলে গেছে। জলির সঙ্গে নাসিরও কথা বলতে বলতে চলে গেল। হিপ হিপ হুররে ধ্বনি হচ্ছে। আর আমরা দক্ষিণের পাহাড়ের শরীর বেয়ে চলছি। এদিকে এখন কোনো লোক যাবে না। পায়ে চলা চড়াই পথ এখন নির্জন। উঠতে কষ্ট হচ্ছে, লোরার হিল তোলা জুতো ভারি কষ্ট দিচ্ছে। লোরাকে হাত ধরে তুলে নিচ্ছি। ছায়া নেমে আসছে দ্রুত। ধুকপুক বুকে পাহাড়ে উঠছি, কী-যে সুখ! ঝাঁপিয়ে অন্ধকার নামছে।

আমাদের মধ্যে খুব কম কথা হচ্ছে। এত কম যে নিজেকে ভারবহ মনে হচ্ছে। আর সত্যি বলতে কি কিছুতেই আমরা নিজেদের হাল্কা করতে পারছি নে। অমন মুখর লোরাও চুপ হয়ে গেছে। আমার স্নায়ুরা বিদ্রোহ করবে বলে শাসাচ্ছে।

লোরা, তোমার কষ্ট হচ্ছে?

তোমার?

আমার! হ্যাঁ, শীত করছে আমার।

লোরাও কাঁপতে কাঁপতে বললে, আর কতদূর যেতে হবে?

ঐ-তো। পাহাড়ের চুড়োয় উঠলে বড় রাস্তা দেখা যাবে।

কিন্তু পাহাড়ের চুড়োয় ওঠার আগে লোরা বলল তার জুতো খোলা দরকার, জুতোয় কষ্ট হচ্ছে। আর সে হাঁফিয়ে উঠেছে। আবছা আলোয় তার নীল চোখ তিরতির কাঁপছে। আমরা নিজ নিজ জুতো খুলছি। কিন্তু লোরা ঝটপট নিজের জুতো খুলে আমার জুতোয় হাত দিল।

তুমি, তুমি কেন খুলতে যাচ্ছ?

লোরা কাঁপতে কাঁপতে বলল, আমাকে খুলতে দাও।

জুতো খুলে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। উইলি সাহেবের কন্যা আমার পাশে বসে আবছা অন্ধকারে আমাকে নীল চোখে তাকিয়ে দেখছে। ছায়ারা ঢেউয়ে ঢেউয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, মাঠে পুরস্কার বিতরণী চলছে, মাঝে মাঝে বিজয়ীদের উল্লাস শোনা যাচ্ছে—আমরা দু'জনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছি। তারপর লোরা আমার হাতে হাত রাখল, চোখ নামিয়ে নিল, আমি তার মসৃণ বাহুর ধারে ডুবে যাচ্ছি। শান্ত নির্ভার পাহাড়ের পাদদেশ, ঝোপের ভেতর থেকে বুনো গন্ধ ঝাঁপিয়ে নামছে, লোরা আমার হাত টেনে নিল। আর কখন যে আমি লোরাকে আপন করে নিলাম, কিংবা 'ভালোবাসি ভালোবাসি' বলেছি কিনা আমার মনে নেই, চৈতন্য ফিরে পেলে শুনতে পেলাম, অর্থাৎ লোরা কথা শুরু করল।

এ্যাই, যুদ্ধের সময় তুমি ইন্টেলিজেন্সে ছিলে?

হ্যাঁ-গো-হ্যাঁ।

আমাকে একটা কথা বলবে—একটু থেমে লোরা বলল।

আমি মুখ না তুলে বললাম, কি কথা?

লোরা আবার আমার চুলে হাত লেপে ডাকল। আমি তখন তার শরীরের অন্য রকম গন্ধ পাচ্ছি। এত সুন্দর কিছু আমি জীবনে দেখি নি, অনুভব করি নি। এমন সুন্দর করে কেউই আমাকে ভালোবাসে নি। ক্ষণে ক্ষণে আমি কেঁপে উঠছি। ভালোবাসা, অজানা আকাঙ্ক্ষা পোষে। শীত—কে যেন আমাকে কাঁপিয়ে দুমড়ে দিচ্ছে...কে জানে! চারদিকে কুয়াশা নামতে শুরু করেছে, কর্ণফুলিতে দাঁড়ের শব্দ হচ্ছে, দূরে কে যে কাকে ডাকছে! কুয়াশা ঝরছে।

লোরা বললে, আমাকে একটা কথা বলবে?

আমি সন্দেহে কেঁপে কেঁপে বললাম, মানে, মানে...

আস্তে আস্তে আমার চোখের ওপর থেকে এক আবছা পর্দা সরে যাচ্ছে।

লোরা আমার কাছ থেকে কী গোপনীয় কথা শুনতে চায়? যুদ্ধের সময় এবং এখনো আমি অনেক গোপনীয় বিষয় অফিস থেকে জানতে পারি, গোপনীয়তা রক্ষা করা আমার দায়িত্ব, কার একজন অত্যন্ত দায়িত্বহীন সরকারী চাকুরে।

লোরা নিজেকে আরো এগিয়ে দিয়ে বলল, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা কেমন লাগছে?

লোরার বাহুবন্ধনে ডুবে থাকলেও বুঝতে কষ্ট হলো না সে আমাকে বাজিয়ে দেখছে। বোধ হয় আমার মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বুঝতে পেরেছে।

বলো না স্বাধীনতা কেমন এই—বলে লোরা কৃত্রিম অভিমান ভরে আমাকে একটু ঠেলে দিল।

আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাকে অনেক গোপন বিষয় সম্পর্কে নানা নির্দেশ দেন, আমার ওপর তিনি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন। সে-সমস্ত বিষয় লোরা আজ আমার কাছ থেকে জানতে চায় বুঝি? এই জন্যই উইলি সাহেব আমাকে প্রশংসা করেছেন? এই জন্যই কি লোরা আমার কাছ থেকে গোপন কথা জানতে চেয়ে এভাবে দীর্ঘ চুম্বনে সিক্ত করে দিচ্ছে?

আমি চুপ করে আছি বলে সে আবার ডাকল, তুমি আমাকে বিদেশী বলে বিশ্বাস করতে পারছ না? আমার বন্ধুত্ব, আমার ভালোবাসায় তোমার সন্দেহ হচ্ছে---যে মেয়েকে তুমি আদর করছ তাকেই তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না, তার সম্পর্কে মন স্থির করতে পারছ না ---তুমি তো ভালোবাসারও যোগ্য নও।

আর আমি লোরাকে আরও আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে যখন বলতে যাচ্ছি 'লোরা তুমি আমার, আমার তুমি' ঠিক তখনই বিজয়ী দলের হাতে পুরস্কার বিতরণ শেষ হয়েছে, বিজয়ী ফুটবল দলের ব্যাণ্ডের সানাই-বিউগল-বাঁশিতে অনুষ্ঠান শেষে জাতীয় সঙ্গীত বাজছে, বিজয়ীদের ঢোলের ঐকতানে জাতীয় সঙ্গীতের রেশ মাঠ-পাহাড়-নদী-বাঘমুখ ছাপিয়ে আকাশের তারাদের ছুঁয়ে দিচ্ছে। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' সুরে সুরে ধ্বনিত হয়ে মাঠ-পাহাড় উড়িয়ে দিচ্ছে তারাদের মধ্যে। ক্যাপটেন করিমের দীপ্ত মুখ ভেসে উঠছে আমার চোখে। লোরা আমাকে ঠেলে দিয়ে বলল, তুমি ভীতু, তুমি কাপুরুষ।

[গল্পগ্রন্থ ঃ স্বপ্নমিছিল]

আমার লাল রুমালের পাশে শচীর দেওয়া গোলাপী রুমালটি রাখলাম। পেছনের বাঁ পকেটে রাখাই আমার অভ্যেস। নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করে সমস্ত ঘটনাটা এক বার ভেবে নিলাম। বেজির খাঁচার ওপর একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলাম। সবাই বলল বেজিটা ছেড়ে দিতে। আমি বললাম, না, পুষব। আমার সঙ্গী হবে সে। শচী তো একরকম জোর শুরু করল ছেড়ে দেওয়ার জন্য। আর সে-জন্যই জেদ করে পোষার সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রথম দিনেই কিন্তু বেজিটা শচীর নেওটা হয়ে গেল।

ব্যাপারটা খুলেই বলি। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু বাবুর শ্বশুরবাড়িতে শচীর সঙ্গে পরিচয়। নিয়ম অনুযায়ী বিয়ে হয় বাবুর বাড়িতে। এটাই আমাদের রীতি। বিয়ের পরদিন বর শ্বশুরবাড়িতে যায় কনেকে নিয়ে। সঙ্গে থাকে বন্ধু-বান্ধব, ছোট ভাই-স্থানীয় আত্মীয় ও বোনজামাইরা। অন্ধকার রাতে হ্যাজাক বাতি জ্বালিয়ে পাঁচ মাইল হেঁটে আমরা বাবুর শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছুই! সেখানে শচীর সঙ্গে পরিচয়। বসন্তের সেই রাতে শচী আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ওদের গ্রামের নদীর কূলে। সঙ্গে আরও এক জন ছিল। সে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ। আমি জানি রুমালটা আমার জন্য সে সেলাই করে নি। এও জানি, ওটা আমাকে দেওয়ার জন্যই ঘাসের ওপর পেতে দিয়েছিল। সে বসে ছিল মুথা ঘাসের ওপর। ওঠার সময় বলল, ওটা রাখুন।

পরদিন গানের আসর বসল। শচী গান গেয়েছিল। দুপুরে সাঁতার কেটে নদী পেরিয়ে কাশবনের গভীরে চলে যাই একা একা। মাথার নিচে দু হাত রেখে আকাশ পাহারা দিতে দিতে অনেকক্ষণ শুয়ে ছিলাম। সবাই ফিরে গেল আমাকে ফেলে। আমি উঠে পুরো কাশবন জরিপ করে একটা বেজির ছানা ধরি। ততক্ষণে নৌকোতে করে আমাকে খুঁজতে এল ওরা। চিৎকার করে ডেকে খুঁজে বের করল। আমার হাতে তখন বেজির ছানা। ওরা ভেবেছিল আমার কোনো বিপদ হয়েছে, কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়েছি।

নেউলছানাটি একটা খাঁচায় পুরলাম। ওর নাম দিলাম তুলতুল। সেদিন থেকে তুলতুল আমার বন্ধু হয়ে গেল। এরপর আরও দু বার শচীদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছিল তুলতুল। সেও শচীর প্রিয় হয়ে উঠল।

শচী আমার এক ক্লাস নিচে পড়ে। ওদের গ্রামের কলেজে। শরতের ছুটিতে শহর থেকে আমি গ্রামে এলাম আর শচী এল বাবুদের বাড়িতে। বাবুর বাবা মারা যাওয়ায় পড়া ছেড়ে তাকে বিয়ে করতে হল। জমিজমা চাষাবাদ দেখা ছাড়া ওর কোনো উপায় রইল না। আমারও শুরু হল শচী থেকে পালিয়ে বেড়ানো। শচীর আসার খবর পেয়ে আমি তৈরী হয়ে গেলাম হোস্টেলে চলে যেতে। বাবু আমাকে ডাকতে পাঠাল। আমি ততক্ষণে কাপড়চোপড় বোঁচকা বেঁধে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছি। পথেই বাবুদের বাড়ি। ওর বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। উঠতি পা আবেগে থেমে যায়। শচীকে একবার না দেখে যাই কি করে? আমার নিজের অজান্তেই রাস্তা থেকে বাবুদের বাড়ির ঘাটায় পা বাড়ালাম। ওদের বাড়ির দীর্ঘ ঘাটা পেরিয়ে পুকুর, পুকুরের পাশে বড় উঠোন, মাধবী ও অপরাজিতার ঝাড় এবং সেই ঝোপের নিচে শচী দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখতে পেয়েই তুলতুল এক লাফে ওর কাছে চলে যায় আর কি! আমি দড়ি টান টান করে ওকে বাধ্য করলাম সংযত হতে। কিন্তু ও যে নিরীহ বেজি মাত্র, ওকে থামাই কতক্ষণ। শচী মাধবীলতার ঝোপের নিচে দাঁড়িয়ে পুকুরের দিকে তাকিয়ে রইল। আমাকে দেখে নাকি না-দেখে আমি বলতে পারব না। ওকে ডাকব কি ডাকব না, বুঝে উঠতে পারলাম না। এক বার ভাবলাম না-ডেকে চলে যাই। তাহলে তো এত দূর আসার অর্থ হয় না। আমার ভালো লাগা বা অবহেলারও বোধয় মানে থাকে না।

শচীর পাশে গিয়ে বললাম, আমি যাচ্ছি।

শচী চমকে এবং ঝলমলে চোখে চুপ করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তুলতুল তখন চিঁ চিঁ করে ওর পা শুঁকছে। বলল, বাহ কী সুন্দর বড় হয়ে গেছে? তারপর ওকে আদর করতে করতে আমার দিকে তাকিয়ে-না-তাকিয়ে বলল, কোথায় চললেন?

শচী বোধ হয় ভাবল আমার কলেজ খোলা। তাই তাড়াতাড়ি বলল, এক দিন পরে গেলে হয় না?

তুলতুল তখন দু পায়ে দাঁড়িয়ে দূরে কি যেন দেখল। আমিও

এক মুহূর্ত ভাবলাম। তারপর বললাম, হ্যা, তুলতুল এখন আমার সারাক্ষণের সঙ্গী, আমার সঙ্গে এক বিছানায় শোয়। আমি কলেজে গেলে একা থাকে আমার কামরায়। আমার বন্ধু।

আমি থাকব না বুঝে শচী হঠাৎ করে বলল, আমাকে কিছু টাকা দিতে পারেন?

আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, শচী আমার কাছে এভাবে টাকা চাইছে কেন? কোনো কারণ খুঁজে না পেয়ে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে টাকা বের করলাম। সঙ্গে শচীর দেওয়া রুমালও বেরিয়ে এল। রুমালটা যে কী করে টাকার পকেটে এল বুঝতে পারলাম না, কারণ ওটা থাকার কথা পেছনের বাঁ পকেটে। যাক গে শচী দেখেও না-দেখার ভান করে রইল। আমি খুচরো টাকাগুলো রেখে একটা নোট ওর হাতে তুলে দিলাম।

শচী শুধু বলল, এভাবে টাকা চাইলাম বলে আমাকে খুব ছোট ভাবছেন না তো?

আমি বলতে পারতাম, না নিলে নিজেকে খুব ছোট মনে করব।

সে আবার বলল, অত দরকার নেই। খুচরোগুলো দিলেই চলবে। হঠাৎ দরকার হয়ে পড়ল।

তবুও কিছুতেই মেলাতে পারলাম না ওর টাকা চাওয়ার ব্যাপারটা। ওর সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তেই পেঁছুতে পারলাম না।

আরও কিছুক্ষণ থাকার পর শচী প্রায় আদেশের মতো বলল, আপনি আর দেরি করবেন না। সন্ধে হয়ে এল, আপনার যাওয়া উচিত। তারপর তুলতুলকে আদর করে গোমড়া মুখে আমাকে বিদায় দিল।

বাসে প্রায় তিরিশ মাইল যেতে হবে। সেটাও খুব দূরত্ব কিছু নয়, চেনা-জানা পথ। রাতবিরেতে কত আসা-যাওয়া করি। কিন্তু তুলতুল আমাকে জানিয়ে দিল সে কোথাও যেতে রাজি নয়। একটা ধমক দিলাম। দড়ি ধরে আচ্ছা করে কিছুক্ষণ শূন্যে ঝুলিয়ে রাখলাম।

ভেতরে ভেতরে আমি অনেকখানি দুর্বল হয়ে গেলাম। বাসে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু দিনের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। আকাশে চাঁদ উঠেছে। নদীর ওপর বালুচরে লুটোপুটি খেলছে। শচীর প্রতিটি কথার অর্থ আমার কাছে গভীর অর্থবহ হয়ে উঠতে লাগল। সে বোধ হয় বোঝাতে চেয়েছে রুমালটিই আমাদের মধ্যে বিপত্তির কারণ। তার জন্যেই টাকা নিয়ে মিটমাট করতে চাইছে।

নামমাত্র হলেও কিছু মূল্য নিতে চেয়েছে। পাঁচ পয়সা চাইলে আমি বুঝতে পারতাম। এক টাকা চাইলেও বুঝতাম। কিন্তু শচী বোধ'য় বুঝতে দিতে চায় না সেই রুমালের জন্যই আমাদের মধ্যে শত্রুতা দানা বেঁধে উঠছে। আমিও ভালোবাসি কথাটা বলতে পারছি না। সেও বলতে পারছে না হয়তো। আমরাই প্রথম প্রকাশ করা উচিত বৈকি। আমি কিনা নির্বোধের মতো নিজের হাতে নিজে সব তছনছ করে চলেছি। তবুও আমি বলতে পারি নি। সেবার সে দশ দিন ছিল আমাদের গ্রামে, সেদিন বাবুর সঙ্গে দেখা না করাতে সে অপমানিত বোধ করে, এবং রাগ করে আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিল। ওর কথা হল শচীকেও আমি অপমান করেছি। সাধারণ সৌজন্যবোধটুকুও আমার মধ্যে নেই। ভালোবাসা ছাড়াও তো মানুষের ভদ্রতাবোধ থাকে। শচী, বাবু ও বাবুর বউ—সকলকে আমি অপমান করেছি। বাবুর এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল।

সে-রাতে আমিও আর শহরে যাই নি। আমি আবার সিদ্ধান্ত পাল্টালাম। পাঁচ মাইল হেঁটে শচীদের গ্রামে পেঁছুলাম। শচীর ভাই তরুণের দেখা পেয়ে ওদের বাড়িতে গেলাম। শচীর মা-বাবা খুশি হল। অনেক রাত পর্যন্ত তরুণের সঙ্গে নানা গল্প করলাম। তুলতুলের নানা খেলা ও বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ দিলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে ধরে নিয়ে এল মাছ ও ইঁদুর। লুকোচুরি খেলল টেবিলে ও চেয়ারে বসে। বইয়ের ফাঁকে উঁকি মারল চমৎকার ভঙ্গি করে। শচীর পিঠোপিঠি ছোট তরুণ। ওরা ভাইবোনে চমৎকার বন্ধু। আমিও আর লুকোচুরি না করে বললাম শচীর সঙ্গে দেখা হয়েছে।

তরুণ অবাক হয়ে বলল, শচী, বাবুভাই আপনাকে ছেড়ে দিল?

বললাম, তুলতুলকে ছেড়ে দিতে এসেছি।

কেন? আপনার কষ্ট হবে না?

হ্যাঁ, কষ্ট হবে। ওর সঙ্গে দীর্ঘ ছয় মাস ধরে অন্তরঙ্গতা। তবুও ছেড়ে দিতে হবে। একা একা আমার সঙ্গে থেকে ও-বেচারী তার জীবন ও জগৎ থেকে একেবারে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। সে প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতির সন্তানকে প্রকৃতির মাঝে ফিরিয়ে দিতে এসেছি।

তরুণ বলল, যে কোনো খানে ছেড়ে দিলেই তো হয়।

তা হয়। তবুও ভাবছি ওর পাড়ায় ওকে ছেড়ে দেব। নিজের পাড়া, নিজের গ্রাম ও দেশ অনেক বড়।

ভোরে উঠেই তরুণ ও আমি নদী পেরিয়ে কাশবনে গেলাম। শরতের আলো-হাওয়ায় কাশবন দুলছে। মাথার ওপর নীল আকাশ ও নদীর ছলোছল ঢেউয়ের শব্দ। কিন্তু আমার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। ওর গলার রশি খুলে দিলাম। যেতে বললাম। ওর বাড়ি-ঘর, প্রেম-ভালোবাসা ও আত্মীয়-স্বজনের কথা বললাম। আমার সঙ্গে থাকা মানে জীবন বরবাদ। বললাম, তুলতুল, তুই মুক্ত। তোর সঙ্গী-সাথী খুঁজে নে। তোর মধুময় জীবন সামনে পড়ে আছে। যা তুলতুল, আমার ভালোবাসা নিয়ে চলে যা।

আমাকে অবাক করে, হতাশ করে সে আমার পাশে ঘুরঘুর করতে লাগল। দু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস টেনে টেনে কী যেন বুঝতে চেষ্টা করল। চারদিক তাকাল। রশিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। আবার বললাম, তুলতুল রে আজ থেকে তুই স্বাধীন, তোর পাড়া-পড়শীদের মাঝে ফিরে যা।

তুলতুল গেল না। আবার বললাম, আমার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াতে হবে না। যা যা।

সে যায় না, দু পায়ে দাঁড়ায়, এদিক-ওদিক তাকায়, ঘাস শোঁকে, আমার দিকে তাকায়। আবার বললাম, তুলতুল, তুই কি স্বাধীনতা চাস না? যে দিকে দু চোখ যায় চলে যা।

না, ওর কোনো ভাবান্তর নেই। যাওয়ার আগ্রহ নেই। ধমক দিলাম। চমকে লাফিয়ে প্যান্টের পা বেয়ে উঠতে চাইল। নিচে নেমে আমার দিকে তাকাল করুণ চোখে। হ্যাঁ, আমি ওর অনেক কিছু বুঝি। রাগ, আনন্দ ও বিষাদ আঁচ করতে পারি।

তুলতুল স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার সঙ্গে রয়ে গেল। আমারও আর কিছু করার নেই। এমনিতেই তো আমি ওকে ছেড়ে দেব বলে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শচী ওর গ্রামে ফিরলে আমাকে নিয়ে যাতে ভাবে, তার পথ করে দিলাম। শচী বুঝুক, শচী আরও বেশি আমাকে ভালোবাসুক—আমি ওর ভালোবাসা আদায় করে নিতে চাই ওকে মুগ্ধ করে।

তরুণের সঙ্গে ওদের বাড়িতে ফিরলাম। নদী পার হতে সাম্পানে উঠলাম। তুলতুল পিছু পিছু এল। সাম্পানে উঠে তরুণের কোলে উঠল। শরতের মেঘ মাথার ওপর দিয়ে ভেসে চলল অলস হাওয়ায়।

তিন মাইল হাঁটার পর সন্ধে নামল। শচীর ভাবনা এত আচ্ছন্ন করে রাখল অথচ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না—বাড়ি ফিরব নাকি শহরে চলে যাব। এত দিন যাকে ভুলতে চেয়েছি যার সঙ্গে মনে মনে লড়াই করেছি, যার কথা না-ভাবতে চেষ্টা করেছি, এমনকি গতকাল একরকম অবজ্ঞা করেছি, সে-ই আজ আমার সমস্ত ভাবনায়। শচীকে এক বার দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। শুধু দেখা, আর কিছু না। দু চোখ ভরে একবার দেখা, আর কিছুই চাই না। কিছুই চাই না ভাবতেই বুক কেঁপে উঠল। চাঁদের আকাশ ও আকাশের চাঁদ ডেকে ডেকে কী যেন বলল। তুলতুল ক্লান্ত হয়ে কাঁধে উঠে বসল। কাঁধ থেকে মুখ বাড়িয়ে চুমু দিল। আমি আদর ফিরিয়ে দিলাম।

রাস্তায় উঠে বাস ধরলাম। হোস্টেলে পৌঁছে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। উদভ্রান্তের মতো দশটা দিন কেটে গেল। প্রাচীন কালে বর্ষার শেষে শরতে রাজারা দিগ্বিজয়ে বের হত। প্রবাসীরা ঘরে ফিরত। আমিও তুলতুলকে নিয়ে বাড়ির পথে বের হলাম।

বাড়িতে পৌঁছেই মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে বললাম, মা, ঘরে কে এল?

মা ডাক দিল, মিশি, এদিকে আয়।

মিশি ছুটে এল এবং আমাকে দেখেই থমকে দাঁড়াল। হাসতে হাসতে সে বলল, ডেকেছেন পিসিমা?

মা তাড়াতাড়ি বলল, প্রণাম কর! তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তোর মামাতো বোন হয়। বেড়াতে এসেছে।

মিশিও তাড়াতাড়ি বলল, তুমি চিনতে পারলে না? সে-বছর তোমার সঙ্গে দেখা হল আমাদের গ্রাম... ।

মা একথা-ওকথা বলে চিনিয়ে দিল। আমি ভাবলাম কেন হঠাৎ এভাবে বেড়াতে এল? সে শহরে পড়াশোনা করে। হোস্টেলে থাকে। শচীর ভাবনা চকিতে আবার দোলা দিয়ে গেল। মিশি বলল, 'তোমার শিমুলরা বলেছে' লেখাটি পড়েছি। শিমুল যে মানুষের এত উপকারী বন্ধু আগে জানতাম না। বসন্তের এত কথা আছে—আগে এভাবে কোনো দিন ভাবি নি।

মা বলল, লেখাটি আর একটু সংক্ষিপ্ত হলে ভালো হত। আর গাছ ভালোবেসে হলেও যদি দেশলাইয়ের কাঠি কম খরচ করতিস বুঝতাম তুই সত্যিই প্রকৃতিপ্রেমিক। এত সিগারেট খাওয়া ভালো না।

ছোট দু বোন এসে বলল, তোমার তুলতুল কই? মিশিদি-কে দেখাই।

এতক্ষণ তুলতুলের কথা ভুলে ছিলাম। সেও এই ফাঁকে কোথায় যে পালাল! তুলতুল তুলতুল বলে ডাকতেই সে ঘরে ঢুকল, সতর্ক পায়ে থমকে দাঁড়াল, লাফিয়ে আমার কোলে উঠল। মিশি চোখ

বড় বড় করে ধরতে এল। তুলতুলও কেন জানি না হাঁ করে তাকে কামড়াবার জন্য রুখে দাঁড়াল। মিশি ভয় পেয়ে তিন হাত পিছিয়ে গেল। আমি তুলতুলের মাথায় হাত রেখে বললাম, অমন করে না। অতিথিকে চিনে রাখ। যা, ওর সঙ্গে পরিচয় করে নে।

মা ঠিক করে নিয়েছে পরীক্ষার পরেই আমার সঙ্গে মিশির বিয়ে দেবে। মায়ের ধারণা ছেলেদের পড়াশোনা শেষেই বিয়ে হওয়া দরকার আর মেয়েদের পড়তে পড়তে বিয়ে হয়ে যাওয়াই সবচেয়ে ভালো। বাবা ব্যবসা নিয়ে গ্রাম থেকে শহরে ছোটাছুটি করে। তাই আমার পরীক্ষা হয়ে গেলেই বিয়ে দিয়ে সংসারী করে তুলবে, বাবার ব্যবসায় ঢুকিয়ে দেবে।

আমি জানি না কিসে কি হয়ে যায়। মিশি আস্তে আস্তে আমার মনে ছায়া ফেলতে থাকে। শচীকে আরও বেশি মনে পড়ে। সেই এক সন্ধেয় মিশি আমাকে নদীর ধারে নিয়ে যায়। শরতের ভরা শান্ত নদী। জোয়ার এসে কূল ভরে দিয়েছে। একটা একটা করে সাম্পান কেঁদে কেঁদে উজানে চলে যায়। কেন যে সাম্পানওয়ালা পানি দিয়ে শব্দটা বন্ধ করে না। দড়ির আওটা পানিতে ভিজিয়ে দিলেই দাঁড়ের শব্দ ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। তার বুক মোচড়ানো দাঁড়ের শব্দ খুব কষ্ট দেয় আমাকে।

তুলতুল কোল থেকে নামে না। মিশি তাকে যতই আদর করতে চায় সে ততই ফুঁসে ওঠে; যেন বলে, চাই না তোমার ভালোবাসা। আমি তুলতুলের কান মলে দিয়ে ধমক দিই। তবুও তার শিক্ষা হয় না। মিশির পক্ষে বেশি ওকালতি করতে যেতেই আমাকেও কামড়াতে উদ্যত হল। আমিও বুঝে নিলাম ওদের মধ্যে ভাব হবে না। মিশিও আমার কোলের দিকে হাত বাড়ান বন্ধ করে চুপ মেরে গেল। তারপর এক সময় রেগে বলল, ওটাকে তাড়াবে নাকি আমি চলে যাব? তুলতুলও কোল থেকে নামে না। সে যেন আমাদের মাঝখানে বেড়া তুলে আগলে রাখতে চায় আমাকে। মিশি হঠাৎ আমার বাঁ হাতখানা নিয়ে আবেগ প্রকাশ করল। আস্তে আস্তে আমাকে ওর কাছে টানতে লাগল, অমনি শচী আমার কানে কানে বলল, ভালোবাসা কেমন? তুমি কাকে ভালোবাসো?

সঙ্গে সঙ্গে তুলতুল জোরালো প্রতিবাদ জানিয়ে আমার কোল থেকে নেমে নদীর কূল বেয়ে বিলের মাঝে হারিয়ে গেল। আমি এক বার ডাকলাম, তুলতুল তুলতুল, কোথায় গেলি? কাছে আয়, কথা শোন।

তুলতুল এল না। মিশি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপদ দূর হয়েছে ভালোই হয়েছে। এবার বলো, তুমি আমাকে ভালোবাসো?

মনের মধ্যে তখন শচী। আর মাথায় তুলতুল। মিশি আবার বলল, কি? আপদ বললাম বলে রাগ করলে? ওকে তুমি খুব ভালোবাসো জানি। কিন্তু ও যে আমাকে সহ্যই করতে পারে না।

আমি দাঁড়িয়ে আমতা আমতা করতে লাগলাম। তুলতুলের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লাম। মিশি বুঝে হোক না-বুঝে হোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে চুমু খেল। আমি গলে যেতে যেতে আবার তুলতুলের কথা ভাবলাম, কল্পনায় শচী এসে আবার বলল—ভালোবাসা কেমন তাহলে? ভালোবাসলে সুখ কোথায় থাকে, ভালোবাসা কোথায় থাকে? আমি আবার চঞ্চল হয়ে উঠলাম।

রাতের অন্ধকার ও আকাশের তারারা পাহারা দিয়ে আমাদের ঘরে ফেরত পাঠাল। সাম্পানের বুক-ফাটা চিৎকার অনেক দূর থেকে বলে চলল, ভালোবাসা কেমন তাহলে, ভালোবাসা কোথায় থাকে?

ঘরে পৌঁছে দেখি তুলতুল নেই। সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজলাম, রাত দুপুর অব্দি জেগে রইলাম। ঘরের দরজা-জানালা খোলা রাখলাম। আবার বিছানা ছেড়ে উঠলাম। দরজা বন্ধ করলাম, আবার দরজা খুলে উঠোনে গিয়ে ডাকলাম। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। কালপুরুষ মাঝ আকাশে মুগুর হাতে আলদিবরণকে থামিয়ে দিয়ে বীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আলদিবরণ সুন্দরী সুরাইয়াকে ধরার জন্য তাড়া করছে আর কালপুরুষ তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।

মা বলল, আসবে না। খুব বকাবকি করেছিস না কি! আজকাল তুই যা খিটখিটে হয়েছিস! বোন আলতা ও সুলতা বলল, এতদিন পর তুলতুল এভাবে চলে গেল কেন? তুমি কি বকেছ? মিশি বলল, গেছে ভালোই হয়েছে। যা রাগ দেখায় আমাকে।

সকাল ও দুপুর ছটফট করে কাটল। মিশিকে আমি কী করে বোঝাই যে তুলতুল আমার কতখানি। ভিটে খুঁজলাম। বিল, নদীর কূল হন্যে হয়ে খুঁজলাম। ভিটের যেখানে আমরা খেলতাম সেখানে বসে বসে ওকে ডাকলাম। মনে মনে কাঁদলাম। সে আমার মেজাজ-মর্জি বুঝত। আমার অসুখ করলে গায়ে-পিঠে চুলবুল করে একরকম আরাম ঢেলে দিত। পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়লে নিজে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে আমাকে আনন্দ দিত অথবা আমাকেও ওরকম করতে ইঙ্গিত দিত। হ্যাঁ, আমি তা করতাম। আসলে ওর স্বভাবের মাঝে আমিই নানা ইঙ্গিত খুঁজে নিতাম হয়তো। ওর খাওয়া-দাওয়া,

রুচি, মাঝে মাঝে মটকা মেরে শুয়ে থাকা সব মনে পড়তে লাগল। মিশি এসে নানাভাবে আমাকে ভোলাতে চেষ্টা করে। আলতা ও সুলতা আমাকে বুঝতে পারে, তারাও পাড়া ঘুরে খুঁজল। মা ডেকে সান্ত্বনা দেয়। ঘুরে-ফিরে তুলতুলের স্মৃতির সামনে চলে আসে। শচীকে সে খুব আপন করে নিয়েছিল। এক দিনে শচীর মনও জয় করে নিয়েছিল। ওর সঙ্গে সঙ্গে তাই শচী ঘুরে-ফিরে আসে। শচী বলে—ভালোবাসা কেমন, তুমি কাকে ভালোবাসো?

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামে। মিশি বলল, তুমি কি একটা বেজির জন্য সব কিছু ছেড়ে দেবে? চলো, নদীর কূলে যাই। কি, আমাকে নিয়ে যাবে না?

আমি হ্যাঁ-না কোনো জবাব দিতে পারলাম না। অন্য কথা বলে চুপ করে গেলাম। আলতা ও সুলতা আমার মতো ভেবে ভেবে কোনো কূল-কিনারা করতে পারে না। মিশির প্রতিও ওরা অবহেলা শুরু করল। ওদের ধারণা মিশিই তুলতুলের পালিয়ে যাওয়ার কারণ, প্রথম থেকেই মিশি ওকে সহ্য করতে পারছে না। তুলতুলও প্রথম দেখা থেকে মিশিকে ভালোবাসতে পারে নি।

সন্ধে নামতেই দক্ষিণ থেকে জোর হাওয়া ছুটল। ভরা নদী থেকে সাম্পানের শব্দ আসে। দূর থেকে ভালো লাগে, কাছ থেকে শুনতেই বেশি কর্কশ। পুব আকাশে কৃত্তিকা তারাগুচ্ছ উঁকি মেরে তাকায়। ঠিক তখনই তুলতুলকে নিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল শচী ও তরুণ। শচীর কোলে তুলতুল, কিন্তু শচীর কোল থেকে আমার কোলে এল না।

আমার সামনে দাঁড়িয়ে শচী বলল, তুমি কি তুলতুলকে আমার কাছে পাঠিয়েছ? ভোর রাতে আমার বিছানায় উঠে এমন চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিল যে ভাবলাম তোমার কোনো বিপদ-আপদ হয় নি তো?

তরুণ বলল, সকালে আসতে পারি নি, মা-বাবা ঘরে ছিল না বলে।

আলতা ও সুলতা বলল, এত দূরে ও গেল কী করে?

মা হয়তো ভাবল তুলতুল শচীর কাছে কেন গেল? তুলতুল শচীর কোলে বসে কিকি কিকি কিকি করে সেই প্রথম থেকেই বকবক করছে।

[গল্পগুচ্ছ ঃ আকাশে প্রেমের বাদল]

সোনা

সোনালী